নীহার
রঞ্জন
গুপ্ত
কিশোর
সাহিত্য
সমগ্র

কিশোরসাহিত্য-সমগ্র

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রথম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৮৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৮৭
মুদ্রণ সংখ্যা ৫৫০০

—পনেরো টাকা—

প্রচ্ছদপট ঃ
অঙ্কন—পূর্ণেন্দু রায়
মুদ্রণ—ব্লকম্যান প্রসেস

এস. এন. রায় কর্তৃক মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীবংশীধর সিংহ কর্তৃক বাণী মুদ্রণ,
১২ নং নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

সূচী

উপহার

ভূমিকা

শীতের সন্ধ্যায় নেমেছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। জমাটি ঠান্ডায় লেপ মুড়ি দিয়ে গল্পের বই পড়তে কি আরাম! বিশেষ করে এমন বই। ঝকঝকে মলাট, ভেতরে সুন্দর ছবি—শিল্পী ফণী গুপ্ত মশাইয়ের আঁকা। 'শিশুসাথী' মাসিকপত্রে ওঁর আঁকা ছবি তখন প্রায়ই দেখতাম, পছন্দও ছিল খুব।

বইয়ের নামটি বেশ, "রাজকুমার"। ভাষা অতি মিষ্টি, কাহিনীর টানে তন্ময় হয়ে গেছি। আমার বয়সী ছোট্ট ছেলে নিমাই আর তার দুঃখী বিধবা মায়ের বর্ণনা পড়ে চোখ করকর করে জল আসে বার বার। বড়লোক মাসির কোলে ছেলেকে তুলে দিয়ে মা চলে গেলেন সুদূর গ্রামে, তাঁর ভাঙা কুটিরে। বড়লোক মাসিকে মা ডাকে নিমাই। কিন্তু আসল মায়ের অভাব কি অতো সহজে মেটে? ক্রমে সে দারুণ অসুখে পড়ল, প্রাণ সংশয়।

আমার মনে গভীর উদ্বেগ, ছেলে মাকে ফিরে পাবে তো? দুঃখ নিয়ে বই শেষ করতে আর কে চায়! অবশেষে রোগ শয্যায় যখন নিমাই তার মাকে ফিরে পেয়ে জড়িয়ে ধরে, তখন আমি, দশ বছর বয়সী এক খুদে পাঠক, আনন্দে লাফিয়ে উঠেছি। সাগ্রহে মলাট উল্টে লেখকের নাম আবার দেখে নিলাম—নীহাররঞ্জন গুপ্ত। ওঁর নামের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। পরবর্তীকালে জানি, এটি ওঁর লেখক জীবনেরও প্রথম বই। এবং "রাজকুমার"-এর প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল আমার জন্মের কয়েক বছর আগে।

পরের বই "শংকর" (১ম ও ২য় খণ্ড) পড়ি সমান আগ্রহে। বরং বলা চলে, আরো যেন ভালো লেগেছিল ডানপিটে শংকরের কার্যকলাপ। তেজী অথচ অভিমানী সুজাতাকেও বেশ তারিফ করি। তবে, সুজাতার দাদা—যে নাকি পুরো শহুরে ছেলে—তাকে শংকর বার বার জব্দ করছে দেখে—নিজে আমিও আজন্ম শহুরে, বড্ড আঁতে ঘা লেগেছিল। শহরের ছেলেরাই কি শুধু চালিয়াৎ আর গ্রামের ছেলেরা ধোয়া তুলসী পাতা? গল্পের শেষের দিকে যখন দেখলাম নীহাররঞ্জন গ্রামের দোষ-ত্রুটিও খোলাখুলি লিখেছেন তখন অবশ্য মন আবার তাজা হয়ে গেল। দু খণ্ডের এই বই আমার জন্মদিনে কিনে দিয়েছিল ছোড়দি প্রতিমা। পেয়ে দারুণ খুশি হলেও ও বই বেশি দিন কাছে রাখতে পারিনি। এক বন্ধু বইটি পড়তে নিয়ে যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে অংকে পাঁচ, ভূগোলে সাত ও স্বাস্থ্যে আট পাওয়ায় তার বাবা রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে তার গল্পের বইয়ের ভাঁড়ার বেমালুম কেরোসিন ও দেশলাই সংযোগে জ্বালিয়ে দেন, ঐ বইগুলির মধ্যে, বলাবাহুল্য যে, "শংকর" ছিল। পরে বন্ধু বেচারা নেহাৎ কাঁচুমাচু মুখে দুঃসংবাদ জানালে আমি কেঁদেছিলাম মনে পড়ে।

নীহাররঞ্জনের তৃতীয় বইটি পড়ার স্মৃতিও জবল জবল করছে। পাড়ার গলিতে ফুটবল (আসলে ক্যাম্বিস বল) প্রতিযোগিতা হতো প্রতি বছর। আমাদের ক্লাবের চারটি দল তো খেলতোই, বাইরের বে-পাড়ার টিমও আসতো পঁচিশ ছাব্বিশটি। ক্লাবের বাচ্চা মেম্বারদের নিয়ে গড়া "মুকুল" নামে দলের সেবার আমি ছিলাম গোলকিপার। প্রথম রাউণ্ডেই "মুকুল"কে মুখোমুখি হতে হল লম্বা জুলফি-দাড়ি-গোঁফওলা প্লেয়ারে ভর্তি অন্য পাড়ার এক সিনিয়ার দলের বিরুদ্ধে। অনেক গোলে হারবো সবাই জানতো, কিন্তু খেলা শেষ হবার দেড় মিনিট আগে পর্যন্ত আমরাই একগোলে এগিয়ে রইলাম! শেষ লগ্নে ঘনিয়ে এল মোক্ষম বিপদ। দারুণ ব্যায়াম করা চেহারার বিপক্ষ টিমের হাফ ব্যাক যখন এগিয়ে এসে নিশ্চিত গোল করতে যাচ্ছে, তখন আমাদের হাড় জিরজিরে রোগা পটকা ব্যাক কি অদ্ভুত কায়দায় সেই স্যাণ্ডো মার্কা চেহারার প্লেয়ারকে লেঙ্গি মেরে চিৎ করে ফেলল, তার রহস্য আজও জানি না। পেনাল্টি। পেনাল্টি থেকে স্যাণ্ডো হাফ ব্যাকটি কামানের গোলার মতো সট করল। নাক-ফাক উড়ে যেতে পারে ভেবে পালাতে যাচ্ছি, তখুনি দুম করে বলটা আমার কপালে লেগে ক্রশবার উঁচিয়ে চলে যায়। খেলাও শেষ। আমাদের ক্লাবের চাঁইদের সে কি গগনভেদী উল্লাস! মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছি আমি, তখন নাচতে নাচতে কারা আমায় কাঁধে তুলে নিল। গদ-গদ কণ্ঠে শুনলাম গোল-কিপারের এমন দুর্দান্ত সেভ নাকি খুব কম দেখা যায়।

ক্লাবের সবচেয়ে বড় কর্মকর্তা পল্টুদা সেই সন্ধ্যেয় একখানি বই কিনে উপহার দিলেন, "লাল চিঠি"। ম্যাচ জেতার উপরি নতুন চকচকে বই পাওয়ার আনন্দ তো সোজা কথা নয়! কিন্তু সবচেয়ে বড় আনন্দ ঐ রাত্তিরে আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল, তা "লাল চিঠি" পড়ার রুদ্ধশ্বাস আনন্দ। রহস্যভেদী কিরীটী রায়, অ্যাসিসট্যান্ট সুব্রত ও রাজুর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। পূর্ববঙ্গের এক জমিদার বাড়িতে দামী হীরে চুরি কেন্দ্র করে ঘটছে নানা ঘটনা, অথচ চোর নিশ্চয় বাড়িরই কেউ একজন। লোমশ গরিলার মতো রহস্যময় আরেক চরিত্র, সলিলবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি বেঁটে বক্কেশ্বর, যার অনর্গল বাক্য স্রোতের সঙ্গে অনবরত মুদ্রাদোষ শোনা যায় "হচ্ছে হল গা"—সব মিলিয়ে একেবারে মাতিয়ে দিয়েছিল আমাকে। "লাল চিঠি"র পর পড়েছি "নিশীথ রাতের তীরন্দাজ"। শুরুতেই চমক, মোহরের ঝাঁপিতে কাটা হাত! তার কয়েকদিন পর আবার আরেকখানি কাটা হাত পেলেন রাজা চন্দন সিংহ। রহস্য অবশেষে একদিন উম্মোচিত হয়, কিন্তু নিরপরাধ (যুবরাজ) দুর্জয় সিংহ অভিমান ভরে রাজ্যে আর ফিরলেন না জেনে মন বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

নীহাররঞ্জনের লেখা ছোটদের বইগুলো নাড়লে চাড়লে তখুনি আমার মনে পড়ে যায় শৈশব স্মৃতি। এক একখানা বইয়ের সঙ্গে কতো স্মৃতি জড়ানো। আর স্মৃতির মালা গাঁথার সবচেয়ে মজা, ভুলে যাওয়া আরো কত কাহিনীর স্মৃতি মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। শৈশবের সবটুকুই মধুর, এমন কথা নয়।

অনেক দুঃখ মনের গহনে লুকিয়ে আছে। তবু, আনন্দ-বেদনায় মাখা শৈশব হাতছানি দিয়ে ডাকে। ছেলেবেলার একদা প্রিয় বইগুলি হাতে নিলে তাই মধুর অথচ বিষাদে ভরা অদ্ভুত অনুভূতিতে বুকের মধ্যে কেমন টনটন করে!

নীহাররঞ্জন গুপ্ত এখন মুখ্যত বড়দের বইয়ের লেখক হলেও ছোটদের জন্য তিনি নানান ধরনের লেখা লিখেছেন প্রচুর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল লেখাগুলি। প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান "মিত্র ও ঘোষ" তা এক সঙ্গে গুছিয়ে, সুন্দরভাবে সাজিয়ে খণ্ডে খণ্ডে ছাপছেন। ওঁদের এ প্রচেষ্টায় অভিনন্দন জানাই।

এ যুগের ছেলেমেয়েরা খণ্ডগুলি পড়বার সময়ে নিঃসন্দেহে একদিক থেকে বেশি লাভবান। কারণ, তাদের প্রিয় গোয়েন্দা কিরীটী রায়ের তরুণ বয়সের হালচাল তো জানা যায় এই বইগুলির মধ্যেই!

মাস চারেক আগে রহস্যভেদী কিরীটী রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। উত্তর কলকাতার বলাকা নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ওঁকে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। কিরীটী রায়কে সেই প্রথম দেখলাম। শ্যামবর্ণ, প্রিয়দর্শন চেহারা, দোহারা গড়ন, মাথার শুভ্র চুল ব্যাকব্রাশ আঁচড়ানো। পরনে সাদা টেরিকটের হাওয়াই শার্ট ও টেরিকটেরই কালো প্যাণ্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল। অতো রহস্যভেদ করা সত্ত্বেও মানুষটি অমায়িক ও মিষ্টভাষী। কিরীটী রায়ের বয়েস এখন ৬৬। ওঁর সহকারী সুব্রতর বয়সও ৬০ পার হল। আর রাজুর তো বিশেষ খবরই পাওয়া যায় না আজকাল।

তাই বলছিলাম, প্রবীণ, অভিজ্ঞ কিরীটী রায়ের কায়দার সঙ্গে নেহাৎ আনকোরা গোয়েন্দা ২১।২২ বছর বয়সী কিরীটীর কার্যকলাপ মিলিয়ে নিতে পারবে আজকালকার ছেলেমেয়েরা। প্রিয় চরিত্রকে অন্তরঙ্গ, আরো অন্তরঙ্গ-ভাবে জানার রোমাঞ্চ কি কম?

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

রাজকুমার

।। এক ।।
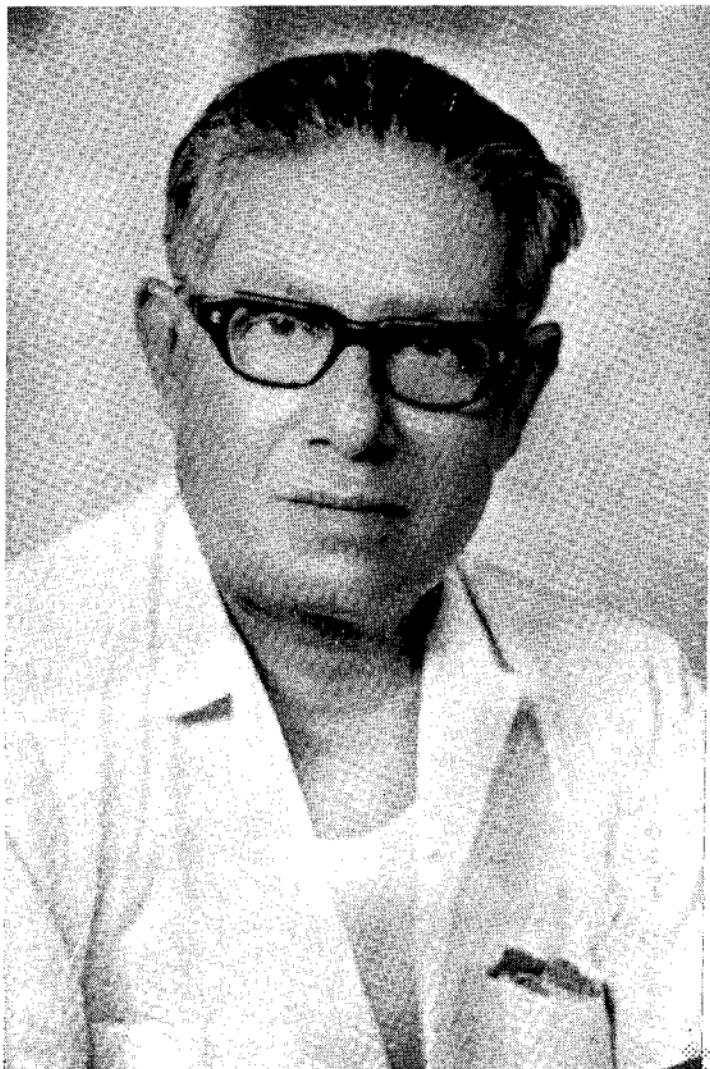
গল্প শুনতে নিশ্চয়ই ভালবাস তোমরা সবাই। একটা গল্প বলি শোন।

এই যে আজ আমায় দেখছ, আমিও একদিন তোমাদের মতই ছোট্টটি ছিলাম এবং রাতের বেলা যখন সব নিঝুম হয়ে আসত, বাইরে ক্রমে অন্ধকারের বুকে ঝিঁ ঝিঁ-পোকা ঝিঁ-ঝিঁ করে বাজনা বাজাত, তখন তোমাদের মতই চুপটি করে মার কোলে শুয়ে শুয়ে রূপকথা শুনতাম।

কত দেশের রাজকুমার ভিন্ দেশের রাজকুমারীদের জন্য, আমার মনের মাঝে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে, ময়ূরপংখী নাও সাজিয়ে যাওয়া আসা করত।

কতদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছি, আমিও যেন এক স্বপন পুরীর রাজকুমার—মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার দুধের মত সাদা পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটছে সেই মেঘবরণ কন্যা আর কুচবরণ চুল যার—তারই দেশের দিকে!

কে জানত বল—সেই রকমই একটি স্বপ্ন একদিন সত্য হয়ে আমার এই জীবনেই দেখা দেবে এবং সেদিন খুব বেশীদূরে নয়!

আমার বয়স যখন মাত্র নয় বৎসর, সেই সময় হঠাৎ একদিন আমার বাবা সন্ন্যাস-রোগে মারা গেলেন। আমাদের অবস্থা কোনদিনই ভাল ছিল না। বাবা অনেক দেনা রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই পাওনাদাররা পোকার মত এসে মাকে ছেঁকে ধরল—চারদিক থেকে।

জিনিসপত্র আমাদের যা ছিল সে-সব বেচে, আর নগদ টাকাকড়ি যা ছিল তা দিয়ে, মা বাবার সব দেনা শোধ করে দিলেন।

কিন্তু তারপর, দিন আর চলে না। তবু মা হার মানতে চান নি—কিন্তু হারলেন—কয়েক মাস যুদ্ধ করে অবশেষে হেরে গেলেন। তারপর একদিন অন্ধকার থাকতেই মার হাত ধরে আমি—মার সঙ্গে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঘুমে চোখ দুটো তখনও জড়িয়ে আসছিল। মাকে জিজ্ঞেস করলাম,—কোথায় যাচ্ছ মা।

মা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল,—বাঁধাঘাটে, আমার দিদির···না না, তোমার মাসীর বাড়ী।

রেলে চেপে, তারপর প্রায় তিন ক্রোশ রাস্তা পায়ে হেঁটে—ক্ষিদে-তেষ্টায় কাতর হয়ে, বৈকালের দিকে আমরা গিয়ে এক প্রকাণ্ড রাজপুরীর মতই তিন মহলা বাড়ীর সামনে দাঁড়ালাম।

গল্পে শোনা রাজপুরীর মতই সেই বাড়ী; উঁচু তার মাথা—যেন নীল আকাশের বুক চিরে ওপরের দিকে ঠেলে উঠেছে!

কোথা থেকে যেন মধুর সানাইয়ের আলাপ কানে এসে বাজতে লাগল। বৈকালের অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া আমার ক্লান্ত দেহকে যেন জড়িয়ে দিল।

মার পিছু পিছু মহলের পর মহল পার হয়ে, শেষটায় অন্দরে গিয়ে ঢুকলাম।

এক জায়গায় অনেকগুলো স্ত্রীলোক বসে গল্প করছিলেন। আমি আর মা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁদের সকলের নজর পড়ল আমাদের দিকে।

তাঁদের মধ্যে একজন আমার দিকে চেয়ে বললে,—বাঃ কি সুন্দর ছেলেটি। তোমরা কে গা ?—কোথা থেকে আসছ ?

মা বললে,—আমরা হরিণগাঁ থেকে আসছি।

একজন সুন্দরমত স্ত্রীলোক এগিয়ে এসে বললে,—হরিণগাঁর কাদের বাড়ী থেকে গা ?

এবার আমিই এগিয়ে গিয়ে জবাব দিলাম,—হরিণগাঁর জিতেনবাবুর ছেলে আমি।

ওঃ! জিতেনের ছেলে তুমি! মহিলা বললেন।

তারপর পরিচয় হয়ে গেল। বুঝলাম সেই সুন্দরমত স্ত্রীলোকটি আমার মাসীমা। অর্থাৎ মার আপন সহোদরা বোন।

যা হোক ভগবান বোধহয় আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। আমরা সেই বাড়ীতেই আশ্রয় পেলাম।

ছোটবেলায় মার মুখে দাদামশাই-এর বাড়ীর গল্প শুনেই এসেছি ; কিন্তু এখানে আসার সৌভাগ্য কোন দিনও আমার হয় নি। কিন্তু আজ এখানে এসে দেখলাম, মার মুখে যা শুনেছিলাম, এ তার চাইতেও অনেক—বেশী।

একটা প্রশ্ন অনেক দিন আমার মনে জেগেছে, ইচ্ছা করত মাকে কথাটা জিজ্ঞেস করি, কিন্তু সাহস হয় নি। পরে বড় হয়ে অবশ্য জেনেছিলাম,—আমার বাবা গরীব স্কুল মাস্টারের ছেলে হলেও যেমন বিদ্বান তেমনি তেজস্বী ছিলেন। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। দাদুর ইচ্ছা ছিল বাবাকে ঘর-জামাই রাখেন —কিন্তু বাবা এতে কোন মতেই সম্মত না হওয়ায় দাদামশাই অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের ছোট মেয়ে আমার মাকে তাঁর ধন-সম্পত্তি থেকে একেবারে বঞ্চিত করেছিলেন, এক পয়সাও তাঁকে দেন নি। বড় মেয়েকে সব সম্পত্তি দিয়ে নিজের বাড়িতেই রেখে যান।

যাক যা বলছিলাম, পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল, চেয়ে দেখি ভোরের সোনালী আলোয় ঘর ভরে গেছে। ভোরের হাওয়ায় শীত-শীত করছিল, গায়ের কাপড়টা একটু ভাল করে টেনে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম এল না—শুয়ে শুয়ে এলোমেলো চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম।

কে ডাকল,—খোকাবাবু, বাবু তোমায় ডাকছেন।

চেয়ে দেখি একজন মাঝ বয়সী ঝি আমার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে তার সঙ্গে ওপরের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ঘরে চৌকির ওপর একজন মোটা-সোটা সুন্দর ফরসা ভদ্রলোক বসেছিলেন, আর তাঁর পায়ের তলায় আমার মা মুখ নীচু করে বসে এবং তাঁর পাশে বসে মাসীমা।

আমায় ঘরে ঢুকতে দেখেই ভদ্রলোক স্নেহসিক্ত কণ্ঠে মাকে বললেন,—এই

বুঝি তোমার ছেলে অনু !

মা মাথাটা একটি বারের জন্য তুলে আবার নামিয়ে নিলেন।

—এস ত খোকা, তোমার নাম কি ?

আমি ধীরে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম, বললাম,—আমার নাম নিমাই।

—আমি তোমার কে হই বলত ?

আন্দাজে ভর করে জবাব দিলাম,—মেসোমশাই।

ঠিক বলেছ বাবা—বলে তিনি হোঃ-হোঃ করে হাসতে লাগলেন ; তারপর হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন।

মার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তাঁর চোখের কোণ দুটি ছল্ ছল্ করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের পাতা দুটিও ভিজে এল।

।। দুই ।।

সেদিন রাত্রে খাওয়ার জন্য দাসী যখন আমায় ডাকতে এল, তখন মার কোলের কাছটিতে শুয়ে শুয়ে গল্প করছিলাম তাঁর সঙ্গে। কোথায় সেই ঝকঝকে তকতকে গোবর মাটি দিয়ে নিকনো মেঝে—সেই মেঝেতে কাঁসার থালায় ভাত খেয়েছি।

আর আজ খাবার ঘরে গিয়ে দেখি—সাদা ধবধবে মারবেল পাথরের মোড়া মেঝে। উজ্জ্বল ঝাড়ের মসৃণ কাচের আবরণ ভেদ করে আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। চোখ যেন ধাঁধিয়ে দেয়।…উঃ ! এত আলো !

মনে পড়ল আমাদের সেই মাটির প্রদীপ-জ্বালা আধো-আলো আধো-ছায়ায় ঘেরা সেই ছোট্ট কুঁড়েঘরখানির কথা। ম্লান সে আলো, তবু বুঝি সে কত স্নিগ্ধ —যেন এক টুকরো স্বপ্ন !

ঘরের সাদা মার্বেল পাথরের মেঝেতে খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

খেতে গিয়ে দেখলাম, মেঝেতে পাশাপাশি দু'খানি আসন পাতা রয়েছে। আসনের সামনেই বড় বড় দুটো রুপার থালায় ভাত বেড়ে রাখা হয়েছে। ছোট বড় মাঝারি অসংখ্য চকচকে রুপার বাটিতে কত বিভিন্ন ব্যঞ্জনাদি একটার পর একটা সাজান।

মেসোমশাই আসনে বসে বোধ হয় আমারই জন্য অপেক্ষা করছিলেন ; আমায় দেখে বললেন,—এই যে বাবা, এস। খেতে বস।

আসন ত নয়—যেন পাখীর পালকের সুন্দর নরম গদি—কে বিছিয়ে দিয়ে গেছে !

ভাত ভাঙতেই ভুর-ভুর করে একটা সুগন্ধ ভেসে এল নাকে ; কিন্তু এত সুস্বাদু সব জিনিস, সে-রাত্রে কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। এর চাইতে বুঝি সেই প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল মাটির দাওয়াটিতে বসে সেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প শুনতে শুনতে মার হাতে তুলে দেওয়া শুধু ডাল-মাখা মোটা চালের ভাতের গ্রাস যেন আরও ভাল লাগত।

খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে, বাইরের দিকে চেয়ে ছিলাম। শীতের কুয়াসাভরা থমথমে নিঝুম রাত্রি। আকাশে যদিও চাঁদ উঠেছিল, কুয়াসায় চাঁদের আলো ম্লান, অস্পষ্ট। জানলার ঠিক নীচেই ফুলের বাগান। নানা জাতীয় মরশুমী ফুলে বাগানের ছোট-বড় গাছগুলো সব ভরে গেছে। কোথায় কোন পাতার আড়ালে থেকে, একটা পাপিয়া কেবলই পিউ-পিউ করে ডাকছিল।

এখানকার এত সব চোখ-ঝলসান চাকচিক্যের বাইরে এ বাগানটা যেন আমার সেই গ্রামে ফেলে আসা সোনার স্বপনের একটুখানি!

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক মনে নেই, হঠাৎ যেন কার নরম দুটি হাতের স্পর্শ পিঠের ওপর পেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই একটা করুণ ডাক কানে এলো—নিমাই!

চেয়ে দেখি মা দাঁড়িয়ে। সেই আবছা আলো-ছায়ায় মনে হ'ল তাঁর চোখ দুটি যেন জলে টলমল করছে।

দুই হাতে মাকে গভীর স্নেহে আঁকড়ে ধরে ডাকলাম,—মা—মা-মণি!

আমার মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে মা বলতে লাগল—মানুষের দুঃখটাই কিন্তু সব নয় নিমাই! ভগবান আমাদের দুঃখের ভেতর দিয়েই নিয়ে গিয়ে সত্যিকারের মানুষ করে তোলেন।

বললাম, জানি মা।

হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরের কথা তোমার মনে আছে? প্রথম বয়সে তাঁর দিন কত দুঃখ ও কষ্টের ভেতর দিয়ে কেটেছে! পড়বার জন্য ঘরে আলো পান নি, রাত জেগে জেগে রাস্তার গ্যাসের আলোয় তাঁকে পড়া তৈরী করতে হয়েছে। ছোটবেলায় তিনি অত দুঃখেও অধীর না হয়ে অত যত্নে বিদ্যা অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই পরে তিনি বিদ্যাসাগর হতে পেরেছিলেন; পেরেছিলেন হতে বিরাট এক মানুষ, দয়ার সাগর—সবার বন্ধু।

একটু থেমে মা আবার বলতে লাগল, মানুষের জীবনে সুখ আর দুঃখ দুই আছে—দুঃখে তাই যেমন মুষড়ে পড়া উচিত নয় কারো, তেমনি সুখে আত্মহারা হওয়াও উচিত নয়।

তুমি চিরকাল এমনি ছোটটিই থাকবে না, আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠবে। আজকের কষ্ট চিরদিন থাকবে না জেনো, একদিন না একদিন এর শেষ হবেই। দিনের পর যেমন রাত্রি আসে, তেমনি দুঃখের পর আসে আনন্দ।

একটানা কথাগুলো বলে মা একটুখানি থামল।

তখন কাছারীর পেটা-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে একে একে এগারটা বেজে গেল।

জানলা দিয়ে একটা শিরশিরে হাওয়া এসে গায়ে লাগায় শীত-শীত করছিল।

মা নীচু হয়ে আমার কপালে গভীর স্নেহে একটা চুমু দিয়ে বললে,—চল বাবা, রাত হ'ল ঘুমোবি আয়—

মার সঙ্গে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

।। তিন ।।

প্রথম কটা দিন ত মস্ত বড় ঐ বাড়ীটা ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতেই কেটে গেল। বহু পুরাকালে, বাড়ীর কর্তাদের মধ্যে নবাবদের কাছ থেকে কে একজন নাকি রাজা উপাধি পেয়েছিলেন, সেই থেকে এটা হলো রাজবাড়ী আর এঁদের সকলে রাজাবাবু বলেই ডাকে, আর এ বাড়ীর বড় ছেলেকে বলে রাজকুমার।

বড় বড় সব মহল এবং এক একটা মহলের এক একটা নাম। হাতী-শালে হাতী, ঘোড়া-শালে ঘোড়া, গো-শালে গরু। আত্মীয় আশ্রিত—কর্মচারী দাস-দাসী সব ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় থাকে।

সকালবেলা প্রথম সূর্যের আলো মেঘের তোরণ হতে রাজবাড়ীর গৃহদেবতা বিষ্ণু মন্দিরের সোনার গম্বুজে ঠিকরে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে নহবৎখানায় বেজে ওঠে শানাইয়ের বুকে ভৈরবী।

প্রহরে প্রহরে কাছারী বাড়ীর পেটা-ঘড়ি বাজে ঢং-ঢং—চারদিক বিঘোষিত করে।

দিন-রাত অতিথিশালে অতিথিদের আনাগোনা চলে।

তারপর দিনের আলো যখন ধীরে ধীরে কমে আসে, গাছের পাতায় পাতায় শেষ বারের মত ছোঁয়া দিয়ে মিলিয়ে যায়—আবার তখন নহবৎখানায় শানাই বেজে ওঠে মধুর পুরবীতে। দিন আসে—দিন যায়।

মনে হ'ত—কেমন করে বুঝি আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন এক পথে হঠাৎ এই স্বপ্ন-রাজ্যে ছিট্‌কে এসে পড়েছি। সমস্ত দিনটা যে কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গিয়ে রাত ঘনিয়ে আসত, তা যেন টেরই পেতাম না। এমনি করে আনন্দ আর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে দুটো মাস কেটে গেল। এবং ঐ দু'মাসের মধ্যে বিচিত্র কয়েকটা ব্যাপার আমার চোখে পড়ল।

মেসো-মাসীর কোন ছেলে-পিলে ছিল না, সেজন্য তাঁদের মনে এতটুকুও আনন্দ ছিল না। মাসীমাকে ত প্রায়ই আমার মার কাছে দুঃখ করতে শুনতাম। মা ওদের দুঃখের কথা শুনেও কেন না জানি বিশেষ সাড়া-শব্দ করত না।

ব্যাপারটা আমার যেন ভাল লাগত না।

আর একটা ব্যাপার কিছু দিনের মধ্যেই লক্ষ্য করেছিলাম মেসোমশাই ও মাসীমা যেন বাড়ীর অন্যান্য আশ্রিত আত্মীয়দের থেকে আমাকেই একটু বেশী ভালবাসতেন—বিশেষ চোখে দেখতেন। প্রায়ই আমার জন্য কত সুন্দর সুন্দর খেলনা, কাপড়, জামা আসত। বাড়ীর অন্য ছোটদের থেকে আমার খাওয়ার ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট প্রভেদ ছিল। তাঁদের বঞ্চিত করে ঐ যত্ন ও ভালবাসার জন্য আমার নিজেরই যেন কেমন একটু বাধো-বাধো ঠেকত ; কিন্তু ক্রমে তা সয়ে গিয়েছিল।

আমাকে পড়াবার জন্য একজন মাস্টার রাখা হয়েছিল, তাঁর নাম নিশীথবাবু। তাঁকে আমার ভারি ভাল লাগত। তিনিও আমায় ভালবাসতেন খুব। তিনি দেশ-বিদেশের কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলতেন। তিনি এ বাড়ীতেই থাকতেন।

সকালে সন্ধ্যায় তিনি শুধু আমায় নিয়মিত পড়াতেন।

ইতিমধ্যে আমি স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম।

দুপুরে স্কুলে যেতাম। স্কুল থেকে এলে মাসীমা নিজে এসেই যত্ন করে নিজ হাতে আমায় খাইয়ে যেতেন। তারপর চাকর হারুর সঙ্গে বেড়াতে যেতাম।

প্রথম প্রথম মাসীমার হাতে খাবার খেতে আমার বড্ড লজ্জা করত, কিন্তু মাসীমার ব্যবহারে ক্রমে সে লজ্জা কেটে যেতে লাগল।

বিকালে বেড়াতে বেরুবার আগেও মাসীমা নিজ হাতে আমায় পোষাক পরিয়ে দিয়ে যেতেন। পোষাক পরান হলে ভিজে তোয়ালে দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে কপালে কাজলের টিপ দিয়ে যখন সাজিয়ে দিতেন, তখন ঘরে বড় আয়নার দিকে চেয়ে আমারই মনে হ'ত আমি যেন সত্যিই কোন হারিয়ে-যাওয়া এক রাজকুমার, এতদিন পর বুঝি নিজের দেশে ফিরে এসেছি।

ঐ সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও আমার দৃষ্টিকে এড়ায়নি। আমার নিজের মা যেন কেমন দিনের পর দিন আমার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে যাচ্ছিল। সারা দিনের মধ্যে মার সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা হ'ত। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া—সেও আমার মেসোমশাইর পাশটিতে বসেই শেষ করতে হ'ত। প্রকাণ্ড থালা করে বামুনঠাকুর ভাগে ভাগে সব বেড়ে দিয়ে যেত! মাসীমা আগাগোড়াই আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

ক্বচিৎ কখনো আহারের সময় নজরে পড়ত—মাও দূরে দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওদিকে। খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে যেতাম; গভীর রাত্রে কখন যে মা আমার পাশটিতে এসে শুত, তা টেরও পেতাম না। কখনও ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখতাম—মা দুই হাত দিয়ে আমায় বুকের মাঝে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়তাম।

পরের দিন দাসীর ডাকে যখন ঘুম ভাঙ্গত, দেখতাম—মা পাশে নেই, শয্যা খালি—ভোরের শানাইয়ের মধুর রাগিণী আকাশ ভরে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

এমনি করে আরও অনেকগুলো দিন কেটে গেল। আমার ওপরে মেসোমশাই ও মাসীমার ভালবাসা যেন ক্রমে গভীর হ'তে লাগল। এ বাড়ীর চাকর-বাকরেরাও যেন আমাকে মেসোমশাইর মত মান্য ও ভয় করত—যেন আমি মেসোমশাইর চাইতে কোন অংশে কম নই।

আজ মনে পড়ে,—অনেক সময় ইচ্ছা করেই তাদের অযথা খাটিয়ে নিয়েছি, হয়ত কোন দোষ নেই—মিছামিছি তাদের বকেছি, বকুনি খাইয়েছি।

একটা চাকর একদিন আমার একটা জিনিস আনতে একটু দেরী করেছিল, মাসীমাকে সেই কথা বলে দিয়েছিলাম। আমি কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে কথা ভুলেও গিয়েছিলাম।

সন্ধ্যাবেলা নিশীথবাবুর কাছে সবে পড়তে বসেছি, হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ কানে আসতেই ছুটে বাড়ীর ভেতরে গেলাম। গিয়ে দেখি সকালবেলার সেই চাকরটিকে দারোয়ান রামসিং একগাছি সরু লিক্‌লিকে বেত দিয়ে ভীষণভাবে

প্রহার করছে।

সে বেচারা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে চীৎকার করে কাঁদছে! সে কী কান্না!

মেসোমশাই ওপরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আদেশ করছেন,—মার, মার!

এমন সময় হঠাৎ আমায় সেখানে দেখতে পেয়ে সেই চাকরটা ছুটে এসে পাগলের মত আমার পা জড়িয়ে ধরে বলল,—দাদাবাবু, আমাকে বাঁচান।

মেসোমশাই কঠোর স্বরে বললেন,—চা বেটা, ক্ষমা চা; বল আর কখনও ওর কথা অমান্য করবি নে, এবার থেকে যা বলবে তাই শুনবি।

এতক্ষণে ব্যাপারটা জলের মতই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

সে কাঁদতে কাঁদতে মেসোমশাইর আদেশমতই আমার পায়ের সামনে উবুড় হয়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে প্রতিজ্ঞা করল।

সকালে মাসীমার কাছে নালিশ করবার সময় যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতাম ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে, তাহ'লে কখনই নালিশ করতাম না।

সব ব্যাপার দেখে লজ্জায় যেন আমারই মাথা মাটিতে মিশিয়ে যেতে লাগল। ছিঃ! ছিঃ! আমি কী অন্যায় করেছি!

সেখান থেকে চলে আসার সময় বারান্দার এক পাশে মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বারান্দায় টাঙ্গানো আলোয় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল।

মা শুধু একবার মাত্র তীব্রভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

অনেকক্ষণ সেখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর এক সময় পায়ে পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

রাত্রে নিয়মিত মেসোমশাইয়ের সঙ্গে গিয়ে দোতলার বারান্দায় খেতে বসলাম। সে রাত্রে সমস্ত খাবার যেন আমার মুখে কেমন বিশ্রী লাগতে লাগল।

মাসীমা কত অনুযোগ করতে লাগলেন,—নিমু, তুই যে কিছুই খাচ্ছিস না বাবা, তোর কি ক্ষিদে নেই?

বললাম, কেন-এইত খাচ্ছি।

মাসীমা বললেন, ভাল করে খা—

কোন মতে আহার শেষ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সে রাত্রে একটি বারের জন্য চোখে ঘুম এল না।

আর একটা আশ্চর্য—মা সেদিন আমার ঘরে শুতে এল না।

এক সময় ভোর হয়ে গেল—আমিও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

মার সঙ্গে যে দেখা হ'ল না তার জন্য মনে বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলাম; কেননা গত রাত্রের আমার সে কুণ্ঠাটা তখনও ভাল করে কাটে নি।

॥ চার ॥

এখানে আসার প্রায় মাস ছয়েক পরের কথা।

আজ ক'দিন থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছিলাম—মা, মাসীমা ও মেসোমশাই প্রায়ই তিনজনে নিরিবিলিতে মাসীমার ঘরের মধ্যে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে কি বিষয় নিয়ে যেন কথাবার্তা বলেন।

একদিন কেমন কৌতূহল হল। সেদিনটা রবিবার থাকায় স্কুলও বন্ধ ছিল। মাসীমারা এদিকে যে ঘরে কথাবার্তা বলছিলেন, পা টিপে টিপে সেই ঘরের বন্ধ দরজার কপাটের সামনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালাম। কি কথাবার্তা ওদের মধ্যে হচ্ছিল সব শোনা না গেলেও কিছু কিছু আমার কানে এলো এবং সে কথা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার পা দুটো লোহার মত ভারী হয়ে সেখানে যেন আটকে গেল।

—তোমার ছেলে ত আমরা কেড়ে নিচ্ছি না ভাই, আর তুমিও কোথাও যাচ্ছ না! তোমাদের দু জনার ত সব সময় দেখা-শোনা হবে। তবে আর এত অমত কেন তোমার?

বুঝলাম এ মেসোমশাই-এর গলা।

সবই বুঝছি চৌধুরী মশাই কিন্তু আমি যাগযজ্ঞ করে আমার ঐ একমাত্র ছেলেকে কিছুতেই পর করে দিতে পারব না। তা'ছাড়া ওসবের দরকারই বা কি—ওর ত তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই, আর ও তোমাদেরই থাকবে। যেদিন ওকে নিয়ে এখানে এসেছি, সেদিন থেকেই ত ও তোমাদেরই হয়ে গেছে। ওকে ত তোমাদেরই হাতে তুলে দিয়েছি চৌধুরী মশাই—মিথ্যে তবে আবার যাগযজ্ঞের প্রয়োজনটা কি—

শেষের দিকে মার গলার স্বর যেন কেমন জড়িয়ে এল, ভাল করে শোনা গেল না।

এমন সময় কারা যেন সব সেই দিকেই আসছিল, তাই আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম।

ব্যাপারটা খুব ভাল করে না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিলাম যে—তাঁরা সব আমার সম্বন্ধেই কথা বলছিলেন।

'যাগযজ্ঞ', 'পর করে দেওয়া'—ছোট ছোট কয়টা কথা সারাদিন আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনটা কেমন-কেমন করতে লাগল। কিন্তু তবু ব্যাপারটা ঠিক ভাল করে বুঝতে তখন পারছিলাম না বলে সব ভাল করে জানবার জন্য ভেতরে ভেতরে বেশ ব্যস্তও হ'য়ে উঠলাম।

কিন্তু উপায় নেই—কাকেই বা জিজ্ঞেস করি?

রাত্রে হঠাৎ এক সময় আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। অন্ধকার ঘর, কে যেন আমার খুব কাছেই ফুলে ফুলে কাঁদছে মনে হলো।—কে কাঁদে? প্রথমটা ত ভাল বুঝতেই পারলাম না। শেষে আঁধারটা চোখে বেশ একটু একটু স'য়ে

গেলে দেখলাম বিছানার এক পাশে মা-ই শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

ঐ গভীর রাত্রে কেন যে মা অমন ক'রে কাঁদছে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। ধীরে ধীরে মার কাছে সরে গিয়ে বসলাম, ডাকলাম,—মা! মাগো!

কিন্তু মা আমার ডাকে কোন সাড়া-শব্দ দিল না, আগের মতই কাঁদতে লাগল বিছানার উপর উবুড় হয়ে শুয়ে।

মার গায়ে হাত দিয়ে আবার ডাকলাম,—মা!

মা ধীরে ধীরে বিছানার ওপর উঠে বসল; হঠাৎ দুই হাতে আমাকে বুকে আঁকড়ে ধরে কান্নাভরা সুরে ডাকল—নিমাই!

এখানে আসার পর অনেক দিন মার এমন আদর পাই নি, তাই একান্ত লোভীর মতই মার বুকের কাছে আর একটু ঘেঁসে যেয়ে তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললাম—কেন মা?

—নিমু—

—তুমি কাঁদছ মা?

নিমু!—চল্ বাবা, এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই—আমাদের বাড়ীতে—আমাদের সেই কুঁড়েঘরে, এ রাজপ্রাসাদে আমাদের দরকার নেই বাবা!

মার কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম; বললাম; কেন মা, চলে যাবে কেন?

হ্যাঁরে, তোর সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না? সেই ছোট্ট ঘর আমাদের; সেই খাল, বিল, নদী, মাঠ—সে-সব তুই নিশ্চয়ই ভুলতে পারিস নি বাবা? সে-সব যে তোর নিজের।

সে সত্যি, কিন্তু এখানকার সবও ত খারাপ নয় মা। আর এখানকার বাড়ী কত বড়, এখানে কত লোকজন, কত ভাল ভাল সব খেলার জিনিস! মেসোমশাই মাসীমাও আমাদের কত ভালবাসেন! তবে কেন তুমি এসব ছেড়ে চলে যেতে চাইছ মা? তা'ছাড়া আমরা চলে গেলে মেসোমশাই আর মাসীমা হয়ত মনে কষ্ট পাবেন—

আমার কথা শুনে মা চুপ করে রইল, একটি কথাও বলল না।

আমি মার হাত ধরে একটু নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী ভাবছ মা! বল না—

কিছুই না, তুই ঘুমো!—

অন্ধকারে ধীরে ধীরে অতঃপর শয্যা থেকে উঠে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় ঘরের কুলুঙ্গীতে প্রদীপটা জ্বলছিল সেটা নিভিয়ে দিয়ে গেল।

প্রদীপের আলোয় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল—মার মুখ যেন সাদা হয়ে গেছে, সেখানে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। বাকী রাতটুকু আর ঘুম হ'ল না।

ভাল করে ভোর হওয়ার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। প্রত্যেক দিন ভোরবেলা নিশীথবাবুর সঙ্গেই বেড়াতে যেতাম—কোন দিন নদীর ধারে, কোন দিন মাঠে। বেড়াতে বেড়াতে কত জিনিসই যে তিনি আমায় গল্প করে করে বলতেন বোঝাতেন শেখাতেন।

আজ তাঁর ঘরে না গিয়ে, ঘর থেকে বের হয়েই সোজা নদীর ধারে চলে

গেলাম একা একাই।

ভোরের আলো তখন সবে ফুটি ফুটি করছে। রাজবাড়ীর নহবৎখানায় শানাইয়ের বুকে রামকেলী বাজছে। ঐ দূরে দিগ্‌বলয়ে, নদীর কোল ঘেঁসে রাঙা সূর্য জল-শয্যা ছেড়ে সবে উঠে বসছে! দু-একটা গাঙচিল নদীর ধারে উড়ে উড়ে মাছ ধরে বেড়াচ্ছে। নদীর বুক থেকে একটা ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা জলো হাওয়া মনটাকে ও সেই সঙ্গে দেহটাকে যেন জুড়িয়ে দিয়ে গেল।

নদীর ধারে একা একা বসে কেন যে মা অমনভাবে এখান থেকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন, সেই কথাটাই বার বার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এখানকার এই খেলনা, এত বড় বাড়ী, এত ভাল ভাল পোষাক, এত ভাল ভাল খাওয়া—এসব ছেড়ে আবার সেই ছোট খড়ের-ছাওয়া ঘরখানিতে ফিরে যাব—সে-কথা ভাবতেই যেন আমার মন কেমন-কেমন করতে লাগল।

মার ওপর একটু রাগও যে না হ'ল তাও নয়। শুধু শুধু কষ্ট পেয়ে কী লাভ?

সেখানকার সেই মানুকে, গোব্‌রা! কী অসভ্য নোংরা তারা। দিনরাত ধুলো কাদা বালিতে খেলে বেড়ায়। সেখানে কি করে যে অতদিন তাদের সঙ্গে হৈ-হৈ করে বেড়াতাম সে-কথা ভাবতে আমার আজ যেন বিশ্রী লাগতে লাগল গা ঘিন ঘিন করতে লাগল।

তারপর সেই মোটা চালের ভাত আর শুধু ডাল, আর এখানে গরম গরম পোলাও লুচি আর কত রকম তরকারী! রোজ রোজ বড় বড় মাছের মুড়ো!

তা'ছাড়া এখান থেকে চলে যাবোই বা কেন, এরা সকলে আমাদের কত ভালবাসে কত আদর যত্ন করে—কত আপনার জন এরা!

ভাবলাম দুপুরে মাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে—যাতে এখান থেকে যাওরাটা বন্ধ করে—যাওয়ার কথাটা মা ভুলে যায়।

বেশ একটু বেলা করেই বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ীতেই ঢুকতেই একজন চাকর ব্যস্ত হয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে,—কোথায় গেছিলেন দাদাবাবু? বাড়ীর সব যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

আমি তার কথায় কোন জবাব না দিয়ে—বরাবর ওপরে নিজের পড়ার ঘরের দিকে চলে গেলাম।

দোতলায় আমার পড়ার ঘরটা ভারি সুন্দর। মেসোমশাই-এর লাইব্রেরীর ঘরের পাশের ঘরটাই আমার পড়ার ঘর হয়েছিল। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, মাঝখানে একটা দামী মেহগনী কাঠের চমৎকার পালিশ করা গোলটেবিল, তার দু'পাশে দু'খানা চেয়ার—একটা আমার জন্য, অন্যটা মাস্টার মশাইয়ের জন্য। এক কোণে পর পর দুটো আলমারী, একটাতে ভর্তি নানা রকম বই। তাদের সব কয়খানার গায়ে সোনার জলে আমারই নাম লেখা।

আর একটায় আমার খেলার সমস্ত জিনিস—থরে থরে সাজান। এই সবকিছু ফেলে আমি কোথায় যাব? যেদিকে চাই সবই যে আমার জিনিস।

মনটা যেন সহসা কেঁদে ওঠে। এসব ফেলে কোথায় যাবো আর কেনই

বা যাবো ?

মনে হলো—মার অন্যায়। কষ্টের পর যখন আরাম এসেছেই আবার কেন সাধ করে কষ্টের মধ্যে দুঃখের মধ্যে গিয়ে পড়ব! না, না—আমি যাবো না। কিছুতেই না।

॥ পাঁচ ॥

বাড়ীতে ফিরে আমি সোজা আমার পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম!

নিশীথবাবু দরজার দিকে পিছন ফিরে একটা চেয়ারে বসে সামনে ঝুঁকে পড়ে বোধ হয় একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলেন। পায়ের শব্দে পিছন ফিরে চাইতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

মৃদু স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন, এসো নিমাই।

হঠাৎ আজ সকালে তাঁকে এড়িয়ে একা একা বাইরে বেড়াতে যাওয়াটা হয়তো তত ভাল হয় নি। তিনি কি ভাবলেন, এই সব ভাবতে ভাবতে ভেতরে ভেতরে বেশ একটু যেন লজ্জাই লাগছিল এবং ঘরে প্রবেশ করবার সময়ও একটু দ্বিধা লাগছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি যখন গভীর স্নেহে হেসে আমায় ডাক দিলেন, একটু আগের 'কিন্তু' ভাবটা তখন আর রইল না।

তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে আগের মতই স্মিত ভাবে বললেন, আজ সকালে বেড়াতে যাও নি ?

হ্যাঁ, গেছিলাম নদীর ধারে।

বেশ।

তারপর হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন,—কিন্তু তোমাকে এত শুকনো শুকনো লাগছে কেন নিমাই—কাল রাত্রে কি ভাল ঘুম হয় নি ?

নিশীথবাবুর কথায় আমি বেশ একটু বিস্মিত হয়েই ওঁর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—ওকথা কেন বলছেন মাস্টার মশাই ?

—না, এমনি—যাক আজ কি পড়াব বল।

—ইতিহাস পড়বো মাস্টার মশাই।

—বেশ পড়।

বই খুলে পড়তে আরম্ভ করলাম। কিন্তু পড়তে যেন একটুও ভাল লাগছিল না। কেবলই গত রাত্রে মার সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল সেগুলো মনে পড়তে লাগল এবং পরে প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে মার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় ফ্যাকাশে চেহারাটা আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল। পড়তে গিয়ে কেবলই যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি।

হঠাৎ নিশীথবাবু ডাকলেন,—নিমাই!

ডাক শুনে আমি তাঁর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালাম।

তিনি বললেন,—আজ তোমার হল কি ?…দেখি। শরীর সুস্থ বোধ করচো তো ? সস্নেহে তিনি তার ডান হাতখানি বাড়িয়ে আমার কপালে ছুঁইয়ে বললেন,—কই না—শরীর ত বেশ ঠাণ্ডাই মনে হচ্ছে। পড়তে আজ ভাল লাগছে না ? তবে না হয় থাক।

যে কথাটা তখন মনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করছিল সেটা প্রকাশ না করে আর পারলাম না। বললাম, আচ্ছা মাস্টার মশাই! একজনের খুব দুঃখ। এখন হঠাৎ যদি সে সুখের মধ্যে এসে পড়ে, তবে তার কি করা উচিত ?

—আগে ভেবে দেখতে হবে, যে সুখটা হঠাৎ কোথা হ'তে কেমন করে এল। কারণ আপাতঃ দৃষ্টিতে যেটা সুখ বলে মনে হচ্ছে তার পিছনে হয়ত কোন দুঃখ রয়েছে। তারপর একটু থেমে বললেন, কি জান নিমাই, বিচারে অনেক সময় আমরা ভুল করি—এবং প্রথম দৃষ্টিতে অনেক সময় হয়ত ত্রুটিটা চোখে পড়ে না।

—কি করব তখন ?

—তখন বিজ্ঞজনের পরামর্শ নেবে—যিনি তোমার চাইতে ভাল বোঝেন, যিনি অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন, তাঁর কাছে পরামর্শ চাইবে তিনিই তোমায় বলে দেবেন,—তিনিই তোমায় পথ দেখাবেন।

তারপর আবার একটু থেমে বললেন ঃ

আর একথাটা কখনও ভুলো না—ভাল মন্দ মিশিয়েই সব জিনিস কিন্তু সেই ভাল মন্দর থেকে—হাঁস যেমন দুধ ও জল একত্রে মিশিয়ে দিলে শুধু দুধটুকুই তুলে নেয়, তোমাকেও ঠিক তেমনিভাবে ভালটুকুই বেছে নিতে হবে।

নিশীথবাবু আরও বললেন,—মানুষের সব চাইতে বড় জিনিস হচ্ছে সংযম। সংযমী না হ'লে মানুষ বড় হতে পারে না এবং সংযমের সাধনাই মানুষের জীবনে বড় হবার একমাত্র মূলমন্ত্র।

তা'ছাড়া ভেবে দেখো মানুষ বড় হয় কিসে ?—সংযম, দৃঢ়তা, ক্ষমা, স্নেহ, ভালবাসায় ; নয় কি ?—এই পর্যন্ত বলে নিশীথবাবু থামলেন।

কোথায় যেন একটা সন্দেহ তবু মনের মধ্যে বারে বারেই উঁকি দিয়ে যেতে লাগল। দুপুরে খেতে বসে মনে হতে লাগল—এখানকার অন্ন-ব্যঞ্জন অতি সুস্বাদু, আর অতি লোভনীয় এখানকার আসবাব, জিনিসপত্র, খেলার পুতুল, রং-বেরংএর মজাদার সব সুন্দর সুন্দর গল্পের বই। এই অত বড় বাড়ী, ঘর দোর—এ ত সবই আমার! আমার জন্যই ত সব—এসব ছেড়ে কোথায় যাব ?—আমি যাব না !—আমি যাব না !

দুপুরবেলা মাকে খুঁজলাম ; কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না।

রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে দেখি, মার কাজ তখনও সারা হয় নি। মা তখনো আসেনি।

বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল, দেখলাম বিছানা খালি,—মা নেই !—

মা যে কাজ সেরে রাত্রে কখন এসেছেন শুতে যেমন টের পাইনি, তেমনি কখন উঠে চলে গিয়েছেন তাও টের পাইনি, ঘুম ভাঙ্গলেও যেন উঠতে ইচ্ছা করে

না—শুয়ে থাকি। মার কথাই কেবল মনে হতে থাকে। মা কি আমার উপরে রাগ করল। কথাটা ভাবতে ভাবতে সহসা কেন না জানি চোখ দুটো জলে ভরে আসে।

।। ছয় ।।

আরও দিন পনের পরের কথা।

একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতেই মনে হল বাড়ীতে যেন খুব একটা বড় রকম আয়োজন লেগে গেছে। ব্যাপার কি—বাইরে বের হলাম, বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচে উঁকি দিতেই চোখে পড়ল—বাড়ীর ভেতরে উঠোনে চাঁদোয়া খাটিয়ে, কত সব পুজোর দ্রব্য সাজান হয়েছে। দরজার গোড়ায় কলাগাছ পোঁতা হয়েছে, মাটির কলসীর ওপরে ডাব বসিয়ে সিন্দুর মাখিয়ে দিয়েছে। শানাইয়ের মধুর আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসছে।

সবাই ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। চাকর-বাকর, সরকার-গোমস্তারা যেন খুব ব্যস্ত।

ব্যাপারটা কি আরো ভাল করে জানবার জন্য নীচে নামছি—সিঁড়িতেই মাসীমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা লাল টুক্‌টুকে চওড়া-পেড়ে গরদের শাড়ী তিনি পরেছেন, বোধ হয় একটু আগে স্নান করেছেন, ভিজে চুলের গোছা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে! তাঁকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল সেদিন।

আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, কি বাবা, ঘুম ভাঙ্গল।

আমি মাথা হেলিয়ে জবাব দিলাম, হুঁ।

যাও—নীচে যাও, স্নান করে নাও তাড়াতাড়ি, কথাটা বলে মাসীমা আর দাঁড়ালেন না—উপরে চলে গেলেন।

নীচে এসে একজন দাসীকে জিজ্ঞেস করলাম—আজ বাড়ীতে এত হৈ চৈ কেন—কি পুজো?

সে হাসতে হাসতে জবাব দিলে,—ওমা পুজো কি গো, আজ যে রাজাবাবু তোমায় দত্তক নেবেন গো!

দত্তক নেবেন!

হ্যাঁগো।

তার মানে—

তার মানে হ'ল, আজ থেকে তুমি রাজাবাবুরই ছেলে হবে।

কি? রাজাবাবুর ছেলে হব মানে?—

এমন সময় দূরে মাকে আসতে দেখে সে বললে—ঐ যে তোমার মা আসছেন, ওঁকে শুধোও। কথাটা বলে দাসী আপন কাজে চলে গেল। মা কাছে এগিয়ে এল।

মার মুখ যেন খুব শুক্‌নো ও গম্ভীর মনে হল। চোখের পাতা দুটো

ভারী! আমি মার মুখের দিকে চেয়ে বললাম,—এরা সব কী বলছে মা?

মা অন্য দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে বললে,—ঠিকই তো বলেছে। তোমার মেসোমশাই ও মাসীমার কোন ছেলে-পিলে নেই কিনা তাই তোমাকে ওঁরা আজ থেকে ছেলে বলে গ্রহণ করছেন। আজ হতে ওরাই হবে তোমার মা ও…

বাকীটুকু আর মার গলা দিয়ে বের হ'ল না; তিনি ধীরপদে সেখান হতে চলে গেলেন।

আমি অবাক হয়ে মার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এমন সময় বাইরে সহসা একসঙ্গে অনেকগুলো ঢাক-ঢোল ঢুম্ ঢুম্ করে তুমুল শব্দে বেজে উঠ্ল।

এ যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মস্ত বড় একটা স্বপ্ন দেখা। কোথা দিয়ে কেমন করে যে কী হয়ে গেল। আজ সে-সব আমার স্পষ্ট মনে পড়ে না। সমস্ত দিন ধরে আমাকে নিয়ে পুজো আর মন্ত্রপড়া চলল।

মনের মধ্যে যেন কেমন বিশ্রী লাগছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল মার কাছে ছুটে যাই। কিন্তু আশেপাশে কোথাও মাকে দেখতে পেলাম না। বৃথাই আমার দৃষ্টি তাঁকে খুঁজে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল। চেনা-অচেনা অনেকেই আছে, শুধু আমার মা-ই নেই! সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে শুতে যাব এমন সময় দাসী এসে বললে,—রাজকুমার, আপনি আজ থেকে উপরের ঘরে শোবেন।

রাজকুমার! কথাটা শুনে আমি চমকে উঠলাম। ভাবলাম, এরা ত এতদিন আমায় 'দাদাবাবু' বলেই ডাকত, তবে আজ হঠাৎ কেন আবার 'রাজকুমার' ব'লে ডাকছে?

দাসীর মুখের দিকে চেয়ে বললাম,—আমাকে রাজকুমার বলছ কেন?

আমার কথা শুনে সে হাসতে হাসতে জবাব দিলে,—বলব না—আজ থেকে যে আপনি এ বাড়ীর রাজকুমার হলেন। চলুন উপরে আপনার ঘরে শোবেন চলুন।

দোতলার একটা বড় ঘরে আমার শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

প্রকাণ্ড খাটের ওপর গদী-মোড়া বিছানা। ঝালর-দেওয়া সুন্দর বালিশ। সাদা ধব্‌ধবে নেটের মশারী—হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে। দু'পাশে দেওয়ালে দুটো দেওয়ালগিরি জ্বলছে—সমস্ত ঘরে যেন আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে! সমস্ত ঘরময় ধূপের মনোরম গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

দাসী আমাকে ঐ ঘরের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে গেল। সুন্দর সাজান সেই ঘরের মধ্যে আমি একাকী দাঁড়িয়ে রইলাম। আর চারদিক থেকে আলো যেন ঠিক্‌রে পড়তে লাগল। এত বড় একটা ঘরে আমি একা, কেউ কোথাও নেই। কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। ভীরু-দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে দেখলাম। ভয়ে ভয়ে এক পা এক পা করে বিছানার ওপর গিয়ে উঠে বসলাম। তুলোর

মত মোলায়েম বিছানা আমার চাপে বসে গেল।

সহসা কেন যেন আমার ভয়ানক কান্না পেতে লাগল। বিছানার ওপর উবু হয়ে লুটিয়ে পড়লাম। হু-হু করে চোখে জল এল। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখম ঘুম ভাঙ্গল, রাত তখন অনেক। একটু পরেই কাছারীবাড়ীর পেটা-ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

একা একা ঘরের মধ্যে ভয় করছে, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে—বিছানা থেকে নেমে, এক পা এক পা করে দরজা খুলে বাইরে এলাম। চাঁদের আলোয় বাইরে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে আমাদের আগেকার শোয়ার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দরজাটা ঠেললাম, কিন্তু খুলল না, ভেতর থেকে বন্ধ। শুধু মনে হলো কার যেন চাপা-কান্নার শব্দ কানে এসে বাজছে।

খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ডাকলাম,—মা !...ওমা ! দরজা খোল না মা—আমি নিমাই।

মা—কিন্তু দরজা খুলল না।

হঠাৎ শুনতে পেলাম—দূরে একটা রাতজাগা পাখী ডানা ঝাপটে উড়ে গেল।

॥ সাত ॥

দত্তক নেওয়ার আসল মানে যে কি, অনেক দিন তা' ভালভাবে বুঝতে পারি নি। একজনের ছেলে যে কেমন করে একেবারে অন্যের হয়ে যায় এবং কেমন করে যে তা যেতে পারে, আর মা-ই বা কেমন করে নিজের ছেলেকে অন্যকে একেবারে দিয়ে দিতে পারে, সে-সব যেন আমার কাছে একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকার মতই ছিল।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—আমার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত খুব খারাপ লাগেনি। ভাল ভাল জামা কাপড়—নিত্য নতুন দামী দামী খেলনা—চমৎকার সাজান শোবার ঘর—পড়বার ঘর—এবং সবার মুখে রাজকুমার ডাক ও তাদের দেওয়া সম্মান ভালই লাগত।

কিন্তু সে যাই হোক, এই ঘটনার পর থেকে আমার মা যেন কেমন হয়ে গেল। মা আমাকে আগের মত আদর করা দূরে থাক আমাকে ডাকতও না—সামনেও বড় একটা আসত না। রাত্রে ত আলদা ঘরেই শুত। মোট কথা মার সঙ্গে দেখাশোনাও খুব কম হ'লেও—মা যেন ইচ্ছা করেই আমার সামনে থেকে সরে যেত। প্রথম প্রথম মার এই রকম ব্যবহারে আমার অত্যন্ত দুঃখ হ'ত, পরে মার ওপর অভিমানও এল। শেষটায় সেই অভিমান এত বেশী হ'ল যে, আমিও আর পারতপক্ষে মার কাছে নিজেই ঘেঁসতে চাইতাম না।

হয়ত দূরে মাকে আসতে দেখেছি, ইচ্ছা হ'ত আগের মত ছুটে গিয়ে দু'হাতে

মাকে জড়িয়ে ধরি—কিন্তু যেতাম না। চোখের কোল দুটো জ্বালা করে জল আসত। সবার অলক্ষ্যে চোখের জল মুছে নিতাম। তারপর ছুটে অন্যদিকে পালিয়ে যেতাম।

প্রথম প্রথম একা একা এক ঘরে শুতে বড় ভয় করত। শোবার পরও অনেকক্ষণ কিছুতেই ঘুম আসত না। খুট্ করে যদি কখন একটা শব্দ শুনেছি —অমনি বুকের মধ্যে যেন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে ধ্বক্ করে উঠেছে—শুয়ে শুয়েই ভয়ে ভয়ে চারদিকে চেয়ে দেখেছি, কিন্তু যতক্ষণ না ঘুম এসেছে ভয় আর কাটে নি।

কতদিন এমন ভয় করেছে যে, বিছানায় শুয়েই চোখ বুজে পড়ে রয়েছি ; চোখ বুজে বুজে কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ভেবেছি, যেন কাদের দেখেছি—তারা দেখতে ভীষণ, ওই ছাতে গিয়ে মাথা ঠেকেছে, গা ভর্তি বড় বড় বিশ্রী লোম ; আগুনের গোলার মত ইয়া-বড় বড় চোখ, যেন আমারই দিকে চেয়ে আছে! চোখ খুললেই তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাবে, আর রক্ষা থাকবে না।

ভয়ে সমস্ত গা ঘামে ভিজে গেছে, পাশ ফিরতে পর্যন্ত সাহস হয় নি, যদি তাদের সঙ্গে গা ঠেকে যায়।

ইদানীং মা যেমন দূরে সরে গিয়েছিল মাসীমা তেমনি যেন আরো কাছে এসেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে রাত্রে আমি আমার ঘরে শুতে আসবার পর মাসীমা সেই ঘরে এসে ঢুকেছেন ; ডেকেছেন, 'বিনু!—'

আস্তে আস্তে চোখ খুলে চেয়েছি। একটা কথা বলা হয় নি—দত্তক নেবার পর আমার নতুন করে নামকরণ হয়েছিল—বিনয়। এবং মাসীমা আমাকে ঐ নামেই ডাকতেন। বিনু বা বিনয় বলে ডাকতেন। কই ঘরে কেউ নেই ত! কি সব মাথামুণ্ড ভাবছিলাম।

মাসীমা হয়ত বলতেন—কি রে ঘুমোস নি?

আমি আস্তে আস্তে বলতাম,—না ত।

—তবে অমন করে চোখ বুজে পড়ে ছিলি যে?

হেসে বলতাম,—অমনি।

কিন্তু রোজ রোজ এমনি করে ভয় পেয়ে শেষটায় একদিন মাসীমাকে বললাম, —একা ঘরে শুতে আমার বড্ড ভয় করে।

তা এতদিন আমাকে বলিস নি কেন। ঠিক আছে আজ রাত থেকে একজন তোর ঘরে শোবে।

সেই রাত থেকেই আমার ঘরে শোবার জন্য দাসী সুখদাকে আদেশ দেওয়া হ'ল। সে আমার ঘরের মেঝেয় শুতে লাগল। যতক্ষণ না ঘুম আসত তার সঙ্গে গল্প করতাম। তারও নাকি দেশের বাড়িতে আমারই বয়সী একটি ছেলে আছে। সে কেমন দেখতে—কি কি বই পড়ে, সে-সব গল্প সে করত, আর আমি শুয়ে শুয়ে শুনতাম। শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়তাম।

বাড়ীর মধ্যে দুটো লোককে আমার ভারি ভাল লাগত,—একজন ঐ দাসী সুখদা, আর একজন ঐ বাড়ীর রাখাল বংশী।

বংশী জাতিতে ভিল। তার যখন নয় বছর বয়স, সেই সময় মেসোমশাই একবার রাজস্থান বেড়াতে গিয়ে ওকে নিয়ে আসেন। সেই থেকে ও এ বাড়ীতেই আছে।

বংশীর কালো কুচকুচে রঙ—গাট্টা-গোট্টা বলিষ্ঠ চেহারা। মাথাভরা কালো কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরী চুল—কাঁধের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সে বাঁশী বাজাত।

রাত্রে যখন সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়ত—চারিদিক নিঝুম হয়ে আসত, বংশী জমিদার বাড়ীর বিরাট দীঘির রানায় বসে আপন মনে অনেকক্ষণ ধরে বাঁশী বাজাত। অনেক দিন তাঁর বাঁশী শুনেছি, কিন্তু প্রথমে ভাল বুঝতে পারি নি—কে বাজায়।

সেদিন রাত্রে যখন শুয়ে শুয়ে সুখদার সঙ্গে গল্প করছি—হঠাৎ সেই বাঁশীর সুর কানে এল।

সুখদাকে জিজ্ঞেস করলাম,—কে বাঁশী বাজায় ?

—ও ত বংশী।

বংশী !—সে কে ?

—এ বাড়ীর রাখাল।

—কই ওকে ত কোন দিন দেখি নি !

বাড়ীর বাইরেই ও থাকে। রাজাবাবুর ঘোড়া, গোয়ালের গরু দেখে, খায়-দায় আর বাঁশী বাজিয়ে বেড়ায়।

পরের দিন রবিবার থাকায় স্কুল বন্ধ। একজন লোক দিয়ে দুপুরের দিকে বংশীকে ডেকে পাঠালাম।

খানিক পরে কে ডাকল,—রাজকুমার !—

চেয়ে দেখি দরজার ওপর দাঁড়িয়ে উঁচু লম্বায় প্রায় আমারই সমান কিন্তু রীতিমত গাট্টা-গোট্টা একটি ছেলে।

ছেলেটি বললে,—তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছ ?

তার সুন্দর দেহের দিকে হাঁ করে চেয়ে ছিলাম। মাথা হেলিয়ে বললাম, —হ্যাঁ ; তোর নাম বংশী ?—

হাঁ—বলে সে দাঁত বের করে হাসতে লাগল। কী সুন্দর তার হাসি !

বংশীর কালো চুলের পাশে ছিল একটা লাল কৃষ্ণচূড়া ফুলের গুচ্ছ, আর ডান বগলে একটা বাঁশের বাঁশী।

বললাম,—তোর বাঁশী শোনার জন্য তোকে ডেকেছি, আমায় বাঁশী শোনাবি ?

—নিশ্চয় শোনাব, কখন শুনবে বল।

—তবে আজ সন্ধ্যাবেলা আসিস—।

—আসব, বলে সে চলে গেল।

এর পর থেকে প্রায় রাতে সে অনেকক্ষণ ধরে আমায় বাঁশী শুনিয়ে যেত।

আমার শোবার ঘরের সামনেই একটু খোলা ছাত ছিল—সেখানে দাঁড়ালে জমিদার বাড়ির পিছন দিককার সমস্ত বাগান ও দীঘিটা দেখা যেত। সেই ছাতে বসে বংশী বাজাত আর আমি শুনতাম। এক-একদিন বাঁশী শুনতে শুনতে কত রাত হয়ে গেছে। সুখদা এসে ডেকেছে—রাজকুমার, শুতে চল। আর রাত করলে রাণীমা বকবেন।

বংশীকে সে রাতের মত বিদায় দিয়ে আমি শুতে যেতাম। স্বপ্নের মধ্যেও আমার দু' কানে বাঁশীর সুর কতদিন থামে নি।

॥ আট ॥

একদিন শুতে এসে সুখদা আমায় বললে,—রাজকুমার, আর তুমি রাণীমাকে "মাসীমা" বলে ডেকো না, এবার থেকে "মা" বলে ডেকো এখন উনিই ত তোমার আসল মা।

আমি হেসে জবাব দিলাম,—দূর! তুই একদম বোকা। উনি আমার মা হতে যাবেন কেন? উনি ত মাসীমা। কেন—তুই কি আমার মাকে দেখিসনি?

হ্যাঁ; আগে উনি তোমার মা-ই ছিলেন বটে, কিন্তু আজ ত আর উনি তোমার মা নেই, তোমায় যে দিয়ে দিয়েছেন।

দিয়ে দিয়েছেন—কথাটা ধুবক্ করে আমার বুকে এসে বাজল সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন কেমন হয়ে গেল। কয়েক মাস আগের একটা দিনের কথা সহসা আমার মনের মাঝে জেগে উঠল।

কিন্তু নিজের মাকে বাদ দিয়ে আর একজনকে মা বলে ডাকব—এ কিছুতেই আমার মন সায় দিল না। আর কেনই বা মাসীমাকে মা বলে ডাকতে যাব; কী-ই বা তার দরকার? কেউ মাসীমাকে আবার মা বলে ডাকে নাকি!

কিন্তু এরপর থেকে শুধু সুখদা কেন, অনেকেই আমায় মাসীমাকে মা বলে ডাকতে বলতে লাগল। এমন কি, শেষটায় মাসীমাও একদিন তাই বললেন।

সব কথা একবার মাকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করব ঠিক করলাম।

একদিন রাত্রে মা শোয়ার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। ভিতর থেকে সাড়া এলো, কে রে?

বললাম,—আমি নিমাই দরজাটা খোল না মা?

দরজা খুলে গেল। আমি আর অভিমান করে দূরে থাকতে পারলাম না, ছুটে গিয়ে একেবারে দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মাও আমায় বুকের মাঝে টেনে নিল।

আজ কতদিন পরে মাকে কাছে পেয়ে আমার চোখ জলে ভরে গেল। কতক্ষণ এইভাবে থাকার পর মা আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগল, তারপর ডাকল,—নিমাই।

—মা চল এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই।

তা আজ আর হয় না বাবা, তোকে আজ আমি অন্যের হাতে বিলিয়ে দিয়েছি।—

কিন্তু হয় না কেন মা? কেন তুমি আমায় ওঁদের দিয়ে দিলে মা?—আমি ত তাঁদের হব না, কিছুতেই হব না—তা তুমি দেখে নিও মা?—

আমার মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে আস্তে আস্তে মা বলল,—তোরই ভালর জন্য আমি তোকে দিয়েছি বাবা। লেখাপড়া শিখে বড় হবি, সকলে কত ভাল বলবে।

এখানে থেকে আমি ভালও হতে চাই না। আমাদের সেখানে—সেই হরিণগাঁয়ে—ফিরে চল মা। সেখানে গিয়ে আমি বড় হব, ভালও হব।

কিন্তু তোর মা যে বড় গরীব বাবা। তোকে পড়াবার, মানুষ করে তোলবার মত টাকা কোথায় পাব?

আচ্ছা তুমি মাসীমার কাছ থেকে অনেক টাকা চেয়ে নাও না কেন? তাঁর ত কত টাকা! পরে আমি বড় হলে সব আবার শোধ করে দিও।

—শুধু শুধু উনি আমাদের টাকা দেবেন কেন?

বাঃ রে! বোনকে বোন টাকা দেবে—এ বুঝি শুধু শুধু! আমার ছোট বোনকে আমি টাকা দেব না?

—সবাই কি বোনদের টাকা দেয়?—দেয় না।

তুমি চেয়ে দেখো না কেন একদিন। বেশ, আমিই না হয় কাল মাসীমার কাছে চাইব; আমায় ত খুব ভালবাসেন—নিশ্চয়ই দেবেন দেখে নিও।

—ছিঃ বাবা, কারও কাছে কখনও কিছু চাইতে নেই। ভগবান তাতে অসন্তুষ্ট হন।

তারপর একথা সে কথার পর বললাম,—তাই বলে মাসীমাকে আমি কিছুতেই মা বলে ডাকতে পারব না।

মাসীমা আর মা—এর মধ্যে তফাৎ ত কিছু নেই বাবা; মার বয়সী সকলকে মা বলা যেতে পারে। তুমি ত তাঁকে মাসীমা বলেই ডাক, এখন হতে সেই মাসীমার মাসী বাদ দিয়ে শুধু মা বলে ডেকো। আর কারও মনে কষ্ট দিতে নেই। তুমি যদি তাঁকে মা বলে না ডাক তবে তিনি তোমার ওপর কত অসন্তুষ্ট হবেন। তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন, আর তুমি তাঁকে মা বলতে পারবে না?

আচ্ছা সে না হয় দেখা যাবে। তুমি কিন্তু আমার সত্যিকারেরই মা, আর উনি আমার মিথ্যেকারের মা।

আমার কথায় মা হেসে ফেলল, বলল,—ওরে পাগল মা আবার কখন সত্যিকারের আর মিথ্যেকারের হতে পারে রে? মা, মা-ই—আর কিছু নয়।

তুমি কিন্তু আর আমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে পারবে না। তা হ'লে আমি ভারি রাগ করব। মাঝে মাঝে কেন তুমি এমন দুষ্টু মা হও বলত?

মা আমার কথায় কোন জবাব দিল না। হঠাৎ আমার হাতে এক ফোঁটা গরম জল পড়তেই চম্‌কে উঠলাম ; বললাম,—এ কি মা, তুমি কাঁদছ ?

—মা জবাব দিল,—না বাবা, কাঁদি নি ত।

—আজ আর ওপরে শুতে যাব না মা, আজ এখানে তোমার কাছেই শুয়ে থাকব। কতদিন তোমার কাছটিতে—তোমার গলা জড়িয়ে শুই নি বলত ?

মা বলল, না বাবা উপরেই শুতে যা—

কিন্তু কিছুতেই আমি গেলাম না। সে রাত্রে আর ওপরে গেলাম না। মার গলা জড়িয়ে তাঁর বিছানাতেই শুয়ে—অনেক দিন পরে পরমানন্দে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিন্তু আশ্চর্য—পরের দিন ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙ্গল—চেয়ে দেখি আমি আমার ঘরে আমার উপরের ঘরে রোজকার বিছানায়ই শুয়ে আছি !

গত রাত্রের কথা ভাবতে ভাবতে—সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে—পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

॥ নয় ॥

এর পর থেকে মা যেন আবার আস্তে আস্তে আগের মতই হ'য়ে যেতে লাগল। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছিলাম,—দিনের বেলা তত যেন মা আমার কাছে ঘেঁসত না, কিন্তু রাত্রে দেখা হ'লেই আমায় আগের মতই আদর করে বুকে টেনে নিত।

সেই রাত্রের পর হ'তে প্রায়ই আমিও প্রতি রাত্রেই মার ঘরে গিয়ে শুতাম। সেদিনও অনেক রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে নিজের ঘর থেকে বের হয়ে নীচের সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি—হঠাৎ পেছন থেকে মাসীমার গলা শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

মাসীমা গম্ভীরস্বরে ডাকলেন—বিনয়—

মাসীমার এত গম্ভীর গলা এর আগে আর কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি—মার সঙ্গে কথা হওয়ার দিন থেকে আমি মাসীমাকে 'মা' ব'লেই ডাকতে আরম্ভ করেছিলাম।

মাসীমাও তাতে আমার ওপর বেশ খুশী হয়েছিলেন।

মাসীমা গম্ভীর হয়ে বললেন,—এত রাত্রে কোথায় চলেছ ? শুতে যাও।

আমি আবার এক পা এক পা করে নিজের ঘরে ফিরে গেলাম। সুখদা ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, মাসীমা ঘরে ঢুকে তাকে ঘুম থেকে তুলে আচ্ছা করে বকে গেলেন—কেন সে আমার দিকে নজর রাখে না ইত্যাদি। আর, যাবার সময় আমায় ঘুমোতে বলে গেলেন।

আজও আমার মনে আছে—সেই রাতটায় আমি শুধু 'মা মা' করে

কেঁদেছিলাম।

পরের দিন বিকালের দিকে স্কুল থেকে ফিরে, খেয়ে দেয়ে খেলতে বেরুচ্ছি হঠাৎ মায়ের ডাকে ফিরে দাঁড়ালাম। মা বলল,—নিমাই, শোন।

কী মা ?—বলে আমি এগিয়ে গেলাম।

তুই আর যখন-তখন আমার কাছে যাস না বাবা! আমি ত সব সময়ই তোর কাছে আছি। তবে কেন আমার কাছে যাবার জন্য অত ব্যস্ত হস বাবা?

সেদিন বুঝি নি, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম কত দুঃখে—কত মনঃকষ্টে মা আমার—ঐ কথা ক'টি বলেছিল!

ব্যাকুল মন আমার সর্বদাই মার কাছে ছুটে যাবার জন্য ছটফট করত—কিন্তু যেতাম না। কত সময় একা একা বসে কেঁদেছি। দূরে থেকে মাকে দেখেছি, কিন্তু কাছে যেতে পাই নি। যাবার উপায় নেই!

মাকে এইভাবে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য আমি এ বাড়ীর কাউকেই আর ভাল চোখে দেখতাম না। ওরা যেমন আমাকে মার কাছে যেতে দিত না, আমিও তেমন ওদের কাছে ঘেঁসতাম না।

একদিন মাসীমা আমার এই ছাড়া-ছাড়া ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন তোমার মন কী ভাল নেই, বিনু?

—কেন মা, হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন মা?

—না এমনি, তুমি সব সময়ই গম্ভীর হয়ে বেড়াও—

—ও অমনি!...ছুটির দিন—সারাদিন বাড়ীতে ভাল লাগে না।

—বেশ ত পুরীতে আমাদের একটা বাড়ী আছে, ওঁর সঙ্গে সেইখানেই গিয়ে দিনকতক ঘুরে এস না।

—পুরীতে—

—হ্যাঁ—যাবেত বল—ব্যবস্থা করি—

—যাবো।

পরের দিন থেকেই আমাদের পুরী যাওয়ার সব আয়োজন হ'তে লাগল, কিন্তু যতই যাবার দিন এগিয়ে আসতে লাগল, মনও যেন ততই বেশী খারাপ হতে লাগল। এখানে থাকতে তবু মাকে দিনের মধ্যে অনেকবার দেখতে পেতাম কিন্তু এখান থেকে চলে গেলে তাও ত দেখতে পাব না।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে এই সব কথা ভাবছিলাম, হঠাৎ পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি—মা। এ কি মা তুমি!—বলেই উঠে বসলাম।

তোর নাকি শরীর খারাপ হয়েছে বাবা?—বলে মা আমাকে বুকের ওপর টেনে নিলেন।

আমি মার বুকে মাথা রেখে, মাথাটা বুকে ঘসতে ঘসতে জবাব দিলাম—কে বললে?

—তোর মাসীমা বলছিল, তাই সব পুরী, না কোথায় যাচ্ছিস!

—না অমনিই বেড়াতে যাচ্ছি।

মা স্নেহ-ভরে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কতক্ষণ লোভীর

মত মার আদর ভোগ করলাম। হঠাৎ মা ব্যস্ত হয়ে বলল—এবার ঘুমো বাবা, রাত অনেক হ'ল।

আমি দু'হাতে মার গলাটা জড়িয়ে ধরে আব্দারের সুরে বললাম, আর একটুখানি থাক না মা!

না বাবা, তা হয় না। তোর মাসীমা জানতে পারলে হয়ত বকবেন। আমি এখন যাই।—বলে মা চলে গেল। আমার দুই চোখ ছাপিয়ে জল এল।

হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বংশীর বাঁশীর সুর কানে এসে বাজল। আমি ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে খোলা জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশে প্রকাণ্ড থালার মত চাঁদ উঠেছে। নীল আকাশের বুক ভরে যেন আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে!

সুখদা এসে ঘরে ঢুকল। আমায় তখনও জেগে থাকতে দেখে সে বললে—এখনও ঘুমাও নি রাজকুমার?

আমি বললাম,—না। আমার জন্য ও-ঘর থেকে একটা গল্পের বই নিয়ে এস ত সুখদা।

সুখদা বললে,—আমি ত লেখাপড়া কিছুই জানি না রাজকুমার, কোন্ বই আনব?

তাকে বলে দিলাম, কোথা থেকে কোন্ বইটা আনতে হবে। সে কথামত বই এনে আমার হাতে দিল। আমি আলোর কাছে গিয়ে বইটা খুলে বসলাম।

।। দশ ।।

দেখতে দেখতে পুরীযাত্রার দিন এগিয়ে এল। বাড়ীর সকলেই এমন কি নিশীথবাবুও আমাদের সঙ্গে যাবেন ঠিক হয়েছিল। শুধু যাবে না মা।

আগের দিন হ'তেই চাকর-বাকরেরা সব জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করছিল। কিন্তু আমার মন কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল।

প্রথমে খুব ছোটবেলায় মার মুখে এবং এখানে আসার পর নিশীথবাবুর মুখে সব দেশ-বিদেশের বিচিত্র গল্প শুনে কত দিন ভেবেছি,—আমি যখন খুব বড় হব, তখন শুধু নানান দেশে ঘুরে বেড়াব। আগ্রার তাজমহল, পুরীর সমুদ্র, দিল্লীর পুরাতন বাদশাহের অপূর্ব কীর্তির ধ্বংসাবশেষ, ঘুমের মাঝে আমায় কত দিন হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। কত দিন জেগে জেগেই, আমি যমুনার কালো জলে তাজের ছায়া কাঁপতে দেখেছি, জ্যোৎস্না রাতে তাজের মর্মর-সোপান-তলে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়েছি! আজ সেই পুরী, সেই নীল সমুদ্র আমায় ডাকছে! এতদিন সেই স্বপ্নের মাঝে পাশে পাশে ছিল আমার মা-মণি,—আর আজ?

ভাল লাগে না—আমার কিছুই ভাল লাগে না। পড়ার ঘরের খোলা জানলাটা দিয়ে সূর্যালোক ভেসে আসছিল, আমি বাইরের ফুলের বাগানের

দিকে তাকিয়ে ছিলাম। প্রজাপতির দল রামধনু-আঁকা পাখা মেলে ফুলে ফুলে মধু আহরণে ব্যস্ত। আহা! ওরা কত সুখী, আমি যদি হতাম ওই রঙ্গীন প্রজাপতি! ওই চাঁপাগাছের চাঁপাফুল!

মাস্টার মশাইয়ের মুখে শোনা রবিঠাকুরের সেই কবিতাটা মনে পড়ল,—

'আমি যদি দুষ্টুমি ক'রে
চাঁপার গাছে চাঁপা হ'য়ে ফুটি,
ভোরের বেলা মাগো ডালের 'পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি।
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা চিনতে আমায় পারো?'

হঠাৎ সুখদা এসে ডাকল,—রাজকুমার!

—কী?

—তোমার কি কি বাক্সে ভরতে হবে, দেখিয়ে দিয়ে যাও,—রাণীমা বললেন।

—যা! যা! আমি জানি না। আমাকে বিরক্ত করিস না—। তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু পরে মাসীমা নিজেই এলেন, অতএব এবারে যেতেই হ'ল।

সদর-দুয়ারে পালকী এসে দাঁড়িয়ে আছে। মার সঙ্গে একবার দেখা করব বলে কত খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না।

ওদিকে বাইরে থেকে ঘন ঘন ডাক আসছিল। চোখের জল চাপতে চাপতে পালকীতে গিয়ে উঠে বসলাম। পালকীর খোলা কবাট দিয়ে ওপরের দিকে চাইতেই হঠাৎ নজরে পড়ল, দোতলায় আমারই শোয়ার ঘরের জানলার শিকটা দুই হাতে চেপে ধরে মা আমার দাঁড়িয়ে আছে।

যতক্ষণ দেখা যায়, পালকীর খোলা কবাট দিয়ে ঝুঁকে পড়ে মাকে দেখতে লাগলাম। শেষে এক সময় সে-দৃশ্যটাও মিলিয়ে গেল।

ইচ্ছা হচ্ছিল এক লাফে পালকী হ'তে নীচে পড়ে এক দৌড়ে গিয়ে মাকে আমার দুটি হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরি।

পুরীতে সর্বত্রই নীলের খেলা—নীলের মেলা। নীল—ওপরের আকাশ! নীল—সমুদ্রের অথৈ জল! আকাশের নীলরঙ মিশে গেছে নীচের নীল জলধির সাথে! ঐ দূরে দূরে বড় বড় ঢেউ—একটার গায়ে একটা ভেঙ্গে পড়ছে, সাদা জলের ফেনা গড়িয়ে পড়ছে!

স্বর্গদ্বারের কাছেই—ঠিক সমুদ্রের কোল ঘেঁসেই আমাদের বাড়ি।

সকাল আর সন্ধ্যায় মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আসি। বালুর ওপর হেঁটে হেঁটে সমুদ্রের ধারে ধারে ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়াই।

গভীর রাত্রে ঘুমের ঘোরে শুনতে পাই দূরাগত অশ্রান্ত সমুদ্রের চাপা গর্জন—গম্-গম্-গম্! মনে হ'ত—এ বুঝি সেই রূপকথার বন্দী দৈত্যটা—আজও যার মুক্তি মিলল না!

পুরীর বাড়িতেও একা একাই একটা ঘরে শুতে হ'ত, অবিশ্যি ঘরের মেঝেয় ঘুমিয়ে থাকত সুখদা।

যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ত, তখন আমার চোখে একটুও ঘুম আসত না! বিছানায় একা শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে হয়েছে আমার মায়ের কথা।

পা টিপে টিপে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম—রাতের আঁধারে সমুদ্রের কালো কালো ঢেউয়ের দল সাদা ফেনার মুকুট মাথায় এঁটে ছুটোছুটি করে ফিরছে।

তখন বার বারই মার কথা মনে হ'ত। আমি, ওই দূরের আকাশের একটি ছোট্ট তারার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতাম আমার মায়ের কথা; আর বলতাম,—'ওগো নীল আকাশের ঘুম-হারা ছোট্ট তারা, তুমি কি আমার মায়ের খবর জান? আকাশের বাতায়নে বসে তুমি কি তাঁকে দেখতে পাও?'

সেই রাজপুরীতে বসে মা কি আমার জন্য কেবলই কাঁদেন? তাঁকে তুমি বলো যে আমি ভাল আছি।

সে-রাত্রে হঠাৎ স্বপ্নে মাকে দেখে ঘুমটা টুটে গেল। ঘুম ভাঙ্গতেই মনে হল আমি যেন দেখছি মা আমার পাশটিতে বসে বলছে,—নিমু, কেমন আছিস বাবা?

পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

আকাশের বুকে আজ যেন চাঁদের আলোর বান জেগেছে—আর সেই চাঁদের আলোয় নীল সমুদ্রের বুকে জেগেছে রুপালী স্বপ্ন!

আকাশের একটি মাত্র চাঁদ কোটি কোটি হয়ে সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ একটা গানের সুর কানে ভেসে এল,—

'খোকার লাগি তুমি মাগো
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হয়ে বল্‌ব তোমায় "ঘুমো";
তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হ'য়ে ঢুক্‌ব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো।'

এ যে মাস্টার মশাইয়ের গলা! হ্যাঁ, সত্যিই তাই। চাঁদের আলোয় বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে গুনগুন করে মাস্টার মশাই গান করছেন।

ধীরে ধীরে এক পা এক পা ক'রে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ দুটো কখন যে জলে ভরে গেছে, টেরও পাই নি।

হঠাৎ মাস্টার মশাইয়ের ডাকে চমকে চাইতেই দেখি, কাঁধের ওপর দুটি হাত রেখে, সস্নেহে তিনি আমায় ডাকছেন—নিমাই!

আমি দুই হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম।

তিনি আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন,—দুঃখ-কষ্টকে সইতে পারাই ত মানুষের পরিচয়। দুঃখ যতই তীব্র ও দুঃসহ হোক না কেন,—ভেঙ্গে পড়লে ত চলবে না, নিমাই! হাসিমুখে সাহস-ভরে জীবন-পথে এগিয়ে চল। দেখবে সব একদিন সয়ে যাবে।

।। এগার ।।

দীর্ঘ এক মাস পরে পুরী থেকে ফিরে এলাম। মাকে একবারও না দেখতে পেয়ে এতদিন আমার কী ভাবেই না কেটেছে। আজ আর কারও কথা শুনব না ভেবে—প্রথমেই এক ছুটে মার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

দরজাটা খোলা—ঘরটা যেন হা-হা করছে।…মা নেই। ঘরের প্রত্যেক জিনিসপত্র যেখানকার যেমন ঠিক তেমনই আছে, শুধু মা-ই নেই।

ডাকলাম,—মা! ওমা! মাগো!

শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে এল—নাই! নাই! নাই!

আমার দু' চোখ ফেটে জল এল। ছুটে সুখদার কাছে গেলাম; গিয়ে ব্যাকুলভাবে বললাম,—সুখদা, আমার মা,—আমার মা কই! মাকে দেখছি না কেন—

সে কোন জবাব দিলে না, মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

একে একে বাড়ীর প্রায় সকলকেই জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কেউই কোন জবাব দিল না, চুপ করে রইল।

ছুটে মাসীমার ঘরে গেলাম। আজ আর তাঁকে 'মা' ব'লে কিছুতেই ডাকতে পারলাম না, অনেকদিন পরে আবার মাসীমা বলে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম,—মাসীমা, আমার মা কোথায়?

একটা বাক্সের ডালা খুলে তিনি যেন কি খুঁজছিলেন; আমার কথা শুনে মুখ না তুলেই অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন,—তোমার মা এখান থেকে চলে গেছে।

মাসীমার সেই একটুখানি জবাব পেয়ে আমার অবস্থা যে কেমন হয়েছিল বলতে পারি না। আমি যেন চারদিক অন্ধকার দেখলাম; মাসীমাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম,—মা চলে গেছেন? কোথায়?

জানি না।—বলে তিনি আপন মনে আবার নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন।

আমি খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা আমার শোয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সমস্ত দিনে একটি বারের জন্যও ঘর থেকে বের হলাম না। চাকর ভাত খেতে ডাকতে এসেছিল, তাকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম।

বিকালের দিকে ধীরে ধীরে উঠে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। টেবিলের উপর একটা বই পড়েছিল, আনমনে সেই বইটা নিয়ে তার পাতা উল্টাতে উল্টাতে, হঠাৎ একটা চিঠি হাতে ঠেকল। তার ওপরে লেখা রয়েছে—

নিরাপদ্ দীর্ঘজীবেষু—

নিমাই, বাবা আমার!

এ কি! এ যে আমারই মার হাতের লেখা। কাঁপতে কাঁপতে চিঠিটা খুলে ফেললাম। তাতে লেখা ছিল—

নিমাই, বাবা আমার।

আজ শুধু তোমার ভালর জন্যই তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি। এসে আমায় না দেখে হয়ত মনে খুব কষ্ট হবে, হয়ত কাঁদবে। কিন্তু কেঁদো না। আমি যত দূরেই থাকি না কেন, তোমার কাছ থেকে বেশী দূরে যাব না। ভাল করে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার চেষ্টা করো; আর কারও মনে কখনও কোন কষ্ট দিও না, তা'হলে আমার বড় কষ্ট হবে। ইতি—

—তোমার শুভার্থিনী মা।

ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু দু'চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে চিঠিটা ভিজিয়ে দিল। মাগো! কেন আমায় এখানে একাকী ফেলে গেলে? কেন আমায় তোমার সঙ্গে নিলে না মা? তোমায় ছেড়ে একা একা কেমন করে এখানে আমি থাকব মাগো—

গভীর রাত্রে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। নিকষ কালো অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী একাকার হয়ে গেছে। শুধু ওই দূর আকাশের গায়ে হেথা হোথা দু'একটা নক্ষত্র আগুনের ফুল্‌কার মত জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলছে।

মাঝে মাঝে রাতের হাওয়া চুপি চুপি আসা-যাওয়া করছে।

মা যে ঘরে শুত সেই ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোথায় যেন একটা বিড়ালের বাচ্চা মিউ-মিউ করে বোধ হয় তার মাকে খুঁজে ফিরছিল। দরজাটা ঠেলে অন্ধকার ঘরের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে মনে বললাম,—আমায় এখানে একা ফেলে কোথায় গেলে মা! কতদিন যে তোমায় একটি বারও দেখি নি।

মেঝের ওপর শুয়ে কত কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে বোধ হয় এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ বাঁশীর সুরে ঘুমটা ছুটে গেল। বংশী যেন কোথায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছে।

আস্তে আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে দালানে চলে গেলাম। মনে হ'ল দীঘির পার হ'তেই যেন সুর ভেসে আসছে। হাঁটতে হাঁটতে দীঘির ধারে গেলাম।

সব চাইতে নীচেকার ধাপে, যেখানে দীঘির জল এসে তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে সেইখানটিতে—জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে বংশীই আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছিল।

আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম তার পাশে। সে এত গভীর মনোযোগের সঙ্গে বাঁশী বাজাচ্ছিল যে, প্রথমটা আমার এখানে আসা সে টেরই পায় নি। আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার বাঁশী বাজান শুনতে লাগলাম। কী করুণ আর মধুর তার বাঁশীর আওয়াজ! চারদিককার আকাশ-বাতাসও যেন নীরবে কান পেতে তার বাঁশীর সুর শুনছে!

অনেকক্ষণ বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে সে যখন থামল, আমি তখন মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম,—বংশী!

সে চমকে উঠে মুখ তুলে পিছন দিকে তাকিয়ে বললে,—এ কি! রাজকুমার!

হ্যাঁ ভাই আমি।—বলে আমি ধীরে ধীরে তারপাশটিতে বসলাম।

আমার ব্যবহারে সে যেন বেশ একটু বিস্মিতই হয়েছে—মনে হ'ল। বাঁ হাতটা তুলে তার কাঁধের ওপর রাখলাম। হঠাৎ দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলাম, বললাম,—বংশী, আমার মা ?

সে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ কেঁদে, কতকটা সুস্থ হলাম।

বংশী বললে,—ঘরে চল রাজকুমার।

আমি তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে, দোলা দিতে দিতে বললাম, —দেখ বংশী, আমার একটা কথা শুনবি ?—

আমার মুখের পানে চেয়ে সে বললে,—কী ?

এবার থেকে আমায় তুই আর রাজকুমার বলে ডাকিস না, নিমাই বলে ডাকিস—কেমন বুঝলি ?

সে যেন আমার কথাটা ভাল ভাবে বুঝতেই পারে নি এমনি ভাবে অনেকক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ; তারপর, আবার কি ভেবে আমায় ঈষৎ আকর্ষণ করে বললে,—ঘরে চল।

তারপর দু'জনে হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এলাম।

।। বার ।।

দেখতে দেখতে আরও একটা মাস কোথা দিয়ে কেমন করে যেন কেটে গেল।

মা বলে গেছিলেন ভালভাবে পড়াশুনা করতে, তাই দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই পড়ার বই নিয়ে কাটাবার চেষ্টা করতাম—কিন্তু পারতাম না। পড়তে পড়তে হঠাৎ যে কখন আনমনা হয়ে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম কিংবা ভাবতে ভাবতে আমাদের হরিণগাঁয়ের ছোট কুঁড়ে ঘরটির দরজায় গিয়ে হাজির হতাম ! হঠাৎ যখন খেয়াল ভাঙ্গত—চেয়ে দেখতাম, বই যেমন খোলা তেমনই রয়েছে, একটি লাইনও পড়া হয় নি। আবার বইয়ের অক্ষরের দিকে মন দিতাম।

দিনরাত এইভাবে মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে শরীর আমার দিন দিনই ভেঙ্গে পড়ছিল। একদিন শোবার ঘরের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমি নিজেই চমকে উঠলাম,—ইস্‌ কী ভয়ানক রোগা হয়ে গেছি !

খাওয়া, খেলা, বেড়ান কিছুই যেন আর তেমন ভাল লাগত না।

এমনি করে দেখতে দেখতে দুর্গাপুজো এসে গেল। নাটমন্দিরে কারিগর প্রতিমায় রং চড়াতে লাগল। সেদিন মন্দিরের ধারে একটা টুলে বসে বসে প্রতিমায় রং দেওয়া দেখছিলাম, এমন সময় একজন ভিখারী এসে খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধরলে—

'দশ দিশি আলো করে
উমা আমার, আয় মা ঘরে।—'

ভারি মিষ্টি গলাটি তার। গান শেষ হ'লে, আমি তাকে বললাম,—আর একটা গান গাও-না ভাই!

সে অল্প একটু হেসে আবার গান ধরলে,—

'ওমা কোলের ছেলে ধুলো ঝেড়ে
তুলে নে কোলে,...'

গানের সুরের সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত প্রাণ-মন যেন হু-হু করে উঠতে লাগল।

দেখতে দেখতে আজ প্রায় দুই মাস হয়ে গেল তবু ত মা এলেন না!—মাগো! কোথায় তুমি?

ভিখারী তখন গাইছিল,—

'সারা দিন মা ক'রে খেলা
ফিরছি এই সাঁঝের বেলা......'

তার গান শেষ হ'লে তাকে বসতে বলে ভেতরে চলে গেলাম। বাক্স থেকে একটা টাকা এনে তার হাতে দিলাম। সে দু'হাত তুলে আমায় আশীর্বাদ করলে, —রাজা হও বাবা!—

আমার চোখের কোলে জল ভরে এল। হায়রে, আর যে আমি রাজা হতে চাই না। রাজা হওয়ার সাধ আমার মিটেছে, আর এ রাজপুরীর মোহও আমার কেটে গেছে; এখন চাই শুধু আমার সেই হারিয়ে-যাওয়া মাকে আর সেই ফেলে-আসা হরিণগাঁর ছোট কুঁড়েঘরখানি—যেখানে একদিন মার মুখে গল্পের রাজকুমার আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা শুনতে শুনতে দাওয়ায় চাঁদের আলোয় মার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তাম।

।। তের ।।

এমনি করে দেখতে দেখতে পুজোর দিন ঘনিয়ে এল। ঢাকের বাদ্যে চারদিক গম-গম করে উঠল। মাটির মা ত এলেন, কিন্তু আমার রক্ত মাংসের মা কি আসবে না? তাঁর কি আজও আসার সময় হ'ল না?

পুজোর দিনে আমাদের অতিথিশালায় কত দূরে দেশ থেকে হেঁটে হেঁটে কতই না লোক এসেছিল। তাদের মাঝে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম—যদি তারা আমার মায়ের কথা বলতে পারে। তারা কতজন হয়ত আমার মার পাশ দিয়েই হেঁটে এসেছে, হয়ত তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছে। মা কি তাদের কাছে আমার কথা কিছু বলে দেয় নি?—ছোট একটা কথা, 'কেমন আছ' কিংবা 'সুখে থেকো'—এমনি কিছু।

পুজোর তিন দিন বাড়ীতে যাত্রা-গান হত বরাবরই। এবারও বাইরে থেকে

যাত্রার দল এসেছিল। সুখদার কাছে শুনলাম—আজ নাকি 'বিজয়-বসন্ত' পালা হবে। মার মুখে একদিন বিজয়-বসন্ত গল্প শুনেছিলাম, তাই বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে গিয়ে গান শুনতে বসলাম।

নিষ্ঠুর রাজা বিজয়-বসন্তের মাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছোট ভাইটি কেঁদে কেঁদে দাদাকে শুধাচ্ছে,—

'ও দাদা বল বল,
আমার দুঃখিনী মা কোথায় গেল !...'

ওগো তোমরা বল আমার মাও ত হারিয়ে গেছে, তাঁকেও ত খুঁজে পাচ্ছি না! তাঁকে কি আর পাব না?

আগের দিন থেকেই শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল—জ্বর-জ্বর-ভাব। মাথাটাও বেশ ভার-ভার লাগছিল।

সারা রাত ধরে যাত্রা হ'ল। যখন যাত্রা ভাঙ্গল, তখন আর হেঁটে ঘরে যেতে যেন কিছুতেই ইচ্ছা হ'ল না, সেইখানে মাটিতে সতরঞ্চের ওপরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ সুখদার ডাকে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সুখদা বলছিল,—এ কি! রাজকুমার, তুমি এইখানে শুয়ে! আর আমরা সারাটা বাড়ী তোমায় খুঁজে মরছি।...উঃ! এ কি, গা যে তোমার জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গো!

সে আমায় বুকের ওপর তুলে নিল। সমস্ত শরীর তখন আমার যেন জ্বলে যাচ্ছে। চোখের পাতা খোলা যায় না—জ্বালা করে। হাত পা গায়ে অসহ্য বেদনা, মাথাটাও যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সুখদা কোলে করে নিয়ে গিয়ে আমায় ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিলে। একটু পরেই যেন কার মুখে সংবাদ পেয়ে মাসীমা এসে আমার ঘরে ঢুকে বললেন,—হ্যাঁরে সুখদা, বিনুর নাকি অসুখ করেছে?

আমার গায়ে হাত দিয়েই তিনি বললেন,—উঃ, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে, শীগগির কর্তাবাবুকে ডেকে আন তো?

সুখদা কর্তাবাবুকে ডাকতে নীচে ছুটে গেল।

তারপর আর ভাল করে সব আমার মনে পড়ে না। যখন জ্ঞান হ'ল চেয়ে দেখি, ঘরের এক কোণে একটা আলো জ্বলছে, আমার চার পাশে সব ওষুধের শিশি। মাথার কাছে মাসীমা বসে, একধারে বসে কর্তাবাবুও।

আমায় চোখ মেলতে দেখে মাসীমা উদ্বিগ্নভাবে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন; তারপর আকুল-স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,—কেমন আছিস বাবা!

আর একদিন মনে হ'ল কর্তাবাবু যেন মাসীমাকে বলছেন,—পরের ছেলেকে জোর করে কোন দিনও আপন করা যায় না। পরকে আপন করতে হ'লে তাকে সময় দিতে হয়। ওর মাকে এভাবে ওর কাছ থেকে জোর করে দূরে সরিয়ে

দিয়েই তুমি এমনি করলে। ছেলেটা ভেবে ভেবেই এমনি করে শুকিয়ে গেল।

আর একদিনের কথা। মনে হ'ল মাসীমাই যেন কাকে বলছেন,—ডাক্তার কী বললে?

উত্তর হ'ল,—এখন ওকে ভাল করে তুলতে হ'লে, ওর মাকে নিয়ে আসা ভিন্ন আর উপায় নেই।

তবে তাই কর—ওর মাকেই এনে দাও। বাছা আমার আগে ত বেঁচেই উঠুক।—মাসীমা ব্যগ্রভাবে বললেন।

তারপর হঠাৎ একদিন যেন আমার অত্যন্ত পরিচিত একটা গলার আওয়াজ কানে ভেসে এল—

নিমাই—নিমু! বাবা আমার।

এ যে আমারই মার কণ্ঠস্বর! তবে কি আমার মা-ই আবার ফিরে এল। ফিরে এসেছ মা? তোমার নিমাইকে দেখতে আবার ফিরে এলে কী? ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে চোখ খুললাম; দেখলাম এক জোড়া জলভরা চোখ আমার মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চেয়ে আছে।

মা! মাগো! সত্যিই তুমি এলে মা?

হ্যাঁ বাবা, এই যে আমি এসেছি।

এবার আমি শীগগিরই ভাল হয়ে উঠব। এতো তোমাকে ডাকতাম, তুমি কোথায় ছিলে মা?

শীর্ণ হাত দুটি তুলে মার গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকে মুখটা গুঁজে আদরের সুরে ডাকলাম,—মা, মা! মাগো!

লাল চিঠি

অনুরোধ আছে। আশা করি তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে সেটা রাখতে চেষ্টা করবে। তোমার সিন্দুকে উইল অনুযায়ী তোমার বোনকে দেওয়ার জন্য তোমার মায়ের যে হীরার হারটী আছে সেটা এই চিঠি পাওয়ায় এক মাসের মধ্যে যেমন করে হোক, পোড়ো মন্দিরের দরজায় সন্ধ্যার দিকে রেখে আসবে। তা হলেই সেটা আমার হস্তগত হবে।

দেবীর পূজায় সেই সামান্য জিনিসটুকু উৎসর্গ করব, এই মনস্থ করেছি।

কশ্চিৎ কালীভক্ত।

পুঃ—যদি ধার্য দিনের মধ্যে আমার হাতে হার না এসে পৌঁছায় তবে যেমন করে হোক সেটা হস্তগত করতে আমি পশ্চাৎপদ হব না জানবে।

আশ্চর্য! সুব্রত বললে।

আমার বোনের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল আগামী মাঘ মাসে। কিন্তু এই চিঠিটা পাওয়ার পর দিন বদলে ফেলেছি—সামনের তেসরা অঘ্রাণ। কেন না এক মাসের শেষ দিন হচ্ছে ঐ তেসরা অঘ্রাণ। কিন্তু এখন পর্যন্ত ঐ হার সংক্রান্ত সমস্ত কথা তোমাকে বলা হয়নি রায়। কিন্তু!…

সলিল চৌধুরী ইতস্তত করতে থাকে যেন।

কি? কিরীটী প্রশ্ন করে।

কথাটা গোপনীয়।

কিরীটী অল্প একটু হেসে বলে, বুঝেছি, কিন্তু তুমি নিঃসন্দেহে ওদের সামনে যা বলবার বলতে পার।

সলিল তখন বলতে সুরু করে,—মাকে বাবা একটা হীরা উপহার দিয়েছিলেন। অতবড় হীরা সাধারণতঃ বড় একটা চোখে পড়ে না; তা তার দামও হবে তোমার দশ বার হাজার টাকা। কিন্তু তা হলেও কেবলমাত্র দামের জন্যই নয়—হীরাটার বিশেষ কাটিংয়ের জন্য ওর ঔজ্জ্বল্যই আলাদা। হীরাটা একটা সোনার শতদলের উপরে কুঁদে বসান। এবং সেই হীরা সমেত সোনার শতদলটা একটা কুড়ি ভরির সোনার নেকলেসে লকেটের মত ঝোলান। মা যখন মারা যান তখন তন্দ্রার বয়স মাত্র দশ বছর। হারটা মার নিজস্ব সম্পত্তি, মারা যাবার সময় তিনি সেটা তন্দ্রার বিবাহের যৌতুক হিসাবে লিখে দিয়ে যান।

সকলে একাগ্রচিত্তে সলিল চৌধুরীর কথা শুনতে থাকে। কার্তিক মাসের ঈষৎ ঠাণ্ডা হাওয়া মাঝে মাঝে এসে জানলার জাফরানী রংয়ের পর্দাগুলো দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ফিকে নীল রংয়ের ডোমের অস্বচ্ছ কাচের আবরণ ভেদ করে একটা ম্রিয়মাণ বৈদ্যুতিক আলোর আভা সকলের মুখের উপরে এসে পড়ায় যেন সব কিছুই কেমন স্বপ্নাতুর বলে মনে হয়।

কিরীটীর হাতে ধরা জলন্ত সিগারেটের ধূসর ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ধীরে ধীরে হাওয়ায় ভেসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সলিল বলতে থাকে—কিন্তু কেন জানিনা, আমার মন অত্যন্ত অস্থির

হয়েছে এই অদ্ভুত চিঠিটা পাবার পর থেকে।

কেন ?

আমার কেবলই মনে হচ্ছে যেন এই হীরার নেকলেস নিয়ে কোন একটা বিপদ ঘনিয়ে আসবে। আমি চোখের ওপরে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেই অবশ্যম্ভাবী বিপদের অদৃশ্য সংকেত।

এ তোমার বাড়াবাড়ি চৌধুরী। একটা মনগড়া কল্পনার অহেতুক ভীতি—এধরণের চিঠির কোন মূল্যই নেই! দুনিয়ায় একদল শয়তান আছে যাদের কাজকর্ম নেই—অগত্যা তারা সদা সর্বদা এই সব নানা অসম্ভব উদ্ভট কল্পনা মাথায় খেলিয়ে নিজেদেরও ব্যস্ত রাখে, সঙ্গে সঙ্গে আরো দশজনকে ব্যস্ত করতে চায়। তুমি নির্ভয়ে বিয়ের আয়োজন করগে।

কিন্তু তুমি যাই বল রায়, মন আমার বড্ড চঞ্চল হয়েছে। বিশেষ করে আবার আমিই হীরাটার প্রধান ট্রাস্ট্রী। আমার কর্তব্য ও আমার ভয়—দুটোতে মিলে আমায় যেন ক্ষত বিক্ষত করে ফেলছে। তুমি ভাই আমার সঙ্গে চল। বিবাহের পর বর বধূ নির্বিঘ্নে চলে গেলে তবে তোমার ছুটি।

তার চাইতে এক কাজ কর না কেন; অত হাঙ্গামা না করে হীরার হারটা আয়রণ চেস্টে বন্ধ করে রাখো, যেমন আছে তেমন থাক আপাততঃ। পরে মেয়ে জামাই যাবার সময় হারটা তাদের হাতে তুলে দিলে হবেখন।

তারও উপায় নেই, ওই হার সমেত কন্যা সম্প্রদান করতে হবে—মার উইলে এই লেখা আছে এবং রাত্রে সেই হার মেয়ের গলায় থাকবে।

তাহলে আর কি বলব? বেশ, আমি তোমার ওখানে বিয়ের সময় যাব। যদিও আমি জানি যে ভয়ের কোন কারণ নেই। তবু মানুষের মন কত সামান্য কারণেই যে ব্যাকুল হয়!···কিরীটী বলে, এই চিঠিটা আমার কাছেই থাক।

বেশ ত! সলিল জবাব দিল।

রাত্রি আরো গভীর হয়েছে। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ঝুঁকে পড়ে কিরীটী নিবিষ্ট মনে সলিলের দেওয়া চিঠিখানা দেখছিল। সহসা অস্পষ্ট একটা পায়ের শব্দে চমকে ফিরে তাকায়—কে?

আমি সুব্রত।

কীরে ঘুম হলো না বুঝি?

না। আচ্ছা কিরীটী, সলিল চৌধুরীর চিঠিটা সম্পর্কে কি মনে হয়? সত্যিই কি—

কিরীটী বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, চিঠিটা সম্পর্কে গবেষণা করে যতটুকু জানতে পেরেছি তা এই—এক নম্বর ঃ চিঠিটা কারো হাতেরই কৌশলে লেখা। দুই নম্বর ঃ চিঠিটা ডাকে আসেনি।···তিন নম্বর ঃ Just guess, চিন্তা করে বল কী হতে পারে···আপাততঃ আমি যা ভেবেছি তা বলব না!

আমিও একটা কথা ভেবেছি—তোমায় এখন বলব না। রহস্যের কিনারা হলে তখন বলব।

সুব্রত বলে।

বেশত! কিরীটী হাসতে থাকে।

সুব্রতও সে হাসিতে যোগ দেয়।

॥ দুই ॥

(বেঁটে বক্কেশ্বর)

সলিলের বোনের বিয়েতে যোগ দিতে যথাসময়ে কিরীটী সুব্রত ও রাজু কাঞ্চনপুরের স্টেশনে এসে নামল।

তন্দ্রার বিয়ে। ওরা শুনেছিল ভারী সুন্দর দেখতে নাকি সলিলের বোন তন্দ্রাকে! যেমন রং দুধে আলতায় গোলা, তেমনই মুখশ্রী!

সমগ্র কাঞ্চনপুর আজ উৎসব মুখরিত। আলোর চকমকানি, লতায় পাতায় ফুলে রং বেরংয়ের পতাকায় সে এক এলাহি কাণ্ড! সানাইয়ের আলাপ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

গোয়ালন্দ থেকে কাঞ্চনপুর মাত্র দশ মাইল। সকাল সাড়ে সাতটা আটটার সময় স্টীমার এসে কাঞ্চনপুর স্টেশনে লাগল। কুয়াশার অস্বচ্ছ আবরণ তখনও নদীর বুকে যেন চাপ বেঁধে আছে। খুব শীত না করলেও একটা শীত-শীত ভাব আছে। কাঞ্চনপুর স্টেশনটা ছোট খাটোর মধ্যে বেশ।

তিনজনে স্টেশনের বাঁখারীর বেড়ার বাইরে এসে দাঁড়ায়। সামনেই কাঁচা মাটির রাস্তা। রাস্তার পাশে সবুজ ঘাসের সরু লিকলিকে ডগায় শিশির বিন্দুগুলি চিকচিক করছে। বেড়ার কোল ঘেঁষে একটা গাঁদা ফুলের গাছ, বড় বড় হলুদ রংয়ের গাঁদা ফুল ফুটেছে বিস্তর।

একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে কিরীটী বলল, জমিদার বাড়ির গেস্ট আমরা অথচ কোন রিসেপসন নেই। তাজ্জব ব্যাপার ত'!

কিন্তু মোদ্দা, এক কাপ গরম গরম চা না হলে ত' আর চলছে না, সুব্রত বলে।

অদূরেই একটা টিনের সেড দেওয়া ছোট খাট চায়ের দোকান। একটা কাঠের পায়া ভাঙা বেঞ্চির উপর বসে দুজন লোক চা পান করছে দেখা গেল।

রাজু সেই দিকে আঙ্গুল তুলে বলে, ওই যে চায়ের দোকান দেখা যাচ্ছে! চল—এগুনো যাক।

সকলে চায়ের দোকানের দিকে এগোয়।

হেঁ হেঁ প্রাতঃপ্রণাম! নমস্কার!

সকলেই একসঙ্গে চোখ তুলে তাকাল পাশের দিকে। অদ্ভুত বেঁটে খাটো একটি লোক। সব সুদ্ধ লম্বায় হাত আড়াই হয় কিনা সন্দেহ। নধর নাদুস-নুদুস গোলগাল চেহারাখানি। দেহের অনুপাতে মাথাটা ছোট, খুবই ছোট। সমস্ত মাথা জুড়ে চকচকে মসৃণ সুবিস্তীর্ণ একখানি টাক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটো

চোখ। দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। গায়ের রং আলকাতরার মত মিশ কালো। কালো রংয়ের আলপাকার একটা কোটের উপরে একখানি সবুজ আলোয়ান জড়ান।

নমস্কার! হচ্ছে হলো গা—আপনাদের ত' কলকাতা থেকেই আসা হচ্ছে নিশ্চয়?

হ্যাঁ, আপনি? কিরীটী প্রশ্ন করে।

অধীনের নাম রাকেশলোচন দাস। হচ্ছে হলো গা—সলিলবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারী। নমস্কার!

নমস্কার! জমিদার বাড়ি এখান থেকে কতদূর?

হচ্ছে হলো গা—তা ক্রোশ দুই হবে। পিকচারসকিউ যাকে বলে। একেবারে নদীর কোল ঘেঁষে। আপনাদের জন্য জমিদার বাড়ির লঞ্চ অপেক্ষা করছে, আসুন! রাকেশলোচন যেন বিনয়ে গলে পড়ে।

বেশ, বেশ! তা লঞ্চ কোথায়? কিরীটী শুধায়।

ঐ যে, আঙ্গুল তুলে রাকেশলোচন অদূরে নদীবক্ষে ভাসমান সাদা রংয়ের ছোট্ট একখানি মোটর লঞ্চ দেখিয়ে দিল।

আপনি এগোন, আমরা চা খেয়ে আসছি।

হচ্ছে হলো গা—সে কি একটা কথা হলো? লঞ্চেই আপনাদের চায়ের এ্যারেঞ্জমেণ্ট কমপ্লিট হয়ে আছে।

তাই নাকি? বেশ বেশ—চলুন তবে।

সুব্রত ও রাজু এতক্ষণ হাঁ করে রাকেশলোচনের দিকে চেয়েছিল। সহসা একসময় সুব্রত চাপা গলায় বলে, ও বাবা! এ যে একে বারে বেঁটে বক্কেশ্বর! সলিলবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারীটি সাধনা-লব্ধ!

কিরীটী হাসি সামলাতে পারে না, হো হো করে হেসে ওঠে।

হচ্ছে হলো গা! রাকেশলোচন ফিরে দাঁড়াল।

ও কিছু না, আপনি এগোন, কিরীটী বলে।

লঞ্চ ছেড়ে দিল।

নদীর বুক থেকে কুয়াশা তখনো একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের আলো একটু একটু করে সবে চারিদিকে ফুটে উঠতে সুরু করেছে। লঞ্চ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

ক্রমে চারিদিককার দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে চোখের উপরে ভেসে ওঠে। মাটির পাড় ভেঙে ভেঙে নদী যেন কাল গ্রাসে আপনাকে সঁপে দিচ্ছে। যদিও শীতের নদী ম্রিয়মান, তথাপি তার হিংসার বিরাম নেই যেন।

মাঝে মাঝে দু-একটি খড়-ছাওয়া মাটির বাড়ি চোখে পড়ে। কোথাও গৃহস্থের আঙিনায় উলঙ্গ গ্রাম্য শিশুরা শীতের প্রথম রোদটুকু উপভোগ করছে। চোখে পড়ে দু একটা বাবলা, বনমল্লিকা ও কুল গাছ, ভাঙা নদীর পাড়ে নিঃসঙ্গ একাকী যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। কুল গাছের ডালে বসে একটি দোয়েল

আপন মনে শিস্‌ দেয়। মাছরাঙা একটা পাড় থেকে ভেঙে পড়া মাটির স্তূপের উপরে চুপটি করে বসে ঝিমোয়। লঞ্চ চলে জল কাটতে কাটতে মন্থর গতিতে। শহরের কোলাহল এখানে নেই, নেই এখানে কলের ধোঁয়া আর ধূলোর সমারোহ।

প্রশান্ত গ্রাম্য শ্যামলিমা; নদীর ঘোলাটে জল, পাখীর গান, অফুরন্ত সূর্যের আলো—সবকিছু মিলে যেন একটা সুসংবদ্ধ সুরের অপরূপ ছন্দ। স্নিগ্ধ! অপূর্ব। দেহ মন জুড়িয়ে যায়।

হঠাৎ সুব্রত বলে ওঠে, সত্যি, মন যেন ভরে ওঠে! মনে হয় আপনাকে যেন হারিয়ে ফেলি। এ যেন এক সীমাহীন অফুরন্ত ঘুমপাড়ানী গান।

মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই সুব্রত, অতএব সাবধান!···কিরীটী বলে ওঠে।

সুব্রত হেসে জবাব দেয়, ভয় নেই, বিবাগী হব না।

এমন সময় অদূরে দেখা গেল জমিদার বাড়ির ঘাট। চওড়া বাঁধান সিঁড়ি অনেকটা পর্যন্ত ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। রাস্তার দুধারে কলাগাছের সারি পোঁতা হয়েছে। দেবদারুর পাতা, রংবেরংয়ের কাগজের শিকলি ও জাপানী ফানুসে চারিদিক সাজান।

॥ তিন ॥

(খুড়ো মশাই)

বাতাসে ভেসে আসছিল সানাইয়ের মধুর আলাপ! আসন্ন উৎসবের ইঙ্গিত।

ঘাটে সলিল নিজেই অপেক্ষা করছিল। সকলে লঞ্চ থেকে নামে।

সুপ্রভাত মিঃ রায়! সুব্রতবাবু, রাজুবাবু—আপনারা যে কষ্ট করে আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে এতদূরে এসেছেন তার জন্য আপনাদের সহস্র ধন্যবাদ।···সলিল সকলকে অভ্যর্থনা জানায়।

নদীর ঘাট থেকে জমিদার বাড়ি প্রায় একপোয়া রাস্তা। বরাবর বাঁধানো রাস্তা নদীর ঘাট থেকে জমিদার বাড়ি পর্যন্ত গেছে সকলে হেঁটেই চলে। দু'পাশের পথ সাজান হয়েছে কলাগাছের সারি পুঁতে এবং ঝালর দেওয়া হয়েছে কাগজের রঙীন শিকলি ও জাপানী ফানুস।

সানাইয়ের সুমধুর আলাপ বাতাসে ভেসে আসছে।

জমিদার বাড়ি। বাড়ি তো নয় যেন রাজপ্রাসাদ! আসন্ন উৎসবের জন্য নতুন করে দেওয়াল ও জানলা কপাটে রং ফিরান হয়েছে। চারিদিক ঝকঝকে ও চকচকে।

চৌধুরীরা সেকেলে জমিদার। অতীতে এঁদেরই কোন পূর্বপুরুষ রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। আজও গ্রামে তাঁদের রাজাই বলে, বাড়িকে রাজবাড়ি। বর্তমানেও এঁদের অবস্থা খুবই স্বচ্ছল বলতে হবে, তবে সেটা কেবল জমিদারীর জন্যই নয়; অন্য কারণে। কলকাতায় এঁদের প্রকাণ্ড লোহার ও কলকবজার ব্যবসা। ব্যবসার দৌলতেই এঁদের দুয়ারে এখনও হাতি বাঁধা।

সলিল চৌধুরীরা দুই ভাই ও এক বোন। সলিল দুলাল ও বোন তন্দ্রা। দুই ভাই-ই এখনও অবিবাহিত।

কাঞ্চনপুর, ঢাকায় অনেক জমিজমা ও বাড়ি ঘর আছে ওদের।

জমিদারীর সব কিছুই দেখেন কাকা নরেন চৌধুরী, ব্যবসা বড় ভাই সলিলই দেখাশুনা করে।

কাকা নিঃসন্তান ও বিপত্নীক।

ছোট ভাই আর্টিস্ট। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ, মিশুকে ও আমুদে।

কলকাতাতেই এরা এখন স্থায়ী ভাবে বসবাস করে, তবে পুজো পার্বন কাজ-কর্ম দেশের বাড়িতেই সুসম্পন্ন হয়।

সেকেলে, প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য বাড়ি। প্রথমেই কাছারীবাড়ি। সেখানে খাজাঞ্চী খানা, দপ্তরী ঘর প্রভৃতি ; তার এক পাশে চাকরদের মহল, নাকাড়ীঘর ও পুজামণ্ডপ। তারপরই একটি আঙিনা। আঙিনার এক পাশে দাসী মহল ও অপর পাশে রন্ধনশালা ও খাবার ঘর।

দোতলায় উঠবার সিঁড়ি একপাশে।

দুটো সিঁড়ি পাশাপাশি। একটা মেয়েদের জন্য, একটা পুরুষদের জন্য। কারো সঙ্গে কারো কোন সম্পর্ক নেই।

অন্দরমহলের পিছনে জমিদার বাড়ির প্রকাণ্ড উদ্যান।

দোতালায় একটি মস্ত টানা বারান্দার গায়ে সব ঘর। তিন তলাতেও সেই একপ্রকার ব্যবস্থা।

ছাদে উঠলে নদী চোখে পড়ে। একটা পার্টকিল রংয়ের সরু রেখা এঁকে বেঁকে ক্রমশঃ যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

বাইরের কাছারী বাড়িতেই একটি ঘরে কিরীটীদের থাকবার আয়োজন করা হয়েছে।

উৎসব মুখরিত বাড়িখানি—লোকজন আত্মীয় স্বজনের কোলাহলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে গত কয়েকদিন ধরেই। জমিদার বাড়ির উৎসবই বটে।

সারাটা রাত ট্রেনে একপ্রকার জেগেই কেটেছে। খাওয়া দাওয়ার পর সকলে যে যার শয্যায় আশ্রয় নেয়। যখন ঘুম ভাঙল তখন দিনান্তের শেষ সূর্যরশ্মি গাছের পাতায় পাতায়, আকাশের গায়ে বিদায়ের শেষ পরশটুকু যেন বুলিয়ে চলেছে।

ভৃত্য এসে জিজ্ঞাসা করে, চা আনব ?

কিরীটী বলে, নিয়ে এস।

প্রচুর জলযোগের সাথে সকলে চা পান শেষ করল।

ইতিমধ্যে জাপানী ফানুসের রঙীন আলোয় জমিদার বাড়ি রঙীন হয়ে উঠেছিল।

সকলে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

নমস্কার !

জানালার ভিতর থেকে যেন একটা চাপা শব্দ গম গম করে বের হয়ে এলো।

ওরা চমকে মুখ তুলে তাকায়।

বারান্দার এ পাশে তেমন আলো আসছে না। খুবই অস্পষ্ট।

সামনেই দাঁড়িয়ে প্রায় ছ'ফিট লম্বা একজন লোক। দৈর্ঘের অনুপাতে দেহখানি সমান পুষ্ট ও মাংসল। তবে সে মাংসপেশীগুলি থলথলে বা চর্বিবহুল নয়; স্ফীত ও সুষ্ঠু। গায়ের রং নিকষ কালো। মাথায় প্রকাণ্ড বাবরি চুল। বড় বড় দুটি চোখ। কপালে অর্ধচন্দ্রাকৃতি লাল সিঁদুরের তিলক। পরিধানে গেরুয়া রংয়ের মটকা।...শুভ্র উপবীত দেখা যায়। খালি গায়ে আড়াআড়ি ভাবে একটা গেরুয়া-বর্ণের চাদর ঝোলান।

আপনারাই বুঝি সলিলের বন্ধু, কলকাতা থেকে আসছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিরীটী জবাব দিল।

আমি সলিলের কাকা নরেন্দ্রনাথ।

ওঃ নমস্কার!...সকলে হাত তুলে কিরীটীর দেখাদেখি নমস্কার জানায়।

বেশ। বেশ! আপনারা যে গরীবদের কুটিরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—

ও কথা বলবেন না কাকাবাবু! আর আপনি যখন সলিলের কাকা তখন আমাদেরও কাকা, আমরা আপনার পুত্র স্থানীয়, আমাদের আপনি না বলে তুমিই বলবেন। তাতে সুখীও হবো, আনন্দও পাবো।

বেশ বেশ! বিলক্ষণ! তা তোমরাও আমার স্নেহের জন বৈকি! বড় সন্তুষ্ট হলাম বাবা!...তোমরা সব এখানে দাঁড়িয়ে কেন? চল, বর-সভায় চল? দেখবে না বর কেমন হলো?...এসো।

হ্যাঁ, চলুন যাওয়া যাক। সুব্রত ও কিরীটী বলে।

বর-সভায় ওদের সকলকে পেঁৗছে দিয়ে নরেন্দ্রনাথ অন্য কাজে চলে গেলেন।

বেশী লোকজনের একত্র সমাবেশ ও তাদের হট্টগোল কিরীটী কোনদিনই সইতে পারে না। তাই একসময় সবার অলক্ষ্যে নাট-মণ্ডপের পিছনের রাস্তা দিয়ে বাগানে গিয়ে ঢোকে।

আকাশে অল্প জ্যোৎস্না, কুয়াশার সঙ্গে মিশে গেছে।

দেশী বিলাতী সকল প্রকারের ফুলগাছই বাগানের শোভা বর্ধন করছে। বেশীর ভাগ গাঁদাফুলই সমগ্র বাগানটিকে থরে থরে সাজিয়ে তুলেছে।

কোথায় ঘন পত্রান্তরাল থেকে একটা পাখী ঘুম ভেঙে বুঝি ডেকে ওঠে।

বাগানের দক্ষিণ কোণে কতকগুলি ঘন সন্নিবেশিত আমগাছ ও সুপারী গাছ স্থানটিকে অন্ধকার করে রেখেছে। সহসা পাশ থেকে একটা চাপা কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজে, সাবধান! কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়! ন' বাবু...

চুপ...স্।

কিরীটী শ্রবণ শক্তিকে অতিমাত্রায় সজাগ করে দ্রুত একটা জামরুল গাছের আড়ালে আপনাকে লুকিয়ে ফেলে।

হ্যাঁ শোন, সোজা গিয়ে গোয়ালন্দে ট্রেন ধরবে!...আমি এদিকটা লক্ষ্য রাখব। ও টের পায়নি যে আমি ওকে সন্দেহ করছি। তুমি ওদিকটা খুব ভাল

করে নজর রাখবে। কোথাও কেউ যেন না সন্দেহ করে। সাবধান।···

পাশেই শুকনো পাতার উপরে কার যেন হেঁটে যাওয়ায় মৃদু শব্দ শোনা গেল।

উঁকি দিয়ে কিরীটী দেখল অদূরে একজন দ্রুত পদে বাগানের সরু রাস্তা দিয়ে মণ্ডপের দিকে চলে যাচ্ছে।

কে ?···ও কে ?

স্বল্প আলোতেও কিরীটীর তাকে চিনতে তেমন কষ্ট হয় না। কিরীটী যেন বেশ একটু বিস্মিতই হয়েছে।

॥ চার ॥

(হীরা চুরি)

সত্যই অপূর্ব ! হীরাখানি অপূর্ব ! কি তার চাকচিক্য ! কি অপূর্ব তার গঠন সৌন্দর্য ! সুবর্ণপদ্মের উপর কারুকার্য খচিত—দ্যুতিমান ভাস্করের মত জ্যোতিঃবিকীরণকারী' সে হীরকখণ্ড ! দৃষ্টি যেন ঝলসে যায়, বিভ্রম হয়।

বিবাহ-সভার দোদুল্যমাণ ঝাড়ের অত্যুজ্বল আলোকরশ্মি সেই হীরকখণ্ডের ওপর প্রতিফলিত হয়ে যেন ঠিকরে পড়ছে।

যথাসময় সলিল চৌধুরী হীরকহার সমেত ভগ্নিকে সম্প্রদান করল।

বিবাহ হয়ে গেল।

বরযাত্রী ও অভ্যাগতবৃন্দ তখন খেতে বসেছে। কিরীটী ঘরে বসে একটা সিগারেট টানছিল সলিল এসে ঘরে প্রবেশ করল, কী ব্যাপার রায়, ডেকেছ কেন ?

একি ! তুমি যে একেবারে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছো ? নো মাই ফ্রেণ্ড, অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। মেয়ে জামাই কোন ঘরে শোবে সেটা জানবার জন্যই—

দোতলায় পাশের ঘরে।···শুধু মিথ্যেই আমি ভীত হয়েছিলাম রায় !··· বলতে বলতে সলিল চৌধুরী হেসে ফেলে। তারপর হঠাৎ কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, কেন, ও কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ?

না এমনি, একটা কৌতুহল ! আচ্ছা তুমি যাও, তোমায় ডিটেন করব না, কাজের বাড়ি !

সলিল চৌধুরী চলে গেল। কিরীটী পায়চারি করতে থাকে।

রাজুর ডাকে কিরীটীর ঘুমটা ভেঙে গেল।

কিরীটী ওঠ, ওঠ !

কী ব্যাপার ? চোখ রগড়াতে রগড়াতে কিরীটী উঠে বসে শয্যার ওপরে।

সামনে দাঁড়িয়ে সলিল চৌধুরী। রায়, হীরেটা চুরি গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সলিল চৌধুরী কোনক্রমে কথা কটা উচ্চারণ করে।

সে কি !

হ্যাঁ, শিগগির ওপরে চল।

চল।

কিরীটী, সুব্রত; রাজু সলিল চৌধুরীর পিছনে পিছনে এগিয়ে চলে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে সামনেই একটা দরদালান এবং সেই দরদালানের সংলগ্ন পর পর তিনটি ঘর। তারপর একটি সরু খালি মত বারান্দা। সেই বারান্দার শেষ সীমান্তে একটা ছোট রকমের ছাত। ছাতের চারিপাশে বেশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

পূর্ব-দিককার পাঁচিলের কোল ঘেঁযে বহু দিনকার একটা বকুল গাছ। তারই কয়েকটা বর্ধিত ডালপালা ছাতের পাঁচিলকে ডিঙিয়ে যেন এদিকে হাত বাড়িয়েছে দামাল শিশুর মত।

ছাতের নীচেই বাড়ির পেছনে বিস্তৃত উদ্যান।

সরু বারান্দার পরই পর পর দু'খানা ঘর। তারপরে একটা ছোট্ট পূজোর ঘর।

নীচের তলাতেও ঠিক একই ব্যবস্থা।

তিনখানা ঘরের প্রথমটাতেই থাকেন কাকা নরেন চৌধুরী।

মাঝের ঘরেই বাসর শয্যার ব্যবস্থা হয়েছিল।

তার পরের ঘরখানাই সলিলের শয়ন কক্ষ।

কিরীটীরা সকলে সলিল চৌধুরীর পিছনে পিছনে একেবারে সলিলের শয়ন কক্ষে এসে প্রবেশ করে।

সেখানে তখন অন্তঃপুরিকা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের ভিড়। একটা চাপা অস্পষ্ট গুঞ্জন সমগ্র ঘরটির মধ্যে গুণ গুণ করছে।

সলিলের বোন তন্দ্রা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। দুইজন ভদ্রমহিলা জোরে জোরে পাখার বাতাস করছেন।

ওরা ঘরে ঢুকতেই সকলেই যেন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

সলিল বলে, এই ঘর রায় !

কিরীটী মেয়েদের ভিড় কমাতে বলে। সলিল তখন দু একজন বাদ সকলকেই ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলে। সকলে বের হয়ে গেলে কিরীটী প্রশ্ন করে, কখন ব্যাপারটা ঘটল !

সলিল বলে,—আজ বাড়িতে ভিড় হওয়ায় আমি নীচেই শুয়েছিলাম। সবে একটু তন্দ্রার মত এসেছে এমন সময় একটা অস্পষ্ট গোলমাল শুনে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। প্রথমটায় তেমন বুঝতে পারিনি, কিন্তু একটু ভাল করে কান পেতে শুনতেই মনে হল যে গোলমালটা যেন উপরের ঘর থেকেই আসছে। ছুটে চলে এলাম উপরে; এসে দেখি ঘরের দরজা হা হা করছে খোলা, বাতিটা কমান। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। দেখি, মেঝেয় তন্দ্রা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ঘরে জামাই নেই। তাড়াতাড়ি আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার হীরাটার কথা মনে পড়ল। তন্দ্রার দিকে তাকাতেই বিস্ময়ে চমকে

উঠলাম। এমন সময় আমার ছোট ভাই, আমার পিসতুতো দুই বোন ঘরে এসে ঢুকল। আমি চিৎকার করে বললাম, সর্বনাশ হয়েছে দুলাল, হারটা চুরি গেছে।

আমার ভাই বললে, জামাই কোথায় ?

তাড়াতাড়ি সবাই বাড়িময় জামাইয়ের খোঁজ সুরু করে দিল, কিন্তু জামাইকে বাড়ির মধ্যে কোথাও পাওয়া গেল না।

মেঝের উপরে একটা ভাঙা কাচের কাপ পড়েছিল, সেটা নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে কিরীটী অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দেয়, কোথায় আর সে যাবে, দেখ, এখুনি হয়ত আসবে।

অতঃপর ভাঙা কাপটা রাত্রিবাসের পকেটের মধ্যে রাখতে রাখতে কিরীটী বলে, আচ্ছা, নরেনবাবু, তোমার কাকামশাইকে দেখছি না তো তিনি কোথায়।

সত্যিই তো! এতক্ষণ তো সে কথা কারো মনে হয় নি; এতবড় একটা বিপদ অথচ তিনি অনুপস্থিত!

কাকাবাবু বাড়িতে নেই, রাত্রি আটটার সময় একটা জরুরী কাজে পাশের গ্রামে গেছেন—সলিল বললে।

ও ঘরটা বুঝি বন্ধ—আমি বলছিলাম নরেন বাবুর শোবার ঘরটা।

হ্যাঁ। তালা বন্ধ।

ডুপ্লিকেট চাবি নেই? কিরীটী জিজ্ঞাসা করে।

আছে সেরেস্তার চাবির মধ্যে, এবাড়ির সব তালারই একটা করে ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

একবার চাবির তোড়াটা আনবে?

নিশ্চয়।...সলিল তখনই চাবি আনবার জন্য একজন ভৃত্যকে গোমস্তার কাছে পাঠিয়ে দিল।

এমন সময় একটা অস্পষ্ট গোলমাল শুনে সকলে ফিরে তাকাল। জামাই ফিরে এসেছে।

কিরীটী জামাইয়ের দিকে ফিরে তাকাল।

জামাইয়ের হাঁটু অবধি ভিজে কাদা তখনও লেগে আছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। শীতকাল হলেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

কিরীটী হেসে বলে, কাদা ঘাঁটাই বুঝি সার হল আপনার? তা আপনার যখন এতই চায়ের পিপাসা দোষ আর কাকে দিই বলুন?...চা-টা একটা নেশার বস্তু বটে কিন্তু চা পান করে এমন ঘুম ঘুমালেন যে একেবারে হীরার হারটাই আপনার স্ত্রীর গলা থেকে লোপাট হয়ে গেল।

ভদ্রলোক কোন কথা বললেন না। তিনি শুধু একবার কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে মুখটা নামিয়ে নিলেন।

কিরীটী একটু এগিয়ে এসে ভদ্রলোকের পিঠের উপরে একটা হাত রেখে মৃদু হেসে বলে, মিথ্যেই আপনি ছোটাছুটি করে মরেছেন। পায়ের তলায় জমি যে চোরা বালিতে ভর্তি।... যাকগে, আপনি খুব পরিশ্রান্ত হয়েছেন! দেখুন,

আপনার স্ত্রীর বোধ হয় জ্ঞান হল, চল রাজু, আমরা ততক্ষণে পাশের ঘরটা দেখে আসি, এস সলিল।

॥ পাঁচ ॥

(সবুজ সুতোর গুচ্ছ)

পাশের ঘরটি সলিলের কাকা নরেনবাবুর শয়ন কক্ষ। ঘরের দরজায় জার্মান তালা লাগান। কিরীটী হাত দিয়ে ঠেলে দেখল, দরজা খোলা যায় না। দরজা বন্ধ।

সকলেই চুপচাপ, গম্ভীর। ব্যাপারটা আগাগোড়া শুধু আশ্চর্যই নয়, যেন অবিশ্বাস্যও।

হীরাটা যে চুরি করেছে তার দক্ষতা স্বীকার করতেই হবে। লোকটা যেমন কৌশলী, তেমনই ক্ষিপ্র।

ভৃত্য নীচে থেকে গোমস্তার কাছ থেকে এক গোছা চাবির তাড়া নিয়ে এলো চেয়ে।

সলিল ভৃত্যের হাত থেকে চাবির তাড়াটা নিল। বেছে বেছে খুঁজে একটা চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলে ফেলল। সকলে অতঃপর অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করল।

কিরীটী পকেট থেকে টর্চ বের করে বোতাম টেপে।

ঘরটা খুব ছোটও নয় আবার বড়ও নয়, মাঝারি গোছের। একদিকে একখানি খাট পাতা। খাটের উপরে শয্যা বিছানো আছে। মাথার দিকে একটা উঁচু টুলে একটা টাইমপিস টিক টিক শব্দ করে চলেছে। একপাশে একটা পুরানো আমলের সেগুন কাঠের বড় আলমারী। ঘরের এককোণে একটা জলচৌকির উপর মা কালীর একখানি রণ-রঙ্গিণী মূর্তি। পাশে একটা রুপোর ধুনুচী।

কিরীটী ঘুরে ঘুরে সব আলো ফেলে ফেলে দেখতে লাগল।

এঘর থেকে ওঘরে যাওয়ার যে দরজাটা সেটা দেখা গেল খিল লাগান। কিরীটী হাত দিয়ে খিলটা তুলে দরজাটা খুলে ফেলল। দরজার গায়ে বহুকালের অব্যবহারে ধুলা জমে আছে।

ওঘরে তখন আবার ভিড় জমে উঠেছে। বর-কণেকে ঘিরে মৃদু গুঞ্জন চলছে।

কিরীটী দরজাটা এঁটে দিয়ে বলে, চল, দেখা হয়ে গেছে।

সকলে আবার ঘর থেকে বের হয়ে এসে দালানে দাঁড়াল। সলিল দরজার গায়ে চাবি লাগাতে লাগাতে চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করে, কিছু বুঝতে পারলে রায় ?

কিরীটী আপন মনে কি যেন চিন্তা করছিল, সলিলের কথায় কোন জবাব

দিল না।

আমি যে নতুন জামাইয়ের কাছে আর মুখ দেখাতে পাচ্ছি না রায়, ছি! ছি! কি লজ্জার কথা বলত?

ওঃ, কী বলছিলে···লজ্জা? হ্যাঁ, তা তো হওয়ারই কথা। কিন্তু কি করবে বল? দোষ তো তোমার নয়।

সে রাত্রের মত যে যার শুতে গেল অতঃপর।

এক সময় রাত্রি শেষ হয়ে পূর্ব গগনে অরুণালোক ফুটে ওঠে। কেউ ঘুম থেকে উঠবার আগেই কিরীটী নীচে গোমস্তার ঘরে গিয়ে হাজির হল। গোমস্তা তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

কিরীটী তাকে ঠেলে ডাকে, ও মশাই শুনছেন, ও মশাই!

এ্যাঁ—গোমস্তা ধড়ফড় করে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানার উপর উঠে বসে।—আজ্ঞে কর্তা কি কন? প্রাতঃকালে চিখ্‌খর পারবার লাগছেন ক্যান?

মশাই, আপনাদের ছোট কর্তার ঘরের সেই চাবিটা একবার দিতে পারেন?

পারুম না ক্যান, কিন্তু করতার ঘরের চাবি আপনার কী কামে লাগব?

দরকার আছে একটু তাড়াতাড়ি দিন।

গোমস্তা ট্যাঁক থেকে চাবি বের করে কাছারীর সিন্দুক খুলে চাবির তোড়াটা বের করে কিরীটীর হাতে তুলে দিল, লন, কিন্তু কইলেন না তো দরকারডা কী?

কিরীটী চাবির তোড়াটা হাতে নিয়ে সোজা বরাবর নিজেদের ঘরে ফিরে গেল। সুব্রতকে ডেকে তুলল, এই সু ওঠ, ওঠ···

সুব্রত শয্যার উপর উঠে বসে, কই, চা দিয়ে গেছে নাকি?

কিরীটী হেসে বলে, হ্যাঁ, প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এল।

রাজুও ততক্ষণে উঠে বসেছে, গত রাত্রের জাগরণের ক্লান্তি চোখে মুখে স্পষ্ট প্রতীয়মান।

এমন সময় বাইরে জুতার শব্দ শোনা গেল। সলিল চৌধুরী এসে ঘরে প্রবেশ করে, এই যে তোমরা সবাই উঠেছো দেখছি, চা দিতে বলি···ওরে রামচারণ!

কিরীটী বাধা দিল, না থাক। তাড়াতাড়ির কিছু নেই, আগে একটিবার উপর থেকে ঘুরে আসি চল।

বেশত চল, সলিল বলে।

তখনও অনেকে ঘুমিয়ে আছে। গত রাত্রের যে উত্তেজনা গিয়েছে। সিঁড়ির কাছাকাছি এসে সহসা কিরীটী সলিলকে প্রশ্ন করে, কাল রাত্রে কোন ঘরে তুমি ছিলে সলিল?

সলিল যেন অকারণেই একটু চমকে ওঠে। তারপর বলে, ওই ঘরটায় শুয়েছিলাম।

চল ওঘরটা একবার দেখে আসি।

ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে সলিলের দিকে ফিরে কিরীটী বলে, বাঃ ভারী

সুন্দর সাজান তো ঘরটা তোমার সলিল !

সত্যিই ঘরটা সুন্দর ভাবে সাজান। মেঝেতে দামী পুরু কার্পেট বিছান। একপাশে একখানি সেক্রেটারীয়েট টেবিল···গোটা দুই চেয়ার। গোটা দুই কাউচ, আধুনিক ফ্যাসানের আলমারী—নানা জাতীয় বইতে ঠাসা। ঘরের এক কোণে জয়পুরী টবে ক্যাকটাস। দরজায় জানালায় সব দামী নেটের পর্দা টাঙান।

সত্যি সুন্দর! ভারী সুন্দর! সুব্রত বলে।

হ্যাঁ, এটা আমার স্টাডি রুম।

আচ্ছা সুব্রত, তুমি ও রাজু এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি সলিলকে নিয়ে উপরটা চট করে একবার দেখে আসি। আজকের চা এখানেই বসে গল্প করে খাওয়া যাবে। কী বল সলিল? সহাস্যমুখে কিরীটী সলিলের মুখের দিকে তাকাল।

বেশত, স্বচ্ছন্দে!

নরেন চৌধুরীর ঘরটার কিরীটী চাবি দিয়ে দরজা খুলতে খুলতে বলে, কাকাবাবু এখনো ফেরেননি না সলিল?

না।

কিরীটী অন্যমনস্কের মত ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটার কাছে এসে সহসা দরজার পাল্লার গায়ে খানিকটা সবুজ সুতা সমেত এক টুকরো সবুজ সিল্কের ন্যাকড়ার অংশ ওর চোখে পড়ল। কিরীটী সলিলের অলক্ষ্যে ক্ষিপ্র হাতে সেই সিল্কের টুকরোটা দরজার পাল্লা থেকে টেনে নিয়ে বলে, তোমার চাকরের নাম রামচরণ না?

হ্যাঁ।

কিরীটী তখন নিজেই চিৎকার করে ডাকে, রামচরণ, রামচরণ!

সলিল জিজ্ঞাসা করে, রামচরণকে কোন প্রয়োজন আছে?

হ্যাঁ, বড্ড পিপাসা পেয়েছে, এক গ্লাস জল আনতে বল না ভাই।

দাঁড়াও ডাকছি বলে ঘর থেকে বের হয়ে দোতলার রেলিংয়ের উপরে ঝুঁকে চীৎকার করে ডাকে, রামচরণ, সদানন্দ।

নীচে হতে ক্ষীণ স্বরে জবাব আসে, যাই আজ্ঞে।

॥ ছয় ॥

(ভাঙা চায়ের কাপ)

একটু পরেই রামচরণ উপরের ঘরে এসে ঢোকে।

সলিল বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে বলে, কোথায় থাকিস হতভাগা? ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না!

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে কতকটা যেন ঝড়ের বেগে নরেন চৌধুরী এসে ঘরে

ঢুকলেন—এই যে সলিল, এসব কি শুনছি বাবা, হীরাটা নাকি চুরি গেছে ?

কিরীটী একবার সলিল ও একবার নরেন চৌধুরীর মুখের দিকে ঘন ঘন তাকাতে লাগল।

সলিল যেন কতকটা বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে বলে, হ্যাঁ কাকা, কাল রাতে আশ্চর্যরকম ভাবে হীরাটা চুরি গেছে বাসর ঘরে তন্দ্রার গলা থেকে।

তুমি কোথায় ছিলে সে সময় ?

আমি নীচের স্টাডিতে শোবার জন্য ব্যবস্থা করছিলাম। এমন সময় চীৎকার ও অস্পষ্ট গোলমাল শুনে ছুটে উপরে এসে দেখি ওই ব্যাপার।

এমন সময় হঠাৎ যেন খেয়াল হতেই নরেন চৌধুরী বেশ একটু বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠেই বলেন, আমার শোবার ঘর খোলা হয়েছে কেন ? জান আমি পুজো অর্চনা করি···এসব অনাচার আমি আদপেই ভালবাস না।

আজ্ঞে, কিরীটী একবার আপনার ঘরটা দেখতে চাইল কিনা তাই।

কেন ? আমার ঘর দেখবার কী প্রয়োজন পড়েছিল···তারপর একটু যেন ব্যঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেন, তোমার বন্ধু কী আমাকেই সন্দেহ করেছেন নাকি ?

কিরীটী শশব্যস্তে বলে, কী বলছেন কাকাবাবু এসব আপনি ?···আমায় মাফ করো সলিল, এই ধরণের কথাবার্তা হলে আমি তো এ-কাজে হাত দিতে পারব না, আমায় আজই বিদায় নিতে হবে।

বাবাজীর অভিমান হলো বুঝি খুড়োর পরে ? আরে না না, এ একটা নিছক ঠাট্টা···বলে হা হা করে প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন নরেন্দ্রনাথ। হাসির বেগ কিছু কমলে স্মিতভাবে বললেন, মনে কিছু কর না বাবা, বুড়ো বয়সে ধর্মে-কর্মে একটু মন দিয়েছি কি-না, একটু আচার বিচার বেড়ে গেছে। জমিদারীর কাজ-কর্ম নিয়ে সময় কাটাই। আর তারপর এই ঘরটাতে বসে ভগবানের চিন্তা করি। তোমরা জুতো পায়ে সব ঘরে এসে ঢুকেছো···ঘরে ঢুকবে না কেন বাবা, তবে জুতো-টুতো পায়ে থাকলে···

কিরীটী কুণ্ঠিত স্বরে বলে, আমাদেরই অন্যায় হয়েছে কাকাবাবু ! সলিল যদি আমায় আগে জানাত তবে হয় তো এ ভুলটা হত না।

জানি বাবা, তোমরা সব শিক্ষিত ছেলে···তা যাক, তারপর কিছু বুঝতে পারলে ?

আজ্ঞে চেষ্টা তো করছি, তবে আগে হতে কিছু বলা যায় না, দেখি চেষ্টা করে।

এমন সময় একজন ভৃত্য এসে জানাল যে জামাইবাবু সলিলকে ডাকছেন।

আসছি, বলে সলিল ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী নরেন চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে, চলুন কাকাবাবু সলিলের স্টাডিতে গিয়ে বসা যাক।

সেই ভাল বাবা, চল···সত্যি কথাটা শুনে অবধি মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। বৌদির এত সখের জিনিসটা, তাছাড়া, দামের দিক দিয়েও সে প্রায়

অনেক হাজার টাকা। কিন্তু আশ্চর্য! গলা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কেমন করেই বা তা সম্ভব!

ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই রাজু ও সুব্রত একসঙ্গে প্রশ্ন করে, এতক্ষণ একটা ঘর দেখতে লাগে? কী করছিলে এতক্ষণ?

কিরীটী হাসতে হাসতে বলে, কেন, দারুণ পিপাসায় ছাতি ফাটবার উপক্রম হল, রামচরণ রামচরণ বলে চীৎকার করলাম, জল আনান হলো!···কেন তোমরা আমার ডাক শুনতে পাওনি নাকি?

কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে সুব্রত বলে, না। আশ্চর্য! কখন আবার তুমি রামচরণ বলে ডাকলে?

ডেকেছি হে ডেকেছি, তোমরা কানে একটু খাটো কি না তাই উপর থেকে চেঁচালে শুনতে পাও না।

নরেন চৌধুরী বাধা দিলেন, বললেন, ওদের কানের কোন দোষ নেই বাবাজী। এবাড়িটা এমনভাবে তৈরী যে উপরের কোন ঘর থেকে হাজার ডাকলেও নীচের ঘরের লোকেরা শুনতে পায় না। সেইজন্যই কাউকে ডাকাডাকি করতে হলে রেলিংয়ের ধারে এসে গলা বাড়িয়ে ডাকতে হয়। আমরা যে ঘরটায় বসে আছি তার পিছনেই কাছারী বাড়ি কি না, তাই পুরাতন আমলের কর্তারা এমনভাবে বাড়ি তৈরী করেছিলেন যে অন্দর মহলের মেয়েদের কোন কথাবার্তা, গোলমাল—কিছুই বাইরের লোকেরা যেন শুনতে না পায়।

ভারী আশ্চর্য তো! কিরীটী বলে।

হ্যাঁ, বাড়িটার নির্মাণ-কৌশল সত্যিই অদ্ভুত, বলেন সলিলের কাকা।

এমন সময় সলিলের পিছনে পিছনে রামচরণ ট্রেতে করে চা ও জলখাবার নিয়ে এল।

সকলে চা ও জলখাবারে মন দিল। চা পান করতে করতে এ বাড়ির নানা অদ্ভুত পুরাতন আশ্চর্য গল্প সব চলতে লাগল।

কাকাবাবুই বলতে থাকেন, এরা সব শোনে। কবে এ বংশের এক পূর্বপুরুষ সামান্য একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে কুড়িজন লাঠিয়াল ডাকাতকে একা ঘায়েল করেছিলেন! কবে রাতারাতি শত্রুপক্ষের সর্বনাশ সাধনের জন্য নদী থেকে নালা কেটে তাদের সমস্ত শস্যক্ষেত্র জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল!

এদেরই কোন পূর্বপুরুষ কবে একশত সাতটা নরবলি দিয়ে বাকী একটির জন্য মা কালীর প্রতিষ্ঠা করতে পারল না এবং সেই মন্দির আজও এখান থেকে এক পোয়া পথ দূরে নদীর ধারে ঘন বনের মাঝে শ্যাওলা ও ফাটল ধরে ক্রমশঃ ক্ষয়ে চলেছে···ইত্যাদি, ইত্যাদি। সকলে তন্ময় হয়ে শুনছিল।

কিরীটী এক ফাঁকে উঠে একটা সিগারেট টানতে টানতে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

রামচরণ ব্যবহৃত ডিস কাপগুলো সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এ ঘরের দিকেই আসছিল। হাতের ইশারায় কিরীটী তাকে কাছে ডাকে।

তোমার নাম রামচরণ ?

আজ্ঞে করতা।

বাবুদের বাড়িতে কতদিন ধরে চাকরী করছো ?

তা করতা, দশ-বিশ বছর হবে।

ওঃ, তাহলে তুমি তো পুরানো লোক হে !

রামচরণ একটু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে।

আচ্ছা রামচরণ, কাল যখন হীরার হার চুরির ব্যাপার নিয়ে অত গোলমাল হচ্ছিল তখন তুমি কোথায় ছিলে ?

আজ্ঞে করতা, আমি তো ভিতরের বাড়িতেই ছিলুম।

গোলমাল শুনেই বুঝি ছুটে এলে ?

কিরীটীর কথার ভাবে রামচরণ কেমন যেন একটু বিমনা হয়ে ওঠে।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে রামচরণের মুখের দিকে চেয়ে কিরীটী পকেট থেকে গতরাত্রে বাসর ঘরে কুড়িয়ে পাওয়া চায়ের কাপের ভাঙা টুকরোটা রামচরণের সামনে ধরল,···এই ভাঙ্গা চায়ের কাপটার ডিসটা পাওয়া যাচ্ছে না, দেখতো খুঁজে পাও কিনা।

রামচরণ ঘটনার আকস্মিকতায় যেন চমকে গিয়েছিল, পরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে বোকার মত।

।। সাত ।।

(পোড়োবাড়ি)

আগে এমন সময় গিয়েছে যখন কাঞ্চনপুরে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থেরা বসবাস করতেন। কিন্তু নদীর ভাঙন এক সময় এত বেশী প্রবল হয়ে উঠেছিল যে অনেক ঐশ্বর্যের শৌর্য ও বীর্য সে সময় নদীর করাল গ্রাসে পড়ে নিঃশেষে জল-সমাধি লাভ করেছিল।

সে সময় অনেক অবস্থাপন্ন লোকেরা তাদের ঘরবাড়ি ফেলে রেখে দূর শহরে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। যারা শুধু একান্ত গ্রামের মায়া কাটাতে পারলেন না তারাই এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন অনাগত এক দুর্দিনের প্রতীক্ষায়।

সেই থেকে কাঞ্চনপুরে অনেক বাড়ি আজও খালি পড়ে আছে। সেখানে আর কেউই থাকে না। সব যেন ভূতের বাড়ি। পোড়ো বাড়িগুলোর ফাটলে বুনো আগাছা তাদের অবাধ শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে চলেছে। চামচিকে বাদুড় আর শিয়ালের অবাধ আনাগোনা। খোলা জানালা দরজা—কোনটার কপাট বন্ধ, কোনটা হা হা করে খোলা, কোনটায় বা অর্ধভগ্ন পাল্লা হাওয়ায় নড়বড় করে। হাওয়া এসে ঘরের মধ্যে হয়তো শুকনো পাতা উড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে।

বাড়ির আশে-পাশে চারিদিকে ঘন বন-জঙ্গল, আগাছা। দিনের বেলাতেও সেদিকে যেতে গা ছম্‌ছম্‌ করে।

এইরকম একটা বাড়িতে—রাত তখন দ্বিতীয় প্রহর। ঘন অন্ধকার রাত, চারিদিকে থমথমে জমাট নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে শুকনো পাতার উপর দিয়ে নিশাচর জন্তুর হাল্কা পায়ের শব্দ অন্ধকারে স—স শব্দ করে ওঠে একটা যেন। বাড়ির একতলায় একটা ঘরে একটা মাদুর বিছিয়ে মোমবাতির কম্পমান শিখায় মৃদু আলোকে দু'জন লোক চাপা স্বরে ফিস ফিস করে কথা বলছিল। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

সহসা এক সময় ওপাশের দরজার কপাটে শব্দ হয়।—টুক্‌ টুক্‌ টুক্‌…পর পর তিনটি। একজন উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

একজন লোক আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে মুড়ি দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ঘরে এসে ঢুকলো।

আগন্তুক চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করে, এনেছিস ?

একজন বলে, হ্যাঁ।

আর একজন বলে, টাকা কই ?

পাবি, জিনিসটা আগে দেখি।

লোক দুজনের মধ্যে একজন ট্যাঁক থেকে একটা ছোট ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়ার পুঁটলী টেনে বের করল !

অন্ধকারে সে ন্যাকড়ার ভিতর থেকে একটা চাপা দ্যুতি চারদিকে যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটা গিট খুলতেই একটা আরো স্পষ্ট দ্যুতি প্রকাশ পায়।

সুবর্ণ পদ্মের কারুকার্যখচিত গহ্বরের মধ্যে দ্যুতিমান ভাস্করের মত জ্যোতিঃ বিকিরণকারী সেই হীরক খণ্ড !

অন্ধকারে সেই সাদা কাপড়ে ঢাকা লোকটার চোখের মণি দুটো যেন একটা শ্বাপদের চোখের মতই জ্বল জ্বল করে ওঠে।

লোকটা অধীর ব্যাকুলতায় হাত বাড়াতেই ক্ষিপ্রগতিতে হীরকের মালিক হীরা সমেত হাতটা নিজের দিকে সরিয়ে নেয়।

টাকা।…

লোকটা সাদা চাদরের ভিতর থেকে একতাড়া নোট টেনে বের করল।—এই নে, হীরা দে।…

লোকটা এক হাতে নোটের তাড়া নিয়ে অন্য হাতে হীরাটা যেমন দিতে যাবে সহসা একটা কালো মিশমিশে হাত চোখের পলকে হীরাটা পিছন থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল। এবং পরক্ষণেই সমস্ত ঘরটা অন্ধকারে ভরে গেল।

সমগ্র ব্যাপারটা আগাগোড়া এতই আকস্মিক যে পলকের জন্য লোকগুলো বোকা হয়ে যায় যেন। কিন্তু পরক্ষণেই যখন তারা সম্বিত ফিরে পায় ও তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালায়, দেখে ঘরের মধ্যে তারা ছাড়া তখন আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই।

পিছন থেকে আচমকা একটা ধাক্কায় কিরীটি হুমড়ি খেয়ে একটা শক্ত জিনিসের উপর পড়ল। একটা অস্ফুট চিৎকার মাত্র তার মুখ থেকে বের হয়। তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, চারদিকের জমাট নিস্তব্ধ অন্ধকার যেন তাকে চেপে ধরেছে।

অন্ধকার রাতের হাওয়ায় পাতায় পাতায় এক অদ্ভুত সিপ সিপ শব্দ। কোথায় কোন ঝোপে একটা পাখী কেবলই ডাকছে হুতুম…হুপ…হুপ…

অদ্ভুত শব্দ। গায়ের মধ্যে শিরশির করে ওঠে। কপালটা অসহ্য বেদনায় টন টন করছে। হাত বুলিয়ে দেখল কপালটা ফুলে উঠেছে। খানিকটা থেঁতলে গেছে!

একে একে সব কথা মনের মধ্যে এসে যেন অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত ভেসে উঠতে থাকে।

॥ আট ॥

(নিশাচর)

একটু একটু করে কিরীটীর সব মনে পড়ে।

অন্ধকারে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কিরীটী সবে একটা সিগারেট গোটা দুই টান দিয়েছে কি দেয়নি, বাইরের বারান্দায় একটা অস্পষ্ট পায়ের শব্দ কানে আসে। কে বুঝি অতি সাবধানে পা টিপে টিপে চলে গেল মনে হল। চট করে কিরীটী জ্বলন্ত সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে দিল এবং দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

দুপুরে মেয়ে জামাই লঞ্চে রওনা হয়ে গেছে। উৎসব-মুখর বাড়িটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

বারান্দায় ঝোলান আলোয় জায়গাটা বেশ আলোকিত। কে একজন আগাগোড়া সাদা কাপড়ে মুড়ি দিয়ে দ্রুত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাইরে বাড়ির দিকে চলে গেল।

চট করে সুটকেশ থেকে টর্চটা নিয়ে কিরীটী দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সুব্রত আর রাজু একমনে দাবা খেলছে তখন ঘরের মধ্যে। তারা ব্যাপারটা নজরও দেয় না—জানতেও পারে না।

বাইরে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ধূসর আলোর আবছা জাল বিছিয়ে দিয়েছে যেন।

কাছারী বাড়িতে গোমস্তরা হিসাব-নিকাশের কাজে ব্যস্ত। কাছারি বাড়ির পিছন দিয়ে সাদা কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটি এগিয়ে যাচ্ছে তখন। কিরীটী অগ্রবর্তী মূর্তিকে অনুসরণ করে।

কাছারী বাড়ির পিছনে একটা আমবাগান। ঘন সন্নিবেশিত গাছের জন্য জায়গাটা রীতিমত অন্ধকার।

সাদা কাপড়ে ঢাকা মূর্তি এগিয়ে চলে।

সরু অস্পষ্ট পায়ে-চলা পথ। ঝিঁঝিঁর একঘেঁয়ে করুণ সুর বুঝি প্রেতের কান্নার মত মনে হয়। হঠাৎ এক সময় চলতে চলতে অগ্রবর্তী মূর্তি দাঁড়িয়ে পড়ে। কিরীটীও চট করে একটা গাছের আড়ালে সরে দাঁড়ায়।

আবার মূর্তি চলতে সুরু করে।

মূর্তিকে অনুসরণ করে নানা পথ ঘুরতে ঘুরতে কিরীটী এই পোড়োবাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়।

তারপর কখন যে একসময় মূর্তি দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় কোনখানে তাও টের পায় না। সহসা জানালাপথে আলোর আভাসে কিরীটী সচকিত হয়ে ওঠে।

আলোর শিখা অনুসরণ করে কিরীটী পায়ে পায়ে জানালার হাত পাঁচেকের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। তারপর সব কিছুই নজরে পড়ে।

হঠাৎ এমন সময় আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে সে পড়ে যায়। তারপর···?

ধাক্কা খেয়ে পড়বার সময় হাতের টর্চটা কোথায় ছিটকে পড়ে, কে জানে। কিরীটি টর্চটা আশেপাশে খুঁজল, কিন্তু কোথাও পায়না।

অন্ধকারে বাড়িটা একটা ভৌতিক ছায়ার মত যেন দাঁড়িয়ে। কোথায় একটা পোকা কিট কিট শব্দ করে।

সহসা এমন সময় অন্ধকারে কে যেন কথা বলে, বাড়ি যাবে ?

কে ?

আমি যেই হই না, তুমি বাড়ি যাবে ?

যাবো।

এই নাও হাত ধর।···এই যে···

কিরীটী অন্ধকারেই ঠাওর করে হাতটা বাড়িয়ে দেয়, একটা লোমশ নরম নরম কী যেন অনুভব করে।

এগিয়ে এস।

কিরীটী এগিয়ে চলে। এপথ ওপথ ঘুরে অজ্ঞাত অচেনা পথ প্রদর্শকের সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী জমিদার বাড়ির কাছারী ঘরের পিছনে এসে দাঁড়ায়।

এতক্ষণ যেন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে সে পথ হেঁটে এসেছে। একটি ফাঁকা জায়গায় আসতেই কিরীটী যেন সহসা স্বপ্নভঙ্গে মুখ তুলে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে যেন চমকে দাঁড়িয়ে যায়। আপাদ মস্তক কালো একটা আংরাখায় ঢাকা। ছুঁচের মত সরু নাক। চোখ দুটো ড্যাব ড্যাব করছে যেন। মস্ত একজোড়া কান। লম্বা লোমশ কালো হাত।

একি মানুষ! না ভূত! জিন না দৈত্য!···কিরীটী কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে ?

যাও, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। হীরা পাবার আশা আর কর না। হীরা আমার হাতে পেঁছে গেছে। এখন স্বয়ং ভগবানেরও ক্ষমতা নেই সে হীরা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। কথাগুলো বলে প্রবল একটা ঝাঁকুনি

দিয়ে সেই অদ্ভুত মূর্তি সহসা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সুব্রত ও রাজু খেলা শেষ করে কিরীটীকে ঘরে না দেখে ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলে ওঠে ওর কপালের দিকে চেয়ে, ও কি! তোর কপাল ফুলে উঠল কী করে?

কিরীটী কোন কথা না বলে সোজা গিয়ে শয্যার উপরে সটান শুয়ে পড়ে। খানিক পরে ক্লান্ত স্বরে বলে, দাঁড়া, একটু দম নিই।

ব্যাপার কী? দুজনে এক সঙ্গে প্রশ্ন করে।

কিরীটী তখন একে একে সব ব্যাপার খুলে বলে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

কারো মুখে কোন কথা নেই।

বাইরে ঐ সময় একটা দ্রুত জুতোর শব্দ শোনা গেল। এবং একটু পরেই সলিল চৌধুরী এসে ঘরে ঢুকল—এ লজ্জা আমার কিছুতেই যাবে না রায়! হীরাটা আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে, যেমন করেই হোক; যত টাকা লাগে···আমি দেব···মায় আমার জমিদারীর শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত দিতে রাজী আমি।

কথাগুলো একটানা বলে সলিল চৌধুরী ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারী করতে লাগল।

সুব্রত ও রাজু ফ্যাল ফ্যাল করে একবার শায়িত কিরীটী আর একবার সলিল চৌধুরীর মুখের দিকে তাকায়।

বাইরে খড়মের আওয়াজ পাওয়া গেল। নরেন চৌধুরীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তিনি মৃদু কণ্ঠে গান গাইছেন—

'ভেবেছ কি মন এমন যাবে—'

কাকামশাই!—কিরীটী ডাকে।

পরক্ষণেই নরেন চৌধুরী এসে ঘরে প্রবেশ করেন। এবং কিরীটীর কপালের দিকে নজর পড়তেই চমকে ওঠেন ও অধীর ভাবে প্রশ্ন করেন, সর্বনাশ! ওকি, তোমার কপালে কী হল বাবাজী?

কিরীটী মৃদুস্বরে জবাব দিল, অন্ধকারে দরজায় ধাক্কা লেগেছে কাকাবাবু!

এতক্ষণে সলিলেরও নজর পড়ে। সে-ও চমকিয়ে একই প্রশ্ন করে।

তাইতো বাবাজী! একটু আয়োডিন লাগিয়ে দাও, নইলে ব্যথা হবে। দাঁড়াও আমি আনছি—।

নরেন চৌধুরী তাড়াতাড়ি আয়োডিন আনবার জন্য বোধ হয় ভিতর বাড়িতে চলে গেলেন।

!! নয় !!

(সন্দেহ ঘনীভূত)

কিরীটী বলে, আচ্ছা সলিল, তুমি চিৎকার বা গোলমাল শুনেছিলে যখন সে সময়টা রাত্রি কত হবে বলে তোমার মনে হয় ?

সলিল একটু ভেবে জবাব দিল, তা বোধ করি রাত্রি সোওয়া একটা হবে।

সে সময় উপরে কে কে ছিল ?

তা ঠিক বলতে পারব না।

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে ঘরে বসে রাজু কিরীটী সুব্রত ও সলিল এবং দুলাল চৌধুরীর মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল।

দুলাল চৌধুরী এক সময় বলে, একটা কথা মিঃ রায়, রাত তখন সাড়ে বারটা ঠিক হবে, কেন না দোতলায় ওয়াল ক্লকটা ঢং করে একটা শব্দ করল। আমি ছাতের সিঁড়ি দিয়ে নামছি, লোক-জনদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ; চাকররা ছাত পরিষ্কার করছে ও দোতলার বারান্দায় তখন কেউ নেই। বাসর ঘরের দরজা ভেজান— কেন না দাদার আদেশ ছিল বেশী রাত পর্যন্ত— অর্থাৎ বারটার পরে কেউ যেন জামাই মেয়েকে বিরক্ত না করে। রাকেশ দেখি বাসর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিচ্ছে। প্রথমটায় আমি রাকেশকে চিনতে পারি নি, ডাকলাম, কে ?

চমকে রাকেশ মুখ তুলে তাকাল।

আমি অনুযোগের সুরে বললাম, ছিঃ রাকেশ, ও কী হচ্ছে ?

রাকেশ আমার কথায় দাঁত বার করে হেসে বললে, আজ্ঞে বাসর ঘরে একটু উঁকি দিয়ে দেখছিলাম। আমি কঠিন স্বরে বললাম, কিন্তু এত রাত্রে তুমি এখানে কেন ? রাকেশ বলল, বড় বাবুর কাছে একটু দরকার ছিল।...দাদা তো নীচে, আমি বললাম। রাকেশ আমতা আমতা করে নীচে নেমে গেল।

তারপর ? কিরীটী রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করে।

তারপর আমি নীচে চলে এলাম। দাদার স্টাডিতে ঢুকে দেখি দাদা শোবার আয়োজন করছেন। আমি দাদাকে সব বললাম।

সলিল বলল, হ্যাঁ, দুলাল আমাকে বলেছিল বটে তবে শরীরটা তখন বড্ড ক্লান্ত, শুতে পারলে বাঁচি, তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

রাকেশের সঙ্গে পরশু রাত্রে তোমার দেখা হয়েছিল সলিল ?

না।

রাকেশ লোকটা কেমন ?

খুব বিশ্বাসী। নিজের প্রাণ দিয়েও মনিবের ইমান রক্ষা করতে ও পশ্চাৎপদ নয়—ও সত্যিকারের ইমানদার। ওকে আমি লক্ষ টাকা হাতে দিয়েও বিশ্বাস করতে পারি। কেন দুলাল, তোমার কি ওকে সন্দেহ হয় নাকি ?

সলিল চৌধুরী প্রশ্নটা করে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকায়।

না দাদা। তবে সে রাত্রে ওর হাবভাব যেন কেমন কেমন লেগেছিল তাই বললাম।

দেখ সলিল, আমার মনে হয়—মনে হয়ই বা বলছি কেন, আমার নিশ্চিত ধারণা, হীরাটা এখনও কাঞ্চনপুরেই আছে।···কিরীটী বলে।

বল কি? সলিল বিস্মিত কণ্ঠে বলে।

হ্যাঁ আছে। তবে শীঘ্রই হয় তো অপহরণকারী সেটা অন্যত্র সরিয়ে ফেলবে। আর এখান থেকে সরান মানেই হয়ত বেচে দেওয়া এবং হীরাটা একবার হস্তান্তর মানে বিক্রী হয়ে গেলে কারও সাধ্য নেই সে হীরা খুঁজে বের করে। তাই বলছিলাম অপহরণকারী হীরাটা এখান থেকে সরাবার আগেই সেটা আমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ কিরীটী যেন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে এবং চট করে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে খোলা জানালার কাছে এগিয়ে যায়।

অন্ধকারে একটা অস্পষ্ট ছায়ার মত কী যেন সাঁৎ করে দেওয়ালের ওপাশে চলে গেল।

কী হলো, সুব্রত ততক্ষণে একলাফে কিরীটীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

পালিয়েছে—কিরীটী জবাব দিল।

বাইরেটা একবার ঘুরে দেখে আসব নাকি?

না, কাদা ঘাঁটাই সার হবে···তবে দু'চারটে পায়ের ছাপ পেতে পার। সেই যে বাঙালী কবি গেয়েছেন না—শুধু সে রেখে গেছে চরণরেখা গো! সেই রকম হবে—বলতে বলতে কিরীটী একটুখানি মুচকি হাসে।

সেই দিনই গভীর রাতে রামচরণের দরজার গায়ে কে যেন টোকা দিল।

রামচরণ জেগেই ছিল। পা টিপে টিপে উঠে কপাটটা খুলে দিল।

আগন্তুক চাপা গলায় প্রশ্ন করে, কোন খবর আছে?

আজ্ঞে না কেবল চায়ের ডিসটা আমায় খুঁজে দেখতে বলল।

তুই কী বললি?

কী আর বলব?······কিন্তু দোহাই আপনার, আমায় যেন পুলিশের হাতে দেবেন না······ওরা সব বলাবলি করছিল, ও বাবুরা নাকি সব পুলিশের টিকটিকি।

আগন্তুক কোন জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে।

আমার কি হবে? রামচরণ আবার বলে, চাকরি করতে এসে শেষে জেলে যাব? দোহাই বাবু, আমায় বাঁচান। রামচরণ ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করে।

আগন্তুক পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে চাপা গলায় বলে, নে পঞ্চাশটা টাকা। রাত থাকতে নৌকা ভাড়া করে গোয়ালন্দ চলে যাবি।······ তারপর ট্রেনে উঠে কলকাতায় যাস। তোর কোন ভয় নেই।

আগন্তুক চলে গেল, যেমন নিঃশব্দে এসেছিল ঠিক তেমনই।

কাছারী বাড়ির পিছন দিয়ে সরে এসে রামচরণ রাস্তায় নেমেছে। এমন সময় কে একজন বাঘের মত অন্ধকারে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চুপ—চেঁচিয়েছো কি একেবারে শেষ করে দেব।

ঠাণ্ডা একটা কী কপালের উপর স্পর্শ পেতেই রামচরণ চমকে চেয়ে দেখে পিস্তলের চোঙাটা তার কপাল ছুঁয়ে আছে।

চাপা গলায় আক্রমনকারী প্রশ্ন করে, একটু আগে কার সঙ্গে কথা বলছিলি ঘরের মধ্যে? শিগগির বল, নইলে কুকুরের মত গুলি করে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব, বল।

রামচরণ একটা ঢোক গিলে বলে, আজ্ঞে—আ···আ···

ফের আবার দেরী করছিস, শিগগির বল।

এমন সময় অকস্মাৎ প্রচণ্ড একটা আঘাতে চকিতে কিরীটীর হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে।

অসহ্য ব্যথায় কিরীটী আর্তনাদ করে ওঠে—উঃ!

অস্পষ্ট আলোয় কিরীটী পরক্ষণেই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে আগের রাত্রের সেই বীভৎস মূর্তি!

অন্ধকারে লোকটার চোখ দুটো ঝকঝক করে জ্বলছে। সাদা দু'পাটি দাঁত যেন একটা পৈশাচিক ক্ষুধায় কিসের সর্বনাশা ইঙ্গিত জানায়।

আগন্তুক নীচু হয়ে রিভলভারটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চাপা ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলে, এখনও যাও নি। কী আশায় বসে আছ? ঘরের ছেলে ঘরে যাও। তুমি একটি আস্ত আহম্মক। এই বিদ্যে নিয়ে তুমি টিকটিকি সেজেছ!··· বলতে বলতে আগন্তুক চাপা হাসি হেসে ওঠে।···ও লোকটাকে আটকে তোমার লাভ কি? হীরা নিয়েছি আমি। আমায় ধরতে পার তবে তো বলি বাহাদুর ছোকরা তুমি! আচ্ছা শুভরাত্রি! রিভলভারটা দিচ্ছি না; যথা সময়ে ফিরত পাবে। আগন্তুক চকিতে সামনের অন্ধকার ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

।। দশ ।।

(ভগ্ন দেবালয়)

কিরীটীর ঘুম ভাঙল বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখে।

ভোরের আলো তখনও ভাল করে ফুটে ওঠে নি। শুধু রাতের ধূসর পর্দার আড়াল থেকে একটা অস্পষ্ট আলোর ক্ষীণ আভাস চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পাশের আমবাগানে পাখীর কলকাকলি প্রভাতী গান গায়। খোলা জানালা পথে শীতের হাওয়া ঝিরঝির করে বইছে।

কিরীটী বিছানার ওপর উঠে বসে। চোখ দুটো ভাল করে রগড়ে নেয়।

সুব্রত ও রাজু পাশেই অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

প্রথমেই কিরীটীর নজরে পড়ে ওদের ঘরের দরজাটা হা হা করছে খোলা!

আশ্চর্য ! ওরা তো দরজা বন্ধ করে অনেক রাত্রে শুয়েছিল ! তবে ?…

কিরীটী বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াতেই সামনের টিপয়টার উপরে নজর পড়ে। নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও যেন চমকে ওঠে ! টিপয়ের উপরে ওর রিভলভারটা। আর রিভলভারের নীচে চাপা দেওয়া ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজের মত ওটা কী ?…কি ওটা ?

দু'পা এগিয়ে এসে একান্ত বিস্মিত ভাবেই রিভলভারটা সরিয়ে ভাঁজ করা কাগজটা তুলে নেয়। কাগজটার ভাঁজ খুলতেই দেখে একটা চিঠি। তাতে লেখা—

রায় মশাই,

এসে দেখলুম আপনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন—তাই আর ঘুম ভাঙালাম না—আপনার রিভলভার রেখে গেলাম। পাঁচটি গুলি ঠিকই আছে গুলি সরাই নাই, কেননা, ভবিষ্যতে আপনার কাজে লাগিতে পারে। আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন যে, শীঘ্রই আমি হীরাটার একটা সুরাহা করিব। কেন না হীরাটার উপরে আমার আসলেই কোন লোভ নাই—আমার প্রয়োজন টাকার। কাজেই হীরা দিয়া আমি টাকা সংগ্রহ করিতে চাই। চাই কি, যোগ্য দাম পাইলে আপনাকেও বেচিতে আমার আপত্তি নাই জানিবেন। আপনাকেও বলি, আপনার এখানে অনর্থক বসিয়া থাকিয়া আর লাভ নাই—কেননা পরশুই আমি কলিকাতা রওনা হইব। হাতে খুব ব্যথা পাইয়াছেন কি ? একটু চুন হলুদ লাগাইয়া দেখিতে পারেন, আরাম পাইবেন। ইতি—

হীরাচোর।

কিরীটী একবার দু'বার তিনবার চিঠি খানা আগাগোড়া পড়ল। আশ্চর্য লোকটার কার্যকুশলতা ! কিরীটী দেখেছে অনেক। এই বয়সে তাকে অনেক দুর্ধর্ষ শয়তানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু এর কাছে তারা যেন তুচ্ছ।

কিরীটী চিঠি খানা ভাঁজ করে জামার পকেটে রাখল। তারপর সুব্রত ও রাজুকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলল—ওঠ, ওঠ। কী ঘুম যে তোদের !

দু'জনে ধাক্কা খেয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে—শয্যার উপরে উঠে বসল।

চল, একবার গ্রামটার চার পাশে ঘুরে দেখে আসা যাক।

কেন, হঠাৎ গ্রাম দেখবার আবার বাসনা জাগল কেন ?

বাঃ, একটা নতুন জায়গায় এলাম। একবার ভাল করে গ্রামটা দেখে যাব না।

বেশ চল—সুব্রত ও রাজু একসঙ্গে বলে।

ভোরের আলো আকাশের গায়ে অল্প অল্প ফুটে উঠছিল তখন। চারিদিকে একটা শুচিস্নিগ্ধ ভাব। তিন জনে হাঁটতে হাঁটতে নদীর দিকে চলল। নদীর ওপারে ধানক্ষেতের মাথা ছুঁয়ে রাঙা সূর্য উঁকি দেয়।

নদীর বুকে আজ এতটুকু কুয়াশা নেই। গেরুয়া রংয়ের চাদরের মত নদীর জল যেন গা এলিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে দু' একটা পাখী মাথার ওপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে নদীর ওপর দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে উড়তে উড়তে কোথায় চলে

যায়। শুধু তাদের ডাকের ক্ষীণ শব্দটা আকাশের গায়ে ছড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

ওরা তিন জনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে।

এদিকটায় লোকজনের বসতি একপ্রকার নেই বললেই চলে। শুধু আশ শেওড়া, বন-বাবলা, হিজল গাছ। খেজুর গাছও এদিকটায় প্রচুর। কোন কোনটায় আবার মাটির হাঁড়ি বাঁধা।

নদীর পাড় কোথায় ভেঙেছে ; অর্ধভগ্ন অবস্থায় নদীর জলে ঝুলে আছে। সেই রকম ভাঙা মাটির গায়ে একটা হেলে পড়া হিজল গাছের ডালে বসে একটা শ্যামা পাখী বিচিত্র ভঙ্গিতে তার মস্ত লেজটা দুলিয়ে আপন মনে ডাকছে।

কারও মুখে কোন কথা নেই। নীরবে শুধু তিনজনে নদীর ধার দিয়ে দিয়ে হেঁটে চলে। একটা সরু পায়ে চলা পথ কিরীটীর চোখে পড়ে। নদীর পাড় থেকে এগিয়ে দূরের বাঁশবনের মাঝে যেন হারিয়ে গেছে। বাঁশ ঝাড়ের ডগা ভেদ করে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা যায়।

কিরীটী হঠাৎ থেমে আঙুল তুলে মন্দিরের চূড়াটাকে দেখিয়ে বলে, ওই বোধ হয় সেই মন্দির। চৌধুরীদের অর্ধসম্পন্ন কাহিনীর ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন— চল, একবার ঘুরে আসি।

সুব্রত ও রাজু কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়, তারা যেন ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারে না।

এরই মধ্যে ভুলে গেলে? সেদিন নরেন চৌধুরী বললেন না—তাঁদের কে একজন পূর্বপুরুষ একশ' সাতটা নরবলি দিয়ে বাকী একটার জন্য বিফলকাম হয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন নি?

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে পড়েছে বটে, চল, দেখে আসা যাক। ওরা দুজনে বলে ওঠে।

তখন সেই সরু পথ ধরে তিনজন অগ্রসর হয়। বাঁশঝাড় এখানে এত বেশী ঘন যে, দিনের বেলাতেও এখানে যেন অন্ধকার হয়ে থাকে। চারপাশে একটা ভৌতিক স্তব্ধতা যেন থমথম করছে। অতি কষ্টে বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে তিনজনে চলতে লাগল। অনেক চেষ্টার পর ওরা অতীতের সেই ভগ্ন দেবালয়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

প্রকাণ্ড উঁচু মন্দির। প্রশস্ত বাঁধান মন্দির প্রাঙ্গণ। বহু কালের ঝড় জল তার মাথার উপর দিয়ে গেছে। ময়লা ও শুকনো পাতায় বিশ্রী নোংরা হয়ে আছে। মন্দিরের গায়ে শ্যাওলা ধরে পিঙ্গল সবুজ বর্ণের যেন একটা আচ্ছাদন পড়েছে। মন্দিরের গায়ে চারিদিকে ফাটল। সেই ফাটলে বট অশ্বত্থের শাখা মাথা তুলে হাওয়ায় দুলছে।

মন্দিরের প্রকাণ্ড দরজাটা ভেজান।

কিরীটী এগিয়ে এসে দরজার গায়ে ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য! মন্দিরের বাইরে চারপাশে এত নোংরা এত আবর্জনা—অথচ ভিতরটা যেন ঝকঝকে তকতকে। মনে হয় কেউ বুঝি এই মাত্র ঝেড়ে পুঁছে তকতকে করে রেখে গেছে মন্দিরের ভেতরটা।

পাষাণ বেদী, কিন্তু কোন মূর্তি নেই।

মন্দিরের ভিতরে দুপাশে দু'টো জানালা। একটা জানালার আবার একটা কপাট খোলা।

হঠাৎ কিরীটীর চোখে পড়ে সেই জানালার উপর একটা অর্দ্ধদগ্ধ মোমবাতি। খানিকটা গলা মোমবাতিটার তলায় তখনও চাপ বেঁধে আছে। কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই কিরীটী বলে, হুঁ—দেখা যাচ্ছে মন্দিরটা তাহলে একেবারে পরিত্যক্ত নয়। দেবতার প্রতিষ্ঠা না হলেও মানুষের সমাগম আছে।

মোমবাতি দেখছি এখানে, মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কেউ আসে—সুব্রত বলে।

সে তো তিনি ঐ মোমবাতিটা রেখেই প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। কিন্তু আর নয়, চল, ফেরা যাক এবারে—কিরীটী বলে।

॥ এগার ॥

(বিস্ময়কর আবিষ্কার)

এদিকে—বেলা বেশ হয়েছিল। সূর্যের আলোয় চারিদিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নদীর ধারে ধারে সব গৃহস্থবাড়িতে কাজকর্ম সুরু হয়ে গেছে।

কিরীটী হীরা চুরির ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছিস ?

কিরীটী সুব্রতর মুখের দিকে চেয়ে হাসল। তারপর যেমন হাঁটছিল তেমনি হেঁটে চলে নিঃশব্দে।

হঠাৎ একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে কিরীটী বলে, এখানে আসবার পর হীরা চুরি যাওয়ার আগে থেকে এবং চুরি যাওয়ার পর পর্যন্ত যে সব ঘটনাগুলো ঘটেছে, তার মধ্যে এমন কোন জটিলতাই নেই যে কারণে ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হতে পারে।

তার মানে ? বিস্মিত ভাবে সুব্রত তাকায় কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী বলে, মানে অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল! আগাগোড়াই ব্যাপারগুলো জলের মত। চোর কলাকুশলী, কিন্তু বুদ্ধিমান নয়।

এসব কি বলছিস ? সুব্রত বিস্মিতভাবে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

বলছি, কিরীটী বলে, কে যে চোর তা কি এখন পর্যন্ত অজানা আছে ? সে তো হীরা চুরি যাবার পরদিন সকালেই জানতে পেরেছি।

এ্যাঁ, তাই নাকি ? একই সঙ্গে সুব্রত ও রাজু বলে, মানে তুই জানিস, কে হীরা চুরি করেছে ?

জানি, কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে।

তাহলে তাকে ধরছিস না কেন ?

ধরিয়ে তাকে নিশ্চয়ই দেব, সময় হলেই।

সময় হলে! সুব্রত তাকায় কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী বলে,—হ্যাঁ, দেব। কিন্তু দিলেই তো হল না, প্রমাণ তো করতে

হবে ; তাই যতক্ষণ না সব প্রমাণ হাতে আসছে তাকে ধরতে যাওয়া বোকামীই হবে।

প্রমাণ যদি না করতে পারিস—

না পারলে, কিরীটী বলে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব।

তা হলে এত যে সব টানা হেঁচড়া করা হল তা একেবারে নিরর্থক—সুব্রত বলে।

কিরীটী বলে, তাহলে তাই হবে।

ততক্ষণে তারা চলতে চলতে জমিদার বাড়ির কাছাকাছি এসে—পড়েছে।

সলিলের কাকা নরেন চৌধুরী একখানা উড়ুনি গায়ে দিয়ে এদিকেই কোথায় যাচ্ছিলেন, চোখের দৃষ্টি নীচের দিকে নিবদ্ধ। চোখ তুলতেই সহসা ওদের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল।

নরেন চৌধুরী একগাল হেসে বললেন, হেঁ হেঁ···এই যে বাবাজীরা, কোথায় গেছিলে সব ?

এই একটু প্রাতর্ভ্রমণে, কিরীটী জবাব দেয়।

প্রাতর্ভ্রমণে, তা বেশ বেশ। কিন্তু এখানে তো আর তোমার পার্ক নেই, স্কোয়্যার নেই, রেকট্যাঙ্গুলার না কী সব বলে তাও নেই—বলতে বলতে নরেন চৌধুরী হা হা করে হেসে ওঠেন।

নরেন চৌধুরীর হাসিটা চমৎকার।

ওরাও হাসিতে যোগ দিল।

হঠাৎ আচমকা উচ্ছ্বসিত হাসির বেগটা রোধ করে তিনি বললেন, হীরাটার কোনও কিনারা কি করতে পারলে কিরীটী ?

নরেন চৌধুরীর চোখের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ···।

কিরীটী বা সুব্রত কারও চোখে সেটা এড়ায় না।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে, না—

এ আমি তখুনি জানতাম বাবাজী ?···নরেন চৌধুরী মুচকি হেসে বললেন, এ তোমার কলকাতার চোর ছ্যাঁচোড় নয়···এরা পাকা ওস্তাদ···আরে বাবা, এ কি চাট্টিখানি কথা ! সলিলেরও যেমন···

আমরা এখান থেকে কালই রাত্রে চলে যাচ্ছি কাকাবাবু।—কিরীটী বলে।

চলে যাবে ? নরেন চৌধুরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চকিতে একবার কিরীটীর কঠিন ভাবলেশহীন মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন, তার পর বললেন, কেন বাবা, আরো দু'চারটে দিন থেকে গেলে হত না ?

না, এখানে যেন আর মন টিঁকছে না।

হঠাৎ আচমকা এমন সময় পাশ থেকে রাকেশলোচনের কণ্ঠস্বর শুনে সকলে যুগপৎ ফিরে তাকাল।

হেঁ হেঁ, হচ্ছে হলো গা, কর্তাবাবু আপনাদের একবার ডাকছেন।

আরে রাকেশবাবু যে ! কিরীটী বলে ওঠে, প্রাতঃপ্রণাম !

হেঁ হেঁ, গুড মর্নিং ! রাকেশলোচন প্রত্যুত্তরে বলে, হচ্ছে হলো গা,

কর্তাবাবু আপনাদের ডাকছেন !

তাই নাকি ? কিরীটী বলে, চলুন।

সকলে এগিয়ে চলে।

সলিল তার ঘরের মধ্যে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে বলে, চা টা না খেয়েই এত সকালে সব কোথায় বের হয়েছিলে ?

এই একটু বেড়াতে আর কি···

সলিল অতঃপর বলে, আমাকে কাল একটা মহাল দেখতে যেতে হবে ভাই ! ফিরতে দিন দুই দেরী হবে। কাকা রইলেন, রাকেশ রইল, তোমাদের কোন কষ্ট হবে না।

আমরাও যে কাল এখান থেকে যাব, ঠিক করেছি, কিরীটী বলে।

এত তাড়াতাড়ি ! বিস্মিত কণ্ঠে সলিল বলে, আমার হীরাটার কী হবে ?··· জামাইয়ের কাছে তো আর মান থাকে না। ভাই !

কিরীটী হাসে—যার হীরাটায় নেয্য অধিকার সেটা সে পাবেই, ভয় নেই !

কিরীটীর কথার ধরণে সহসা যেন সলিল চমকে ওঠে। পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে বলে ওঠে, তা হলেই হল ভাই। তন্দ্রা তার হীরাটা পেলেই আমার মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় !

আমি জানি সেটা কার কাছে আছে ! কিরীটী শান্ত গলায় জবাব দেয়।

জান—এ্যাঁ ! কার ? কার কাছে আছে ভাই ! সলিলের কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা।

সময় হলেই সব জানতে পারবে।···তারপর কিরীটী একটু থেমে বলে, কিন্তু কালই আমি যেতে চাই ; আমাদের যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দাও।

সলিল বলে, যদি একান্তই কাল যাও তার আর বন্দোবস্ত কী ? দুলাল কাল কলকাতায় যাচ্ছে, লণ্ড তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে যাবে। তার সঙ্গেই যেতে পার।

কে যাবে ? কিরীটী শুধায় ?

আমার ছোট ভাই দুলাল।

ওঃ, তা বেশ ! তাহলে তার সঙ্গেই যাওয়া যাবে। সেই বন্দোবস্তই কর।

তারপর সলিলের মুখের দিকে চেয়ে কিরীটী বলে, তোমাদের বাড়িটা শেষ বার একবার ঘুরে ফিরে দেখতে চাই সলিল !

বেশত' বেশত' !···সলিল বলে, গোমস্তাকে বলে দেবখন।

ঐ দিন আহারাদির পর সারাটা দুপুর কিরীটী আবার একবার জমিদার বাড়ির ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখল।

গোমস্তার ঘরের পাশেই একটা তালাবন্ধ ঘর দেখে কিরীটী জিজ্ঞাসা করে গোমস্তাকে, এ ঘরটায় কি থাকে গোমস্তা বাবু ?

ক্যান ?······ওডার মধ্যে কি আর থাকব······

খুলুন না, একবার ঘরটা দেখি।

কিরীটীর কথামত গোমস্তা চাবি দিয়ে ঘরটার তালা খুলে

ছোট অপরিসর ঘর। একদিকে কতকগুলি পাট স্তূপ করা আছে। আলো বাতাসহীন অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন। কিরীটী হাতের টর্চ ঘরের মধ্যে ফেলে ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। ঘরের উত্তরমুখো একটা দরজা···সেটা বাইরে থেকে বন্ধ।

এ দরজাটা কিসের? কিরীটী গোমস্তাকে শুধায়।

ওটা ভিতর বাড়ীতে যাবার রাস্তা।···ওদিক থেকে তালা বন্ধ।

ওঃ, বলে কিরীটী ঘরের দেওয়ালগুলি পকেট থেকে একটা পেনসিল বার করে টোকা মেরে মেরে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। ঘরের বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধে ও ভারী বাতাসে দম বন্ধ হয়ে আসে যেন।

গোমস্তা বলে, আমি গেলাম গিয়া বাবু, আপনার কাম হইয়া গেলে চাবিডা আমারে দিয়া দিবেন।···এই লন চাবি।

কিরীটী চাবিটা নিল। গোমস্তা চলে গেল।

ঘরটা যে বড় একটা ব্যবহৃত হয় না তা দেখলেই বোঝা যায় এবং এ ঘরের সঙ্গে অন্দর মহলের যাতায়াতের দরজাটাও বহুদিন থেকেই হয়ত বন্ধ।

কিরীটী আলো ফেলে ফেলে অতি সন্তর্পণে দরজার কপাটটা দেখতে লাগল। মরিচা ধরা দরজার কড়া। দরজার কপাটের গায়ে এক পরদা ধুলা জমে আছে বিশ্রী ভাবে। হঠাৎ দরজার কড়ার গায়ে লাল মত কী একটা দেখে কিরীটী যেন সজাগ হয়ে ওঠে।

গোলা সিঁদুরের দাগ বলেই মনে হচ্ছে। সন্তর্পণে হাত দিয়ে দেখে যে সত্যি সিঁদুরের দাগই, এখনও হাতে উঠে আসে।

কোথা থেকে এই সিঁদুরের দাগ এখানে লাগল। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ যেন কিরীটীর মনের মধ্যে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে যায়।···অন্ধকারে কিরীটীর চোখের তারা দুটো আনন্দঘন হয়ে ওঠে যেন।

দরজাটা কতদিন খোলা হয়নি কে জানে—দরজার কড়াটা ধরে একটু নাড়াচাড়া করতেই কিরীটীর মনে হয় যেন, ঘরের মেঝের যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেটা কেমন দুলছে, এ-কী! ভূমিকম্প নাকি?

কিরীটী সতর্ক হয়। কিন্তু কই না তো······এখন তো আর পায়ের নীচে মেঝে কাঁপছে না।···তবে?···

কিরীটী কি যেন ভাবে, তারপর কড়াটা বেশ করে চেপে ধরে দু'চারবার টানাটানি করে। আবার পায়ের নীচে মেঝে কেঁপে ওঠে। এবারে কিরীটী বেশ জোরে কড়াটা ধরে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে মাটির নীচের একটা গর্তের মধ্যে সে পড়ে গেল কিছু বুঝবার আগেই।

।। বার ।।

(মাটির নীচের পথ)

প্রথমটায় কিরীটী এমনভাবে অতর্কিত হুড়মুড় করে গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়েছিল যে সে টাল সামলাতে পারে নি। খুব নীচে নয়। হাত চার পাঁচেক নীচে হবে।

ওর পায়ে ও হাঁটুতে বেশ লাগে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায় প্রথমটায়। নিজেকে সামলে নিয়ে যখন সে উঠে দাঁড়ায় প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারে না। গর্তের কোথা দিয়ে উপরের ঘরের ভিতর থেকে সামান্য যে আলো আসছিল তাতে ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোছায়ার একটা মৃদু আভাস যেন সৃষ্টি করে।

কোমরে বেশ চোট লেগেছিল ; হাতেরও দু' এক জায়গায় ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছিল। মাথার উপরে ঘরের মেঝে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করা যায়।

নিজেকে সামলে নিয়ে প্রথমেই কিরীটী প্রখর অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। বুঝতে পারে যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটা মাটির নীচের সুড়ঙ্গ পথ। কিন্তু সুড়ঙ্গ পথটা কোথায় গেছে, কে জানে ?···সুড়ঙ্গ পথ মানেই গোপন-পথ, নিশ্চয়ই এ পথ গোপনে আনাগোনা করার জন্য। কিরীটী অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে আরো একটু এগিয়ে গেল।

রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়িটা অন্ধকারে ঝিকমিক করে জোনাকির আলোর মত জ্বলছে। ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল, বেলা দেড়টা। উঃ, অনেক বেলা হয়েছে এবারে ফেরা প্রয়োজন। কিরীটী আর অগ্রসর না হয়ে গর্তের সামনে ফিরে এসে হাত বাড়িয়ে গর্তের মুখের চার পাশের কঠিন সিমেণ্টের মেঝের কিনারে হাতের ভর দিয়ে উপরের ঘরে উঠে এল।

পুনরায় দরজার কপাটের কড়াটা জোরে চেপে ধরে মোচড় দিতেই ঘরের মেঝের ভিতর থেকে একটা গোলাকার সিমেণ্টের ঢাকনিমত গর্তের মুখে এসে মুখ বন্ধ করে দিল।

কিরীটী ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। মুহূর্তকাল কিরীটী কি যেন ভাবে তারপর চাবির রিং থেকে ঘরের তালার চাবিটা খুলে নিয়ে সেটা জামার পকেটে রেখে দিল।

খাজাঞ্চী খানায় ফিরে এসে দেখল গোমস্তা একটা মোটা বাঁধান খাতার উপর ঝুঁকে একমনে কী একটা হিসাব লিখছে।

চাবির রিংটা তার দিকে এগিয়ে দেয় কিরীটী, এই নিন চাবিটা।

সব দেখলেন কর্তা ! গোমস্তা জিজ্ঞাসা করে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে।

কিরীটী মাথাটা হেলিয়ে জানায়, হ্যাঁ।

চাবির তোড়াটা গোমস্তার হাতে দিয়ে কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে এল।

ঘরে ঢুকতেই সুব্রত ও রাজু একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে—কি ব্যাপার !

কোথায় ছিলে এতক্ষণ—

কিরীটী মৃদু হেসে বলে।

বন্ধুবরের হীরা উদ্ধারিতে—

অন্ধ গুহার অন্ধকারে !

কিন্তু এককাপ চা হলে বড় ভাল হত রে···বলতে বলতে কিরীটী সম্মুখের টিপয়ের উপরে রক্ষিত সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট উঠিয়ে নিয়ে দুই ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে অগ্নি-সংযোগ করতে দিয়াশলাই জ্বালায়।

সুব্রত জানত কিরীটীর মনের উৎফুল্লতা সহজে বড় একটা আসে না ; যখন কোন একটা জটিল রহস্যের কোন একটা দিক পরিষ্কার হয়ে যায় তখনই সে এমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এবং সে সময় কথাও সে বলে কম। কেবল কাপের পর কাপ চা ও সিগারেটের পর সিগারেট তার মৌন মনের চিন্তাজালের সঙ্গে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় জমাট বেঁধে উঠতে থাকে ক্রমশঃ।

সুব্রত উঠে ঘরের বাইরে গিয়ে একজন ভৃত্যকে ডেকে এক কাপ চায়ের জন্য বলে এল।

তারপর, ব্যাপার কি, ছিলি কোথায় ?

দাঁড়া; আগে গলাটা ভিজুতে দে।

একটু পরে চা এলো। চায়ের কাপে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে কিরীটী একটা সিগারেট ধরায়। ধূম উদ্‌গিরণ করতে করতে নিভন্ত কাঠিটা জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে বলে, সকালবেলার সূত্রটা যে জট পাকিয়ে ছিল সেটা আপাতত খুলে গেছে সু।

সুব্রতর দিকে চেয়ে কথাটা বলে কিরীটী আবার নিঃশব্দে ধূমপান করতে থাকে।

সেই দিন রাত্রে আহারাদির পর—রাজু আর সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে ওর কথা শুনছিল। এক সময় কিরীটী স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে, যদি জানতাম যে সলিলদের বাড়ির মধ্যেই এত কাদা জমে আছে তাহলে নিশ্চয়ই এ কাদা ঘাঁটতে আমি তখন সম্মত হতাম না—

সুব্রত কথাটা যেন ঠিক বুঝতে পারে না। কিরীটীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

কিরীটী আবার বলতে থাকে—পুরানো বনেদী জমিদার বাড়ি এর ইঁটে ইঁটে অনেক পাপ—অনেক অন্যায় জমে আছে। এবং নিজেদেরই বংশের একটা হীরাকে কেন্দ্র করে যে নোংরামি ওরা শুরু করছে এ তো তারই জের—

তা'হলে তোর ধারণা কিরীটী হীরাটা এ বাড়িরই কেউ না কেউ সরিয়েছে ? সুব্রত প্রশ্নটা করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

সেটা তো পরিষ্কারই বোঝা যায়। বাড়ির মধ্যেই কেউ নিয়েছে নচেৎ বিয়ের বাসর থেকে এমন করে অত সহজে মেয়ের গলা থেকে হীরাটা বাইরের কারো পক্ষেই ত ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয় সুব্রত—

কিন্তু—

একটা ব্যাপার তোরা ভুলে যাচ্ছিস কেন—চোর বাড়ির কেউ বলেই যখন যেখানে খুশি যাওয়া বা আসা তার পক্ষে আদৌ অসম্ভব ছিল না, আর সেই কারণেই কেউ তাকে বাসর ঘরে দেখেও সন্দেহ করেনি বা করতে পারে নি।

তা যেন বুঝলাম—তাহলেও হীরাটা যে চুরি যেতে পারে সে সম্ভাবনাও তো ছিল?

তা ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথা নিশ্চয়ই ভুলবি না—হীরাটার উপর কারো-কারো লোভ ছিল—সেদিক দিয়ে সলিল কি আগে থাকতেই সাবধান ছিল না তুই বলতে চাস—ছিল তবু সে আটকাতে হয়তো পারেনি চুরির ব্যাপারটা এবং—

হঠাৎ কথা বলতে বলতে কিরীটী থেমে যায়। খোলা জানালা পথে বাইরে অন্ধকারে তাকায়। জানালার সামনেই একটা গাছ—সেই দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বলে, টর্চ—টর্চটা দে শিগগিরী সুব্রত।

সুব্রত তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে শয্যার পাশ থেকে টর্চটা নিয়ে কিরীটীর হাতে দেয়।

কিরীটী টর্চটা হাতে প্রায় লাফিয়েই জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাতের টর্চের বোতাম টেপে। একটা আলোর রশ্মি গাছটার উপরে গিয়ে অন্ধকারে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হুড় মুড় করে কে যেন গাছ থেকে ডাল ভেঙে নীচে পড়ল। তারপরই দ্রুত পালানোর পদশব্দ।

কিরীটীর হাতের টর্চের অনুসন্ধানী আলোর রশ্মিটা সেই পলায়নপর ব্যক্তি বিশেষের উপর চকিতে গিয়ে পড়ে।

সুব্রত চাপাকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, ও কি—ও যে—

তাড়াতাড়ি কিরীটী সুব্রতর কাঁধের ওপর হাতের চাপ দিয়ে চাপা সতর্ক কণ্ঠে বলে ওঠে, চুপ! চেঁচাস নি।

কিন্তু—

ও বোধ হয় বুঝতে পারে নি।

বুঝতে পারেনি?

না!

অবশ্য ঐ অল্প সময়ের মধ্যে রাজু ও সুব্রতরও লোকটিকে চিনতে এতটুকু কষ্ট হয়নি। ওরা দুজনে সত্যিই যেন বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল।

।। তের ।।

(অন্ধ গুহার অন্ধকারে)

ওরা সকলে এসে আবার যে যার চেয়ারে বসল। জানালাটা খোলাই রইল।

কিরীটী একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে।

সুব্রত আর রাজু দুজনেই চুপ; কারো মুখে কোন কথা নেই।

খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে কিরীটী এক সময় বলে, তোরা খুব আশ্চর্য হয়েছিস সলিলকে ঐ অবস্থায় দেখে।

সলিলবাবু কি তবে গাছের ডালে উঠে পাতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা করছিলেন ?

হ্যাঁ, নীরস কণ্ঠে কিরীটী বলে।

তার ভাবলেশহীন কণ্ঠস্বরে—যেন এতটুকুও কোন কিছুর আভাস নেই। একান্ত নির্বিকার।

ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিছু বিস্ময়ের বা আশ্চর্যের ঘটনা নয় ; শুধু তাই নয় এমন যে একটা কিছু ঘটতে পারে বা ঘটবে এ যেন তার আগে থেকেই জানা ছিল।

আরো আশ্চর্য হবার আছে, কিরীটী ওদের দিকে চেয়ে বলে, এবং তা শুনলে হয় তো তোরা আরও চমকে উঠবি।

কি—কি ! দুজনে একসঙ্গে প্রশ্ন করে।

জানিস তো একটা প্রবাদ আছে আমাদের দেশে—সবুরে মেওয়া ফলে—কিরীটী হাসতে হাসতে বলে।

কিরীটী আবার সিগারেটে একটা মৃদু টান দিল।

কাছারীর পেটা ঘড়িতে রাত বারটা ঘোষণা করল।

পরের দিন। স্নান আহার শেষ করে রাজু ও সুব্রত যে যার শয্যার পরে গা এলিয়ে দিয়েছিল।

কিরীটী বাগানের দিককার জানালার কাছে একটা চেয়ার নিয়ে বসে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে ধূমপান করছিল।

শীতের রোদ বাগানের গাছ পালায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কোথায় একটা কোকিল থেকে থেকে আপন মনে ডেকে উঠছিল। ওদিককার আমলকি গাছটায় পীতাভ পাতা ঝরার সমারোহ···তারই একটা ডালে লাল টোপর মাথায় ছোট্ট বুলবুলি আপন খেয়ালে শিস দেয় আর মাঝে মাঝে এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে উড়ে বসে।

চিন্তার জাল একটার পর একটা কিরীটীর মাথার মধ্যে জট পাকায় যেন। ক্রমদগ্ধমান সিগারেটের ঈষৎ পীতাভ ধোঁয়া চক্রাকারে জানালার পথে বাইরে ভেসে গিয়ে হাওয়ায় ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে।

সুব্রত ও রাজু এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা আর বেশী নেই। পড়ন্ত সূর্যালোকের রশ্মি লালিমা উদ্যানের বৃক্ষের চূড়ায় চূড়ায় যেন আবীর ঢেলে দিচ্ছে তখন। ছোট বড় পাঁচমিশালী পাখীর নানাবিধ কলকাকলি বেলা শেষের নীরবতা মুখর করে তুলেছে।

হঠাৎ সুব্রতর নজরে পড়ে, কিরীটী যেমন জানালার ধারে চেয়ারে বসেছিল ঠিক তেমনই বসে আছে। শুধু আশে পাশে দগ্ধ অর্ধদগ্ধ অসংখ্য সিগারেটের টুকরো ও ভস্মকণা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

হাতের দুই আঙুলের ফাঁকে ধরা তখনও একটা জ্বলন্ত অর্ধদগ্ধ সিগারেট। কোন কিছু চিন্তা করছে গভীরভাবে, এ সময় ওকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। সুব্রত কিরীটীকে ডাকল না, নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

একজন ভৃত্য একটা ট্রেতে চা ও জল খাবার সাজিয়ে এই দিকেই আসছিল, সুব্রত তাকে পাশ কাটিয়ে বাইরে দীঘির ঘাটের দিকে চলে গেল।

কাছারী বাড়ির সামনেই বিরাট এক দীঘি। কাকচক্ষুর মতই পরিষ্কার টলটলে জলে দীঘিটা কানায় কানায় ভরা। দীঘির দুইপাশে বড়বড় নারকেল ও সুপারী গাছ। অস্তগামী সূর্যের শেষ আলো উন্নতশীর্ষ নারিকেল গাছের সরু চিকণ পাতার গায়ে রঙীন স্বপ্ন জাগাচ্ছিল তখন। মৃদুমন্দ হাওয়ায় দীঘির বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউয়ের ভাঙাগড়া।

প্রশস্ত বাঁধান ঘাট! হাত মুখ ধুয়ে সুব্রত বাঁধান ঘাটের উপর বসে।

কতক্ষণ বসেছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ কিরীটীর ডাকে চমক ভাঙে—ওহে মুনিবর! এই নির্জনে কার ধ্যান হচ্ছে শুনি? এদিকে যে অভিসারের লগ্ন বয়ে যায়।

ইতিমধ্যে—কখন এক সময় সাঁঝের অন্ধকার তার ধূসর ওড়না খানি শ্রান্ত ক্লান্ত পৃথিবীর বুকের উপরে যে বিছিয়ে দিয়েছে তা ওর নজরেই পড়েনি।

অভিসার! কতকটা বিস্মিতভাবেই সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়, তোর কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না।

শোন সুব্রত, কিরীটী বলে, আজ রাত্রে তোদের হীরা রহস্যের কিছুটা জবাব দেব। চল, ঘরে চল, অনেক কথা আছে।

অত্যাসন্ন সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে দুজনে জমিদার বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল; হঠাৎ ওদের মনে হয়, কে যেন দ্রুত পদে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে দীঘির পাড়ের নারিকেল ও সুপারী গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল।

সুব্রত চমকে ওঠে, কে?

কেউ না, কিরীটী বলে, চল, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে।

রাত্রি বারটা।

কিরীটী ও রাজু সকালের সেই ঘরে একটা পাটের গাঁটরীর আড়ালে নিঃশব্দে ওৎ পেতে আত্মগোপন করে আছে।

একে পাটের ধুলো বালি নাকের মধ্যে ঢুকে সুড় সুড় করে। তার উপরে আবার দুর্দান্ত মশা। কী তীব্র জ্বালাময়ী সে মশার কামড়! আর ডাকের আওয়াজ বা কি…বোঁ…ও…বোঁ…!

কিরীটী ঘন ঘন রেডিয়াম দেওয়া হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। হঠাৎ খট করে একটা শব্দ হল।

অন্দরমহলের সঙ্গে যোগাযোগকারী ঘরের দ্বিতীয় দরজায় কপাটটা যেন ঈষৎ একটু নড়ে উঠল।

কিরীটী ও রাজু নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে থাকে!

ধীরে ধীরে দরজার কপাট দু'ফাঁক হয়ে গেল। তারপরই একটা সরু তীক্ষ্ন আলোর রেখা ঘরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুকে সোনালী ইশারায় জেগে ওঠে। আর সেই আলোতে ওরা দেখতে পায় আগাগোড়া একটা ভারী চাদরে ঢাকা লম্বা মূর্তি দরজার উপরে দেখা দিল। মূর্তিটা যেন মুহূর্তের জন্য দরজার উপরে দাঁড়াল—কান পেতে যেন কি শোনবার চেষ্টা করে তারপর ধীরে ধীরে দরজার কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার গায়ের কড়াটা ধরে ঈষৎ মোচড় দিতেই মেঝের নীচ থেকে সেই পাথরখানা সরে গেল এবং গর্তের মুখ দেখা গেল। এবার ছায়ামূর্তি সন্তর্পণে সেই গুহা পথে নেমে গেল।

একমিনিট...দু'মিনিট...তিন...চার...কিরীটী ব্যাকুল আগ্রহে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে মিনিট পাঁচেক অতিবাহিত হতেই চট করে উঠে পড়ে এবং রাজুর হাত ধরে টেনে গর্তের মুখের দিকে এগিয়ে যায়।

রাজুকে অনুসরণ করতে বলে কিরীটী আগে সেই সুড়ঙ্গ পথে নেমে গেল।

কিরীটীর পিছু পিছু রাজুও সুড়ঙ্গ পথে নেমে কিরীটীর পাশে দাঁড়াল।

রাজু, ফলো মি, কিরীটী চাপা গলায় বলে।

অতঃপর কিরীটীর পিছনে রাজু অন্ধকারে এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে কিরীটী সন্তর্পণে বোতাম টিপে হাতের টর্চ জ্বালায়। অন্ধকার পথে বারেকের জন্য আলোর ইশারা ঝলকে ওঠে, পরক্ষণেই আবার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এই ভাবে প্রায় পনেরো মিনিট চলবার পর দুজনে এসে যেখানে দাঁড়ায় তার সামনেই একটা বন্ধ কপাট হাতের বৈদ্যুতিক আলোয় দৃষ্টিগোচর হয়।

অতি সন্তর্পণে কপাটের গায়ে হাত দিয়ে একটু চাপ দিতেই কপাট খুলে গেল। এবারে ওরা দুজনে যেখানে এসে দাঁড়ায় সেটি একটি ছোট্ট ঘর। পাশের ঘরে কাদের যেন চাপা কথাবার্তার মৃদু শব্দ পাওয়া যায়।

রাজু চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করে, এ আমরা কোথায় এলাম কিরীটী?

চৌধুরীদের অর্ধপ্রতিষ্ঠিত ভাঙা মন্দিরে। কিরীটী জবাব দিল।

এ্যাঁ সে কি?

হ্যাঁ, আস্তে। বেশী কথা বল না, ওরা জানতে পারলে সব মাটী হয়ে যাবে।

দুজনে দেওয়ালের গা ঘেঁষে ঘেঁষে পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে চলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে।

দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা ঈষৎ ভেজান। দুই কপাটের ফাঁক দিয়ে ওপাশের ঘরের সব কিছুই দেখা যায়। ঘরের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বলছে। সেই মোমবাতির আলোয় ওদের নজরে পড়ে জন তিনেক লোক চাপা স্বরে কি সব কথাবার্তা বলছে।

দরজার এদিকে মুখ করে বসে যে লোকটি...ও কে?

কিরীটী ও রাজু দু'জনেই যে তাকে ভাল করে চেনে।

রাজু যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিরীটীর হাতের একটা চাপে চুপ করে গেল। এই সময় বাইরে কোথায় হুড়মুড় করে কি একটা ভারী বস্তু পতনের

শব্দ পাওয়া গেল।

ঘরের মধ্যে যারা কথা বলছিল ঐ শব্দ শুনে তাদের মধ্যে একজন চট করে তার সামনের মোমবাতিটা ফু' দিয়ে নিভিয়ে দিল এবং পরক্ষণেই অন্ধকার রাত্রির কঠিন নিস্তব্ধতা ছিন্ন ভিন্ন করে পিস্তলের আওয়াজ পাওয়া গেল—গুড়ুম গুড়ুম।

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে ভেজান দরজাটা ঠেলে দিয়ে এক লাফে অন্ধকার ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

॥ চৌদ্দ ॥

(ডাক্তার সাহেব)

কিরীটী অন্ধকার ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে পড়ে যায় এবং ঘরের কঠিন সিমেণ্টের মেঝেতে আঘাত পায়।

কে একজন অন্ধকারেই দু'হাত দিয়ে কিরীটীকে জাপটে ধরে ততক্ষণে। আক্রান্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীও তৎপর হয়ে ওঠে এবং এক ঝটকায় আক্রমণকারীর বাহুবেষ্টনী থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারেই আন্দাজ করে বিদ্যুৎগতিতে তার শক্ত লৌহ মুষ্টির ঘুসী চালায়।

লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না। আততায়ী একটা অর্ধস্ফুট বেদনাকাতর শব্দ করে পড়ে যায় সশব্দে। ঐ সময় একটা আলোর ঝাপটায় ঘরের অন্ধকার দূর হয়। রাজু তার হাতের টর্চ জ্বালিয়েছে।

কিরীটী দেখল সেই আলোয় কে একটা লোক দুহাতে মুখ চেপে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে তখন।

তার দু'হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটি ক্ষীণ রক্তের ধারা দেখা যায়। কিরীটী বুঝতে পারে তার লৌহ মুষ্টির আঘাতে লোকটা ভাল ভাবেই আহত হয়েছে।

লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় এবং পালাবার চেষ্টা করে। কিরীটী কিন্তু তাকে সে সুযোগ না দিয়ে দ্রুত তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং যুযুৎসুর প্যাঁচে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে।

রাজু, লোকটাকে তোমার পকেটের সিল্ক কর্ড দিয়ে বেঁধে ফেল, কিরীটী হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।

রাজুও কালবিলম্ব না করে আদেশ পালন করে। লোকটাও নির্জীবের মত বাঁধন মেনে নেয়। লোকটাকে বেঁধে ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে দুজনে পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করে।

পাশের ঘর শূন্য। সেই ঘরের দরজা ঠেলে দু'জনে মন্দিরের পাষাণ বেদীর পিছনে এসে দাঁড়ায়। মন্দিরও শূন্য! কেউ নেই।

মন্দিরের বাইরে চঞ্চল পদে এসে কিরীটী দাঁড়াল। একটা অস্পষ্ট গোঙানীর মৃদু শব্দ হঠাৎ ওর কানে আসে ঐ সময়।

সুব্রত ! সুব্রত !···কিরীটী ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে।

এই যে আমি, সিঁড়ির নীচে, ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব শোনা গেল সুব্রতর !

কিরীটী আলো ফেলে দেখে রক্তাক্ত অবস্থায় দু'হাতে পা চেপে সুব্রত মন্দিরের সিঁড়ির নীচে বসে ! কিরীটী লাফিয়ে নীচে নামল। কোথায় গুলি লাগল ? ব্যগ্র কণ্ঠে শুধায়।

হাঁটুর নীচে, পায়ের ডিমে বোধ হয়, তবে খুব বেশী লেগেছে বলে মনে হয় না,···সুব্রত যন্ত্রণাকাতর স্বরে জবাব দেয়।

আমি তোকে পই পই করে বারণ করেছিলাম, কিরীটী ঈষৎ বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে বলে, যা দেখবি বিচলিত হবি না ; বিচলিত হলে সব ভেস্তে যাবে।··· আগাগোড়া সব ভেস্তে ত' গেলই, নিজেও জখম হলি !

তুই জানিস না মন্দিরের মধ্যে আমি কাকে দেখেছি, দেখলে তুইও চমকে উঠতিস ! যন্ত্রণাকাতর কাণ্ঠ সুব্রত বলে।

জানি, তোমার ঢের আগেই আমি জানতাম যে আজ রাত্রে এখানে কে আসবে, কিরীটী বিরক্তির সঙ্গে জবাব দেয়।

তুই জানতিস ?

জানতাম বৈকি !

সুব্রত ওঠার চেষ্টা করে কিন্তু উঠতে পারে না।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে তাকে তোলে, নাও, ওঠো।

চমকে উঠে সরতে গিয়ে পড়ে গেলাম। মন্দিরের চত্বরের ওখানটা যে ভাঙা ছিল তা আগে টের পাইনি। সুব্রত বলে।

কোনরকমে সুব্রতকে নিয়ে অতঃপর ওরা দুজনে বাড়িতে ফিরে এল।

সলিলের খোঁজ করে জানল সলিল বাড়ি নেই। অগত্যা দুলালবাবুকে খবর পাঠাল কিরীটী। দুলালবাবু ঘুমাচ্ছিলেন, তিনি খবর পেয়ে উঠে এলেন। কিরীটীর মুখে সব কথা শুনে বললেন, ছিঃ ছিঃ,···এমন করে কখনও নিজের জীবন বিপন্ন করে কেউ ? ভগবান আপনাদের রক্ষা করেছেন। আমাদের মুখ রেখেছেন। কিন্তু এখন ডাক্তার কোথায় পাওয়া যায় বলুন ত' ?

কিরীটী বলে, এই রকম বন্দুকের গুলিতে আহতকে যে এই ভাবে ফেলে রাখা যায় না, সেফটিক হবার সম্ভাবনা !

তাইত !···দুলালবাবু সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েন, এই অজ পাড়গাঁয়ে তেমন ডাক্তারই বা কোথায় ? তার ওপরে এই গভীর রাতে !···এখানে একজন হোমিওপ্যাথ ও একজন কবিরাজ আছে বটে, কিন্তু···

তাদেরই না হয় ডাক কিরীটী ! সুব্রত বলে, একজন দেবে নাকস ভমিকা থারটি···অন্যজন দেবে বিশল্যকরণীর রস মধুর সাথে,···বলতে বলতে নিজের রসিকতায় সুব্রত নিজেই হেসে ওঠে।

এ্যালোপ্যাথিক কোন ডাক্তার নেই ? কিরীটী শুধায়।

দুলালবাবু বললেন, আছেন একজন। বার ছয়েকে ম্যাট্রিক তিন দাঁড়িতে পাশ করে, বার তিনেক আই এস সি তে এ্যাটেম্পট্ নিয়ে মামার জোরে কোন

এক মেডিক্যাল স্কুল থেকে বার কতক সামারসল্ট খেয়ে কোন গতিকে গোঁত্তা মেরে বেরিয়ে এসেছেন।

তা তাকেই না হয় আজ রাত্তিরের মত ডাকুন···যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো!

তখন একজন পেয়াদাকে পাঠিয়ে ডাক্তারকে ডাকান হল।

ঘণ্টা খানেক বাদে ডাক্তার এলেন। উঁচু লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা। ডিপ্লোমা স্কুলের হলে কি হয় চেহারাটা বেশ ভারিক্কি!

ব্যাপার কি? ডাক্তার সাহেব প্রশ্ন করেন।

কিরীটী তখন সংক্ষেপে সব ব্যাপারটা বলে।

গান শট উণ্ড!

হ্যাঁ।

কি আশ্চর্য! এখানে গান শট উণ্ড ঘটল কি করে?

ঘটেছে, এখন তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করুন।

ডাক্তার অতঃপর রোগীর ক্ষতস্থান পরীক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে বললেন, না, এটা তেমন সিরিয়াস নয়। মাসল্ ভেদ করে গুলিটা চলে গেছে। calf muscleটায়ই laceration হয়েছে।

ডাক্তার সাহেব যথারীতি ড্রেস করে দিয়ে ফিস নিয়ে চলে গেলেন।

এদিককার গোলমালে মন্দিরের মধ্যে যে লোকটাকে বেঁধে আসা হয়েছিল তার কথা কিরীটী ও রাজু প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। ডাক্তার সবার আগে একটা মরফিন এ্যাট্রোপিন ইনজেকশন দিয়ে গিয়েছিলেন। সুব্রত চোখ বুজে শয্যার উপরে পড়েছিল, বোধ হয় তন্দ্রা আসছিল।

কথাটা মনে করিয়ে দিল রাজু—সেই লোকটা, কিরীটী, সেই অবস্থাতেই মন্দিরে পড়ে আছে।

থাক গে! কিরীটী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, মশার কামড় খাক পড়ে পড়ে।

দুলালবাবু বললেন, ব্যাটাকে আচ্ছা করে ঘা কতক দিলেন না কেন? আমি এখুনি সেখানে একজন পাইক পাঠাচ্ছি···নিয়ে আসুক বেটাকে, কালই থানায় পাঠাব।

না, থানায় পাঠাবেন না, কিরীটী বলে, লোকটা হয় তো আপনাদের বাড়ির হীরা চুরির সঙ্গে জড়িত আছে। প্রথম থেকেই এ ব্যাপারটা যখন পুলিশের কর্ণগোচর করা হয় নি···তখন আর জানাজানি করে লাভ নেই। হয়তো হাজার রকম প্রশ্ন উঠবে।

বেশ, তা হলে তাই হবে। দুলালবাবু বলেন, প্রথম থেকেই আমার পুলিশকে জানাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দাদা বাধা দিলেন, বললেন, পুলিশ এলে শেষ পর্যন্ত বাড়ির মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করবে। আর গ্রামে ঢি ঢি পড়ে যাবে। জানেন তো, গ্রামের লোক একখানা পেলে নিমেষে সাত খানা করে নেয়; তার ওপর আবার জমিদার বাড়ির ব্যাপার।···কিন্তু সে যাই হোক, আপনাদের অযথা দুর্ভোগ হল মিঃ, রায়, এলেন বন্ধুর বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে,

পড়লেন জড়িয়ে চুরির মামলায়।

তার জন্যে দুঃখ কি বলুন দুলালবাবু, কিরীটী সহাস্যে বলে, আমাদের দেশে তো একটা কথা আছে…ঢেঁকি স্বর্গে গিয়ে ধান ভানে।

তা যা বলেছেন, দুলালবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন, এখন ভগবানের কৃপায় সুব্রতবাবু ভালোয় ভালোয় সেরে উঠুন।…ছিঃ ছিঃ, কি বিশ্রী ব্যাপার একটা ঘটে গেল!

কি করবেন বলুন? ভবিতব্য, কিরীটী বলে।

ভবিতব্যই বটে! দুলালবাবু দুঃখিত স্বরে জবাব দিলেন।

কাছারীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি তিনটা ঘোষণা করল।

দুলালবাবু উঠে পাইক পাঠাবার জন্য বহির্বাটিতে গেলেন।

শেষ রাত্রে পাইক এসে জানাল যে মন্দির খালি, সেখানে কেউই নেই।

॥ পনের ॥

(অদৃশ্য আততায়ী)

পরের দিন ঘুম ভাঙতে কিরীটী দেখল সুব্রতর জ্বর হয়েছে। সে চিন্তিত হয়ে উঠল। এখানে আর এক মুহূর্ত দেরী করা উচিত নয়। রাত্রের স্টীমার যেমন করেই হোক ধরতেই হবে।

দুলালবাবু দুইমাস ডিস্ট্রিকট বোর্ডের চাকরি ফেরতা ডাক্তার সাহেবকে আর একবার ডাকবার জন্য বললে, কিরীটী বলল, না দুলালবাবু, থাক। আমার ডাক্তারী সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই কিন্তু তবুও আমার মনে হচ্ছে শুধু muscle য়ের laceration-ই নয় হাড়ও ফ্র্যাকচার হয়েছে; কমপাউন্ড ফ্র্যাকচার বোধ হয়।

যাহা হোক ঠিক হল, বেলা এগারটার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলে লঞ্চে রওনা হবে।

দুলালবাবুও ওই সঙ্গেই কলকাতায় যাবেন। রওনা হবার আগে কিরীটীই সুব্রতর ক্ষতস্থানটা dress করে দিল, কেন যেন স্কুলের ডিপ্লোমাধারী হস্তীমূর্খ ডাক্তার সাহেবটিকে তার আর ডাকতে সাহস হল না।

শীতের প্রখর রৌদ্রতাপে চারিদিক উদ্ভাসিত।

নদীর গৈরিক জলরাশি ভেদ করে রাজবাড়ীর লঞ্চ চলছে ঝর্…ঝর্…র!

সুব্রত কেবিনে শুয়ে আছে। কিরীটী, দুলালবাবু ও রাজু বাইরে তিনজনে তিনটি চেয়ারে বসে গল্প করছিল।

দুলালবাবু বললেন একসময়, হীরাটা সম্পর্কে কোন কিছুই কিনারা করতে পারলেন না, মিঃ রায়?

না,…তবে চোর যে হীরাটাকে হজম করতে পারবে না এটা ঠিক, কিরীটী বলে।

হাঃ হাঃ করে দুলালবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন, এ আপনার বেশ যুক্তি কিন্তু মিঃ রায়, কিন্তু লোকটা জাঁহাবাজ বটে! চমৎকার বুদ্ধির খেলা দেখিয়েছে, কী বলেন?

তা আর বলতে! কিরীটী বলে, একশ' বার।

দেখুন এক সময় আমারও খুব ডিটেক্‌টিভ্‌ বই পড়ে এই কাজে নামবার ঝোঁক চেপেছিল মনে।

তারপর? কিরীটী শুধায়।

ধোপে টিঁকল না। বলতে বলতে দুলালবাবু হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন আবার, তবে এ ব্যাপারে আমার সাহায্যের যদি এতটুকুও আপনার প্রয়োজন হয় তবে অনুগ্রহ করে জানাবেন—সানন্দে এবং আগ্রহের সাথে হাতে হাত মিলাতে আমি রাজী আছি জানবেন।

বেশত কিরীটী অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয়।

ডাউন ঢাকা মেল ঊর্ধ্বশ্বাসে গর্জাতে গর্জাতে তার গন্তব্য পথে একটা দৈত্যের মত যেন ছুটে চলছিল।

শীতের অন্ধকার রাত্রি।

ট্রেনের লৌহচক্রের ঘট···র···ঘটং···শব্দ বিশ্রী একঘেয়ে।

ভারী কম্বলে আপাদমস্তক ঢেকে একটা সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরার চারটা বার্থে চারজন অঘোরে নিদ্রাভিভূত, কিরীটী, দুলালবাবু, রাজু ও সুব্রত! কামরার আলো নিভানো।

* * একটা স্টেশনে মেল এসে দাঁড়াল, দু'জন লোক নিঃশব্দে ছায়ার মতই ওদের কামরায় প্রবেশ করল দরজা খুলে।

দুলাল যে বার্থে ঘুমিয়েছিল, লোক দুইজন সেই দিকে এগিয়ে গেল।

একজনের হাতে একটা তীক্ষ্নধার ছোরা।

একটা চীৎকারে কিরীটী ধড়মড় করে জেগে উঠে বসে হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে আলো জ্বালাতেই দুলালবাবুর দিকে নজর পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী একটা অস্ফুট চীৎকার করে ওঠে।

কী সর্বনাশ!

দুলালবাবুর হাতের সামনের দিকে একটা ক্ষত···দরদর ধারে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছে।

এ কী ব্যাপার দুলালবাবু? এত রক্ত কেন?

কারা যেন অন্ধকারে আমার গলা টিপে ধরতে এসেছিল···বাধা দিতে গেলে ছোরা মেরেছে।

তাড়াতাড়ি কিরীটী সুটকেশ থেকে সুব্রতর জন্য যে তুলা ও ঔষধপত্র ছিল তাই দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। কিরীটী ব্যাণ্ডেজ করতে করতে বলে খুব বেঁচে গেছেন···ক্ষতটা তেমন গভীর হয়নি। সামান্যর উপর দিয়েই গেছে।

সুব্রত ও রাজু ততক্ষণে জেগে উঠল। সে-রাত্রে আর কারও ঘুম হল না।

এই অদৃশ্য আততায়ীর বিষয় আলোচনা করতে করতেই রাত্রি প্রভাত হলো।

শিয়ালদহ স্টেশনে গাড়ি এসে পৌঁছাবার পর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুলালবাবু জিনিসপত্র নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন, কিরীটীরাও আর একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসে।

॥ ষোল ॥

(সেফ্‌টি উণ্ড)

কলকাতায় পৌঁছেই কিরীটীর সর্বপ্রথম কাজ হল ফোনে ডাঃ দত্তকে ডাকা।

ডাঃ দত্ত কলকাতার তখন একজন নাম-করা সার্জেন। ফোনে সংবাদ পেয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই ডাঃ দত্ত এসে পড়লেন।

ডাঃ দত্ত চমৎকার রসিক লোক। বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা। মাথার চুলগুলি শ্বেত-শুভ্র। কাঁচা সোনার মত গায়ের রং। সাদা জিনের সুট পরিধানে। মাথায় সাদা টুপি। হাঁটেন মিলিটারী কায়দায়।

কি হে রহস্যভেদী! ডাঃ দত্ত গাড়ি থেকে নামতে নামতে প্রশ্ন করলেন, এত জরুরী তলব কেন?

চলুন, উপরে একজন পেসেণ্ট আছে, কিরীটী জবাব দেয়।

কিরীটী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আনুপূর্বিক সব কথাই খুলে বলে।

রোগীর ক্ষতস্থান বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে ডাঃ দত্ত বললেন, না—না, ভয়ের তেমন বিশেষ কারণ দেখছি না। তবে fibulaটা fracture হয়েছে। ওটা ঠিক করে দিতে হবে। হাসপাতাল যাচ্ছি; ফিরতি পথে ডাঃ মুখার্জীকে নিয়ে আসব'খন; দু'জনে মিলে হাড়ের টুকরোগুলো বের করে ক্ষতটা ড্রেস করে প্লাস্টার করে দিতে হবে।

কে? কিরীটী প্রশ্ন করে।

কেন, Dr. Mookerjee নাম শোন নি? এবারে M S হয়েছেন, ডাঃ দত্ত জবাব দিলেন।

ও হ্যাঁ! হ্যাঁ! মনে পড়েছে, কিরীটী বলে।

•

বেলা সাড়ে নটা নাগাদ দুলালবাবু এদের খবর নিতে এলেন।

কিরীটী তখন স্নান করে একটা পায়জামা পরে গায়ে একটা গরম গেঞ্জি চাপিয়ে বসবার ঘরে একটা সোফার উপরে গা এলিয়ে সেদিনকার দৈনিকটা দেখছিল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। পাশেই শায়িত সুব্রতকে বলে কিরীটী, তোমার দুলালবাবু আসছেন।

নমস্কার!

কিরীটী কাগজ থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিল, নমস্কার!···বসুন, দুলালবাবু!···

দুলালবাবু একটা খালি কাউচ অধিকার করতে করতে মৃদুহাস্যে বললেন, কী করে জানলেন যে আমি ?

আপনাদের দুই ভাইয়েরই চলবার কায়দাটা অনেকটা এক ধরণের ! কিরীটী বলে, পরিচিত পায়ের শব্দে মনে করেছিলাম হয় আপনি না হয় সলিল। আপাততঃ সলিলের আসবার সম্ভাবনা নেই বল্লেই চলে। আর আপনি আমাদের সঙ্গে এসেছেন।

চমৎকার theory of deduction, হাসতে হাসতে জবাব দিলেন দুলাল-বাবু, রাজেন বাবু কই ? তাঁকে দেখছি না যে ?

আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাসা থেকে মাকে আনতে গেছে, জবাব দিল সুব্রত, এখুনি এসে পড়বে'খন।

আপনার হাতের ক্ষতস্থান কেমন আছে দুলালবাবু ? কিরীটী প্রশ্ন করল।

ও তেমন কিছু নয়, সামান্যই আঘাত লেগেছে, জবাব দিলেন দুলালবাবু।

না না, একেবারে উড়িয়ে দেবেন না ; কিরীটী বলে ওঠে, সামান্য ব্যাপারকেও অবজ্ঞাভরে দেখতে নেই ! বিপদ যে কখন কোন পথ দিয়ে ঘনিয়ে আসে তা কি কেউ বলতে পারে ? কথায় বলে, 'সাবধানের মার নেই।' তা আপনি যখন এসে গেছেন তখন বসুন না ! এখুনি ডাঃ দত্ত আসবেন, তাঁকে দিয়ে আপনার হাতের উন্ডটাও পরীক্ষা করিয়ে দেবো'খন।

না না, ওসব হাঙ্গামায় কী প্রয়োজন ? দুলালবাবু ব্যগ্রভাবে বলে ওঠেন।

এতে আর হাঙ্গামাটা কোথায় ? কিরীটী বলে, তা'ছাড়া আমাদের হিন্দুশাস্ত্রমতে আপনি আজ আমাদের একজন বন্ধু। শাস্ত্রে আছে দশ পা এক সঙ্গে গেলে বন্ধুত্ব হয়—দশ পা এক সঙ্গে যাওয়া ছেড়ে দীর্ঘ ১৫ দিন আপনার সঙ্গে এক বাড়িতে কাটিয়ে এলাম।

দুলালবাবু মৃদু হাসতে লাগলেন। কাল সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাসায় যাবেন মিঃ রায় ? দুলালবাবু বললেন, আমার একজন ইটালীয় বন্ধু আসবেন, ভদ্রলোক একজন মস্তবড় চিত্র-শিল্পী রেখা-চিত্রে তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। লোকটি আবার 'ভায়োলিন'ও বাজান চমৎকার, আলাপ করিয়ে দেবো।

নিশ্চয়ই যাবো, কিরীটী বলে।

জংলী চায়ের ট্রেতে চা নিয়ে এলো এবং প্লেটে খাবার।

এক কাপ চা ও জলখাবারের প্লেটটি দুলালবাবুর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে কিরীটী বলে, আসুন দুলালবাবু !···

এত বেলায় এসব করতে গেলেন কেন মিঃ রায় ! কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললেন দুলালবাবু।

এমন সময় নীচে গাড়ির হর্ণ শোনা গেল। কিরীটী সচকিত হয়ে ওঠে, ঐ ডাঃ দত্ত এলেন। একটু অপেক্ষা করুন দুলালবাবু, ডাঃ দত্তকে উপরে নিয়ে আসি।

কিরীটী নীচে চলে গেল।

অল্পক্ষণ বাদেই কিরীটী ডাঃ দত্ত ও ডাঃ মুখাজীর্কে সঙ্গে করে ঘরে এসে

ঢুকল। পিছনে পিছনে জংলী একটা তোয়ালে জড়ান 'বোল' নিয়ে এল। 'বোল'টার মধ্যে ছুরি, কাঁচি, ফরসেপস, প্লাস্টার ইত্যাদি স্টেরিলাইজ করে আনা হয়েছিল। একটা ছোট্ট টি-পয়ের ওপর সেগুলি রেখে ডাঃ দত্ত প্রস্তুত হলেন।

সুব্রতর পায়ে প্লাস্টার করে দিয়ে ডাঃ দত্ত ও ডাঃ মুখার্জী নীচের বসবার ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

কিরীটী দুলালবাবুকে দেখিয়ে বলে, ডাঃ দত্ত, এ্যানাদার পেশেণ্ট ফর ইউ। ইনি আমার এক বন্ধুর ছোট ভাই, দুলাল চৌধুরী। এঁরা কাঞ্চনপুরের জমিদার।

ডাঃ দত্ত হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

দুলালবাবুও প্রতি নমস্কার করলেন। তারপর হাতের ব্যাণ্ডেজটা খুলে ডাঃ দত্তকে দেখালেন।

বাঁ হাতের কনুই এর ঠিক উপরেই সামনের দিকে একটা ক্ষত চিহ্ন। ক্ষতটা খুব গভীর নয়।

কিরীটী গত রাত্রের ট্রেনের সমস্ত ব্যাপার খুলে বলে।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করতে করতে ডাঃ দত্ত একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আড়চোখে কিরীটীর দিকে তাকালেন। কিরীটীর চোখের দৃষ্টিতেও যেন একটা চাপা উত্তেজনার অস্পষ্ট ভাষা ভাষা ইঙ্গিত।

কেমন দেখছেন ডাঃ দত্ত? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না, ভয়ের তেমন কোন কারণ দেখছি না আপাততঃ।

দেখলেন মিঃ রায়, আমি তখনি আপনাকে বলেছিলাম, দুলালবাবু হাসতে হাসতে বলেন।

ঐ সময় রাজু এসে ঘরে প্রবেশ করে।

মা এসেছেন রাজু? কিরীটী শুধায়।

হ্যাঁ, রাজু বলে।

বিকেলের দিকে বহুকাল পরে আবার ওদের পুরোন দিনের মত আড্ডার আসর জমে উঠেছে। রাজু, সুব্রত ও কিরীটী। তিনজনে মার হাতের তৈরী গরম গরম ফুলকপির সিঙাড়া ও গরম চা সহযোগে নানা খোসগল্প করছে।

সহসা এক সময় সুব্রত বলে, এবারে মা কিরীটীর হার হয়েছে।

তার মানে? কিরীটী সকৌতুক দৃষ্টি তুলে সুব্রতর দিকে তাকাল।

তার মানে হীরার হারটা তুমি এবারে উদ্ধার করতে পারলে না, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলে।

কিরীটী একটু হেসে টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে ধরাতে ধরাতে বলল, কাল সন্ধ্যার দিকে তোমাদের জানিয়ে দেব যে কে চোর। কাল বুঝবে তখন যে কেমন করে সামান্য ক্ষতেও পচন ধরে এবং তা ধরলে আর রক্ষা থাকে না।

।। সতের ।।

(টিউব তত্ত্ব)

সকালবেলা কিরীটী সবে ঘুম থেকে উঠে হাতে মুখে জল দিয়ে খবরের কাগজটি খুলে ধরেছে এমন সময় টেলিফোনের বেল বেজে উঠল, ক্রিং…ক্রিং… ক্রিং।

হ্যালো ! কিরীটী ফোন ধরে।

মিঃ রায় ?

ইয়েস, রায় স্পিকিং, বলুন।

আমি দুলাল চৌধুরী।

এত সকালে ! কি ব্যাপার ?

কাইণ্ডলি একবার এদিকে আসতে পারবেন এখুনি ?

এত জরুরী তলব ?

হ্যাঁ, দয়া করে শীগগির একবার আসুন।

দুলালবাবুর ফোন পাবার পর কিরীটী আর এক মুহূর্ত দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় আসা মাত্রই একটা ট্যাক্সি দেখতে পায়। হাতের ইশারায় ডেকে কিরীটী তাতে উঠে বসে।

কিধার জায়গা, সাব ?

শ্যামবাজার, কিরীটী বলে ! দুলালবাবুদের বাড়ি শ্যামবাজারের দিকে।

গতিশীল ট্যাক্সির সিটে বসে বাইরের পিছিয়ে পড়া মানুষ, যানবাহন, অট্টালিকা প্রভৃতির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কিরীটী একটা সিগারেট ধরায়।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে আসতেই সহসা কিরীটীর নজর পড়ে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের বড় গেটটার দিকে। চমকে ওঠে সে, নরেন চৌধুরী একটা কুলির মাথায় একরাশ কি মালপত্র চাপিয়ে চলেছেন। নরেন চৌধুরীও তাহলে কলকাতায় এসেছেন।

বলরাম ঘোষ স্ট্রীটে প্রকাণ্ড ফটকওয়ালা বাড়ি চৌধুরীদের। জমিদারের আভিজাত্যে সমস্ত-বাড়িটা যেন ঝকমক করছে। গেটে ভোজপুরী দারোয়ান সেলাম জানায় কিরীটীকে।

কিরীটী সোজা কমপাউণ্ড অতিক্রম করে বাইরের অফিস ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। একজন কর্মচারীকে নাম বলতেই তিনি কিরীটীকে বসতে বলে একজন ভৃত্যকে ডেকে উপরে দুলালবাবুকে সংবাদ পাঠালেন।

অল্পক্ষণ বাদেই ভৃত্য এসে জানাল যে বাবু তাঁকে উপরে ডাকছেন।

কিরীটী সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভৃত্যের পিছু পিছু দোতলায় একটি ঘরে ঢুকল।

আধুনিক কেতায় সুচারুরূপে ঘরখানি সাজান। মেঝেয় দামী পুরু কার্পেট। দেওয়ালের গায়ে এদেশ ও ওদেশের যত বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি—ঠাকুরসিং, রবি বর্মা, অবনীন্দ্রনাথ, হেমেন মজুমদার, হতে সুরু করে করে ওদের দেশের র‍্যাফেল, বতিচেল্লি, উপকাশা প্রভৃতি কেউই বাদ যায় নি।

ঘরের দু'পাশে দু'খানি কাউচ্‌ ! ঘরের জানালার গায়ে সব জাফ্‌রানী রংয়ের সূক্ষ্ম লেসের পর্দা ! ঘরের তিন কোনে জয়পুরী টবে পামট্রি বসান ! বুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথের দু'খানি স্ট্যাচু।

একটা কাউচে কিরীটীকে বসতে বলে ঘরের পর্দা সরিয়ে ভৃত্য ভিতরে চলে গেল।

কিরীটী মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখতে থাকে।

নমস্কার।

কিরীটী চোখ তুলে দেখে পরণে একটা ঢিলে পায়জামা, গায়ের উপরে একটা ভারি টার্কিস্‌ তোয়ালে জড়ান—সামনে দাঁড়িয়ে দুলালবাবু ! দু'খানি সুগঠিত অনাবৃত বাহু, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

কিরীটী মুগ্ধ দৃষ্টিতে দুলালবাবুর অনাবৃত বাহু দুটি বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগল—চমৎকার ! সত্যিই অপূর্ব !

দুলালবাবু হাসলেন, কি ?

আপনার দেহসৌষ্ঠব ! কিরীটী বলে, আপনি বোধ হয় ব্যায়াম করছিলেন !

হ্যাঁ। ছোটবেলার বদ অভ্যাসটা এখনও ছাড়তে পারিনি। বারবেলটা সকালে অন্ততঃ বার দুই না ভাঁজলে শরীরটা কেমন যেন অবসাদগ্রস্ত ম্যাজ ম্যাজ করছে বলে মনে হয়। আপনি একটু বসুন, আমি জামাটা গায়ে দিয়ে আসি।

দুলালবাবু ভিতরে গিয়ে একটু পরেই একটা ঢিলা হাতা সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে আসলেন।

তারপর কী সংবাদ ? জরুরী তলব কেন ? কিরীটী প্রশ্ন করল।

কাল রাত্রে আমার স্টুডিও রুমে ও শোবার ঘরে চোর এসেছিল।

চোর এসেছিল ! কিরীটী বিস্মিত ভাবে দুলালবাবুর মুখের দিকে তাকায়।

কিছু চুরি করেনি তো ?

না—অন্তত এখনও তেমন কিছু টের পাইনি।

তবে চোর মহাপ্রভুর আগমনের কারণ কী ?

আমারও ত' সেই প্রশ্ন।

চলুন তা আপনার স্টুডিও ঘরটা একবার ঘুরে আসি।

আসুন।

দুলালবাবুর শয়ন কক্ষের একেবারে সংলগ্ন ওঁর স্টুডিও।

কিরীটী দুলালবাবুর পিছু পিছু ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

স্বল্প পরিসর একখানি ঘর। দেওয়ালে আকাশ-নীল রং। জানালাগুলিতে কাঁচ কলাপাতা রংয়ের মারসিডাইজড্‌ সিল্কের কারুকার্যখচিত পর্দা।

ঘরের ঠিক মধ্যখানে রবীন্দ্রনাথের আলখাল্লা পরা পূর্ণাঙ্গ শ্বেত মর্মরের মূর্তি, মাথায় কালো বেদুঈন টুপি। পায়ের নীচে জাপানী কাচের ভাসে ডালসমেত একথোকা হাসনুহানা। তারই পাশে ধূপাধার হতে প্রজ্বলিত সুগন্ধী চন্দন ধূপের গন্ধ ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়ায় আলগোছা ভাবে !

সম্মুখেই লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির বিখ্যাত মোনালিসার ছবিখানি। দেওয়ালের

অপর দিকে ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবের একখানি পেন্সিল স্কেচ্‌ ও তারই পাশে টমাস গেনস্‌বোর বিখ্যাত ছবি 'ব্লু বয়' ও র‍্যাফেলের যীশু মাতা—কোলে শিশু যীশু।

ঘরের মেঝেতে ইজেলের গায়ে হেলান দেওয়া স্ক্রীনে ঢাকা বোধ হয় অর্ধ সমাপ্ত একখানি ছবি! তারই পাশে টিপয়ের উপরে রাখা রংয়ের সাজ সরঞ্জাম ও তুলির গোছা। পাশেই আর একটা ছোট টুলের উপরে কাচের 'বোলে' জল রাখা।

কিরীটী মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

দুলালবাবুর রুচি আছে বটে! স্মিতভাবে কিরীটী দুলালবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, শিল্পীর কল্পনা এখানে যেন শতদলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, চমৎকার—সত্যি! আপনি কাজে মনে ও কল্পনায় সত্যিকারের একজন শিল্পী!

দুলালবাবু প্রত্যুত্তরে একটু মৃদু হাসলেন মাত্র।

হ্যাঁ, আপনি যে বলছিলেন আপনার স্টুডিওতে চোর এসেছিল! সহসা কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, ওই যে দেখছেন দেওয়ালের আলমারীটা!

দুলালবাবু আঙ্গুল তুলে ঘরের মধ্যে একটা দেওয়াল আলমারী দেখিয়ে বলেন, ওই আলমারীটার মধ্যে সাধারণতঃ আমার ছবি আঁকার সাজ সরঞ্জাম থাকে। কাল রাত্রে একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়·· প্রথমটা ভাবলাম ওটা কিছু না। কিন্তু খুট্‌ খুট্‌ খুট্‌ শব্দটা ক্রমেই যেন বেড়ে উঠ্‌তে লাগল। মনে সন্দেহ হওয়ায় বিছানা হতে উঠে এই ঘরে আসতে যাবো এমন সময় দেখি, স্টুডিও ঘরের দিক হতে আমার শোবার ঘরে যাতায়াতের মধ্যখানের দরজাটা বন্ধ। প্রথমটা আশ্চর্য হলাম। ব্যাপার কী? তারপর দরজার কড়াটা ধরে দু'চার বার টানাটানি করা সত্ত্বেও দরজাটা যখন খুলল না তখন এই ঘরে ঢুকবার অন্য যে দরজাটা আছে সেটা দিয়ে ঘুরে তাড়াতাড়ি এই ঘরে এসে ঢুক্‌লাম। ঘরটা অন্ধকার। সুইচ্‌ টিপে আলোটা জ্বাললাম, আলো জ্বালতে দেখি ঐ আলমারীটা খোলা, আর ভিতরের জিনিসপত্র সব এলোমেলো।···

কিছু চুরি যায়নি, আপনি ঠিক জানেন? কিরীটী প্রশ্ন করল।

যতদূর মনে হয় যায় নি। দুলালবাবু বললেন।

কিরীটী তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেওয়ালের আলমারীটার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

আচ্ছা, আলমারীটা কি চাবি দেওয়া ছিল?

না। সাধারণত ওটা খোলাই থাকে। এমন কোন মূল্যমান জিনিসপত্র ত ওর মধ্যে থাকে না।

কিরীটী দেওয়াল আলমারীটার দিকে এগিয়ে গেল।

আলমারীর কপাট দুটো বন্ধই ছিল। কপাটের গায়ে গ্রাউন্ড গ্লাস বসান।

হ্যাণ্ডেলটা ধরে একটু টান দিতেই কপাট দুটো খুলে গেল। কেবল আলমারীটার মধ্যে আঁকবার সাজ-সরঞ্জামে ভর্তি।

কিরীটী সজাগ দৃষ্টি মেলে আলমারীর অভ্যন্তরস্থিত জিনিসগুলি দেখতে লাগল। সহসা একসময় আলমারীর তৃতীয় তাকে কতকগুলি মোটা মোটা রংয়ের

টিউবের দিকে নজর পড়তেই কিরীটী সেই দিকে দুলালবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল, ওগুলি কী ?

ওগুলো শাদা রংয়ের টিউব। ও টিউবগুলো সাধারণত এখানে পাওয়া যায় না! ডিরেক্ট অর্ডার দিয়ে ইটালী থেকে আনিয়েছি।

খুব মোটা মোটা ত'! কিরীটী অন্যমনস্ক ভাবে কথাটা বলে যেন কতকটা আত্মগত ভাবে।

হ্যাঁ, ওতে রং একটু বেশী থাকে···সাধারণত পেণ্টিং-এর জন্য ওই টিউবগুলো ব্যবহার করি। রংটাও খুব সাচচা। অনেকদিন La-ting করে। সহসা কিরীটী টিউবগুলিতে কি একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

।। আঠার ।।

(শিকারী টিকটিকি)

কিরীটীর দৃষ্টি যেটা আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা টিউবের গায়েই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। কে যেন অন্যমনস্ক ভাবে সূঁচ বা আলপিন জাতীয় জিনিস দিয়ে টিউবগুলো অযথা ছিদ্র করে নষ্ট করেছে।

দুলালবাবুর দিকে ফিরে তাকিয়ে কিরীটী প্রশ্ন করে, টিউবগুলোর দাম কি রকম ?

সাধারণ দেশী রংয়ের টিউব থেকে প্রায় চার পাঁচ গুণ বেশীই হবে,— দুলালবাবু জবাব দিলেন।

চোর আপনার ঐ রংয়ের টিউবগুলো চুরি করতে আসেনি তো ? কিরীটী হাসতে হাসতে দুলালবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

দুলালবাবু হেসে ফেলেন, বলেন, চোর যদি শিল্পী হত তবে আপনার এ গোয়েন্দাগিরি নির্ঘাত লক্ষ্য ভেদ করত।

চোর যে একজন শিল্পী নয় তাই বা আপনি জানলেন কেমন করে বলুন ? আমার তো মনে হয় চোর একজন উঁচুদরের শিল্পী।

সহসা দুলালবাবু যেন একটু চমকে ওঠেন, পরক্ষণেই প্রশ্ন করেন, কেন, আপনি কাউকে চোর বলে অনুমান করছেন নাকি ?

না মশাই, এমনি কথার পিঠে কথা বলে ঠাট্টা করছিলাম, কিরীটী হাসতে হাসতে জবাব দেয়, সহসা হাসি থামিয়ে কিরীটী বলে, আপনার কাকা নরেনবাবু কবে কলকাতায় এলেন ?

দুলালবাবু হঠাৎ যেন একটু চমকে ওঠেন এবং বিস্মিত কণ্ঠে শুধান, কে ?

আপনার কাকা, নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

কাকা! ইম্‌পসিবল! কাকা তো কাঞ্চনপুরে, তিনি কেমন করে আসবেন ? কিন্তু কেন বলুন তো ? একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?

না এমনি! কিরীটী অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল।

এমন সময় ভৃত্য এসে ঘরে প্রবেশ করে, বাবু !

কি ? দুলালবাবু ফিরে তাকালেন তার দিকে।

জামাইবাবু এসেছেন।

কিরীটী দুলালবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কে ?

তন্দ্রার স্বামী সৌরীন, দুলালবাবু উত্তরে বলেন।

তারপর ভৃত্যের দিকে ফিরে বললেন, সৌরীনকে এখানে নিয়ে আয়।

ভৃত্য চলে গেল।

সৌরীনের কাছে আমি আর দাদা যেন মরমে মরে আছি মিঃ রায়। দুলাল-বাবু কুণ্ঠিত স্বরে বলেন, আমি দাদাকে বলেছি, হীরাটার দাম যা হয় সেই পরিমাণ টাকা সৌরীনকে দিতে, দাদাও রাজী হয়েছেন। তা ছাড়া হীরাটা ফিরে পাওয়ার যখন আর কোন সম্ভাবনাই নেই···শেষের দিকে দুলালবাবুর কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

কিরীটী চুপ করে থাকে।···কিছুক্ষণ বাদে দুলালবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা দুলালবাবু, আপনার এই ছবি আঁকবার ব্যাপারে বেশ খরচ হয়, না ?

তা হয় বৈকি !···বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন বিলাস-ব্যসন থাকে। কেউ ঘোড়দৌড় খেলে টাকা ওড়ায়, কেউ মদ খেয়ে টাকা নষ্ট করে। আমি শিল্প কলায় টাকা নষ্ট করি ! জানেন মিঃ রায়, ছবি আঁকাটা আমার কাছে মদ খাওয়ার চাইতেও প্রবল। আমি যে কত টাকা এর পিছনে ঢালছি তার লেখা জোখা নেই। এই আঁকবার ব্যাপারে আমি অনেক কিছুই অক্লেশে করতে পারি। এবং তার জন্য এতটুকু গ্লানি আমার মনে স্পর্শ করে না। মনের এই বিলাস মেটাতে আমাকে কতদিন কত অপ্রিয় ঘটনার সম্মুখীন যে হতে হয়েছে—তবু আমি পশ্চাৎপদ হইনি।

ঐ সময় সৌরীনবাবু এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। দুলালবাবু অভ্যর্থনা জানালেন, এস সৌরীন, কেমন আছ ?···তন্দ্রা ভাল আছে তো ?

সৌরীনবাবু নীচু হয়ে দুলালবাবুর পায়ের ধুলো নেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে কিরীটী শিকারী টিকটিকির মত নিঃশব্দে ক্ষিপ্রগতিতে বাঁ হাত চালিয়ে সকলের অলক্ষ্যে দুলালবাবুর আলমারী থেকে একটা জিনিস তুলে পকেটস্থ করে।

সৌরীনবাবু বলেন, হ্যাঁ, ভালই আছে। আপনাদের সব ভাল তো ?

এই একরকম। দুলালবাবু জবাব দিলেন···চল, পাশের ঘরে গিয়ে বসা যাক। আসুন মিঃ রায় !

এক্সকিউজ মি, আমাকে এখুনি একবার বাগবাজার যেতে হবে—জরুরী একটা কাজ আছে, কাল সন্ধ্যায় আসব আবার।···কিরীটী বলে···তারপর সৌরীনবাবুর দিকে চেয়ে বলে, আপনি আসবেন কাল সৌরীনবাবু ? আজ আপনার সঙ্গে ভাল কথাবার্তা হলো না, কাল হবে'খন। কাল সন্ধ্যায় দুলাল-বাবুর একজন ইটালীয়ান শিল্পী-বন্ধু আসবেন তিনি নাকি চমৎকার বেহালা

বাজাতে পারেন!

হ্যাঁ হ্যাঁ সৌরীন, তুমিও কাল এস। তন্দ্রাকে সঙ্গে এনো, কেমন?…কাল সন্ধ্যায় ফ্রি তো?

বেশ তো আসব, সন্ধ্যায় হাতে তেমন কোন কাজ কোন দিনই থাকে না—সৌরীনবাবু জবাব দিলেন।

আচ্ছা, আজ তা হলে আসি, নমস্কার!

কিরীটী হাত তুলে দুজনকে নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বলরাম ঘোষ স্ট্রীট থেকে বের হয়ে সোজা শ্যামবাজার পোস্ট অফিসে এসে কিরীটী হাজির হয়,—একটা টেলিগ্রামের ফর্ম দিন স্যার! টেলিগ্রামের একটা ফর্ম নিয়ে কিরীটী কাকে যেন একটা টেলিগ্রাম করে দেয়।

পোস্ট অফিসের বাইরে যখন এসে দাঁড়াল তখন বেলা প্রায় বারটা। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপে কলকাতা মহানগরী যেন ঝলসে যাচ্ছে। এসপ্ল্যানেড গামী একটা ট্রামে উঠে পড়ে কিরীটী।

।। উনিশ ।।

(চায়ের আসর)

কিরীটী যখন বাড়ি এসে পেঁছাল বেলা তখন দেড়টা বেজে গেছে।

সুব্রত শয্যায় শুয়ে কি একটা ইংরাজী পেনী নভেল একমনে পড়ছিল। কিরীটীর পায়ের শব্দে মুখের ওপর থেকে বইখানা নামিয়ে শুধায়, এত বেলা পর্যন্ত কোথায় ছিলি?

গড়ের মাঠে বেশ কচি কচি ঘাস গজিয়েছে তাই চিবোচ্ছিলাম, হাসতে হাসতে জবাব দেয় কিরীটী। তারপর মুখ ফিরিয়ে ডাকে, জংলী!

যাই বাবু! জংলী সাড়া দিল।

গায়ের জামাটা খুলে কিরীটী হাত দুটো ভেঙ্গে বুকের ওপরে ভাঁজ করে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে ইতস্তত পরিক্রমণ করতে থাকে।

সুব্রত বুঝতে পারে কিরীটীর মাথায় কোন একটা নতুন চিন্তা পাক খেয়ে ফিরতে শুরু করেছে। এসময় কথা বললে তার চিন্তাসূত্রের খেই হারিয়ে যাবে। সুব্রত সেই জন্যই কিরীটীকে আর বিরক্ত না করে আবার বইয়ের পাতায় মন দিল।

জংলী এসে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। বাবু আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ, আমার কাপড় জামা সব বাথরুমে দিয়ে আয়।

স্নান শেষ করে ও নাকে-মুখে চারটি কোন মতে গুঁজে কিরীটী একটা সিগারেটের টিন নিয়ে তার ল্যাবোরেটরী ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিল।

বিকালের পড়ন্ত রোদে প্রকৃতি ক্রমে নিঝুম হয়ে আসে। পথের বাঁকে কৃষ্ণচূড়া গাছটার সবুজ চিকণ পাতায় বিলীয়মান সূর্যরশ্মি শেষ ছোঁয়া দিয়ে যায় যেন।

সুব্রত যে ঘরে শুয়েছিল সেই ঘরের একটা টেবিলে জংলী চায়ের সাজ-সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখছে।

পাশের ঘরে ইলেকট্রিক স্টোভে মা গরম গরম ফুলকপির সিঙ্গাড়া ভাজছেন… তার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

সুব্রত একটা বালিশে হেলান দিয়ে অদূরে সোফায় উপবিষ্ট রাজুর সঙ্গে কথা বলছে।

একটা কাচের পাত্রে কতকগুলি গরম গরম সিঙ্গাড়া হাতে মা ঘরে প্রবেশ করলেন। কই! তোরা এখনও খেতে আরম্ভ করিস নি?

কিরীটী যে এখনও আসেনি মা!

জবাব দিল সুব্রত। তাইত আমরাও লোভনীয় গরম গরম সিঙ্গাড়া ও ধূমায়িত সোনালী চায়ের অখণ্ড রূপে ধ্যানস্থ হয়ে আছি।

বৎস প্রসন্ন তোমার তপে
এবে বর মাগি লহ।

হাসতে হাসতে কথাগুলি বলতে বলতে কিরীটী ঘরে প্রবেশ করল।

প্রভু একান্তই যদি
হয়েছো প্রীত দীন ভক্তদের প্রতি
তবে এসো পাশে বসি
করি সবে একত্রে সিঙ্গাড়া ভক্ষণ—ঃ

সুব্রত জবাব দেয় হাসতে হাসতে।

মাও হাসতে হাসতে সিঙ্গাড়ার ডিসটা টিপয়ের উপরে নামিয়ে রেখে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

রাজু বলে, তারপর, সন্ধান কিছু মিলল? কালই তোমার হীরা চোরের মীমাংসা করবার দিন। ভোল নি ত'?

কিরীটী একটা সিঙ্গাড়ায় কামড় দিয়ে চিবোতে চিবোতে বলে, না।

তাহলে ধরতে পেরেছিস ব্যাপারটা, সুব্রত বলে।

হ্যা, মনে হচ্ছে—কিরীটী মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়।

সত্যি? একত্রে রাজু ও সুব্রত সোৎসাহে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। কোথাও এতটুকু জোড়াতালি পর্যন্ত নেই। আগা-গোড়া ব্যাপারটা আলোর মতই পরিষ্কার। কিরীটী আবার বলে।

চোর কে? সুব্রত প্রশ্ন করে।

বুঝলে হে সুব্রত চন্দ্র, চেষ্টা করলেই যেমন একটা রহস্য গল্পকে দাঁড় করান যায় না; তেমনি সত্যিকারের অনুসন্ধানী দৃষ্টি না থাকলে রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। সত্যিকারের দৃষ্টি যদি তোমাদের থাকত, আজ, তাহলে তোমরা আমাকে 'চোর কে' এই প্রশ্ন করে উত্তরের আশায় আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে না। চুরির ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে যতটুকু জেনেছি ও সন্ধান পেয়েছি তাতেই চোর আমাদের কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। তবে এটাও ঠিক যে সেই সব ঘটনাকে একত্রে সূত্রবন্ধ করলেই সম্পূর্ণভাবে চোরকে চোর

বলে ধরা মুশকিল।

তারপর একটু থেমে নিঃশেষিত চায়ের কাপটা পাশের টি'পয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে কিরীটী বলতে থাকে, Self confidence, থাকাটা একটা প্রকাণ্ড গুণ, যে কোন মানুষের পক্ষেই কিন্তু সেই 'আত্মবিশ্বাস' শেষ পর্যন্ত যদি 'আত্মম্ভরিতায়' পরিণত হয় তখন হয় বিপদ, আমাদের হীরা চোরও এক্ষেত্রে বলতে পার ঐ শেষোক্ত কারণের জন্যই নিজেকে আমার চোখের সামনে ধরা দিতে বাধ্য হয়েছেন। তবুও তার প্রশংসা আমি না করে থাকতে পারছি না, এই জন্য যে দু'জোড়া লোভী দৃষ্টির সামনে হতে অনায়াসেই অতি চমৎকার উপায়ে তিনি হাত সাফাই করেছেন। এবং আজ আমি যদি এই ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়াই তবে হয়ত তাকে ধরা খুব সহজ হবে না। কিন্তু আমি চোরকে ক্ষমা করতে পারছি না। তাছাড়া আমি নিজের চোখে একটিবার দেখতে চাই চোরের অসাধারণ আত্মম্ভরিতার গায়ে আঘাত হানলে সে কেমন করে অসহায় হয়ে যায়।

বাইরে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ম্লান অস্পষ্টভাবে পৃথিবীকে যেন জড়িয়ে ধরছে ক্রমশঃ।

কিরীটীর রহস্যময় গম্ভীর কণ্ঠস্বর সন্ধ্যার ম্লান আলো-আঁধারীতে যেন কেমন রহস্যপূর্ণ হয়ে উঠে!

পরের দিনের কথা। রাত্রি দশটা হবে। রাজু ও কিরীটী দুলালবাবুর ওখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। দুলালবাবুর ইটালীয়ান বন্ধু ও তন্দ্রার স্বামী সৌরীনও এসেছে।

জলযোগের পর দুলালবাবুর শয়ন কক্ষের ঠিক সামনেই ব্যালকনীতে একটি চৌকো টেবিলের চারিপাশে কয়েকটি সোফা পেতে সকলে বসেছে।

আকাশে চাঁদ নেই। শুধু হীরার কুচির মত লক্ষ কোটি তারকা কালো আকাশটাকে যেন আরো মৌন ও আরো স্তব্ধ করে তুলেছে। শুধু দুলালবাবুর ইটালীয়ান বন্ধুটি তার ভায়োলিনটা কাঁধের পরে চেপে ছড়টা দিয়ে মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে দু' একটা টান দিয়ে টুকরো টুকরো সুরগুঞ্জন তুলছিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ভদ্রলোক বাজিয়েছেন। অদ্ভুত মিষ্টি হাত ভদ্রলোকের।

হঠাৎ এক সময় দুলালবাবুর ইটালীয়ান বন্ধুটি কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, মিঃ রায়, মিঃ চৌধুরীর মুখে শুনেছি আপনি একজন নামকরা রহস্যভেদী, আপনার জীবনের একটা ঘটনা শোনা যাক!

দুলালবাবুও কথার পিঠে যোগ দিলেন, idea, বলুন মিঃ রায় আপনার জীবনের একটা ঘটনাই শোনা যাক। আপনারা I mean ডিটেকটিভরা বলেন, দোষী নাকি always spotয়ে অর্থাৎ অকুস্থানে এমন একটা না একটা চিহ্ন রেখে যায় যাতে করে ধরা আপনা হতেই দিতে হয়। কথাটা কতদূর সত্যি জানিনা অবিশ্যি তবে!

কিরীটী মৃদু একটু হেসে বলে, তবে শুনুন আমার জীবনেরই একটা ঘটনা,

গল্প নয় সত্য কাহিনী বলবো।

এমন সময় সলিল এসে ঘরে প্রবেশ করল।

হ্যালো সলিল! তুমি এ সময়?...

দুলালবাবুও বলে ওঠেন, আশ্চর্যান্বিতভাবে, দাদা তুমি? কখন কলকাতায় এলে!

সকালে ঢাকা মেলে। রাণাঘাটে একটা কাজে যেতে হয়েছিল, কাজ শেষ হয়ে গেল, বিকেলের ট্রেনে এখানে চলে এলাম। তারপর কিরীটীর খবর কী?

এইত ভাই, তোমার ভাই নিমন্ত্রণ করেছেন, তাই আর কী, কিরীটী বলে।

দুলালবাবু তার দাদার সঙ্গে ইটালীয়ান বন্ধুটির আলাপ করিয়ে দিলেন!

তারপর কিসের আড্ডা চলেছে? সলিল প্রশ্ন করে।

গল্পের—কিরীটী বলে।

গল্পের—

বোস সলিল, একটা গল্প শোনাব—

বল, শুনি। সলিল বলে।

কিরীটী বলতে আরম্ভ করে।

রাত্রি স্তব্ধ। স্তব্ধ রাতের মৌন কালো আকাশের তারায় তারায় মৃদু একটা আলোর ঈশারা। স্তব্ধ রাতের বাতাসে কোথা থেকে হাসনুহানার মৃদু সৌরভ ভেসে আসে।

টেবিলের উপরে রক্ষিত আকাশ-নীল রংয়ের ডোমের আড়াল হতে বৈদ্যুতিক টেবিল ল্যাম্পের মৃদু নীলাভ আলো চারপাশে উপবিষ্ট সকলের মুখে ও গায়ের কিয়দংশে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিরীটী একটা সিগারেট ধরায়। জ্বলন্ত দিয়াশলাই কাঠির প্রদীপ্ত অগ্নি-আভা ক্ষণেকের তরে কিরীটীর মুখের প্রতি ছোঁয়া দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল।

কিরীটী তার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে সুরু করে।

কার্তিকের শেষে একটা চিঠি পেলাম। চিঠি লিখছেন, আমার এক ছেলে-বেলাকার বন্ধু।

এমন সময় দুলালবাবু সহসা কিরীটীকে বাধা দিয়ে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন মিঃ রায়, আমি আসছি।

দুলালবাবু সোফা হতে ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা সাধারণ সুদৃশ্য প্লাই-উডের চৌকো বাক্স হাতে ফিরে এলেন, মিঃ নিকলানি, আমি হয়ত যাবার সময় ভুলে যেতে পারি তাই আগে হতেই মনে করে টেবিলের উপরে এটা রেখে দিলাম, নিতে ভুলো না যেন।

নো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড! নিকলানি হাসলেন।

সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল, সেটায় পুনরায় অগ্নিসংযোগ করতে করতে কিরীটী বলে, হ্যাঁ, তারপর শুনুন। আমার বন্ধুর চিঠিতে তার বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণের আহ্বান ছিল। গেলাম সেখানে। কিন্তু বিয়ের রাত্রে একটা

দুর্ঘটনা ঘটে গেল বন্ধুর বাড়ীতে। বন্ধুর বোনের গলা থেকে বহুমূল্য একটা হীরা বসান সোনার হার চুরি গেল।

দুলালবাবু বলে উঠলেন, এ যেন আমাদের বাড়ির গল্প!

হ্যাঁ, don't disturb me!

কিরীটী বলে, শুনুন চুপ করে। হীরা ত' চুরি গেল। ব্যাপার একটু জটিল। সতর্ক প্রহরী থাকা সত্ত্বেও হীরাটা চুরি গেল। আপনারা সকলেই জ্যামিতি পড়েছেন, ট্র্যাংগেল কাকে বলে জানেন—a space bounded by three straight lines, 'a', 'b', 'c', আবার ধরুন triangle-য়ের মধ্যস্থলে হীরাটা বসান হলো। এবং triangle-য়ের তিন কোণে তিনজনে ওৎ পেতে আছেন হীরাটার লোভে।

মনে করুন সেই তিন জনের নাম যথাক্রমে 'a', 'b', 'c'। তিন জনের তিন কারণে লোভ হীরাটার উপরে। অথচ মজা এই যে আসলে এঁরা কেউই হীরাটার ন্যায্য অধিকারী নন। ফলে হলো triangle-য়ের তিন কোণ থেকে 'a' 'b' 'c' তিন জনে এসে triangle-য়ে centreয়ে ঠোকাঠুকি খেলেন।

চারিদিক স্তব্ধ! স্তব্ধ রাতের আঁধার। রহস্যময় কিরীটীর কণ্ঠস্বর। রহস্যময় কালো রাতের দূরে আকাশের তারাগুলি।

কিরীটী আবার সুরু করে, 'a' একটু বোকাটে ধরণের—'b' হচ্ছেন গোঁয়ার গোবিন্দ, ভাবলেন গায়ের জোরেই কাজ হাঁসিল করবেন। আর আমাদের 'c' হলেন এদের মধ্যে সব চাইতে বুদ্ধিমান। ফলে এই হলো, 'a' আর 'b' যখন হীরার আশায় মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করতে ব্যস্ত, 'c' 'বেমালুম হীরাটা নিয়ে সরে পড়লেন। কিন্তু কথা হচ্ছে এইখানেই ঃ বলছিলাম না অপরাধী চিরদিনই অকুস্থানে তার পাপের নিদর্শন রেখে যায়! এখানেও অপরাধী 'c' রেখে গেল তার পাপের নিদর্শন, তার এক নং—এইটি ঃ বলতে বলতে কিরীটী খানিকটা সবুজ সুতার গুচ্ছ পকেট থেকে বের করে টেবিলের উপরে রাখল। ২নং এইটি—একটা ভাঙ্গা চায়ের কাপের অংশ জামার পকেট হতে বের করে আবার টেবিলের উপরে রাখল, এবং তিন নং এই ঃ—একখানি হাতে লেখা চিঠি—জামার পকেট থেকে বের করে টেবিলের উপরে রাখল।

শ্রোতার দল স্তব্ধ নির্বাক।

কিরীটীর কণ্ঠস্বরে একটা যেন যাদু। কিরীটী আবার বলতে সুরু করে।

॥ কুড়ি ॥

(ট্র্যাংগেল রহস্য)

হ্যাঁ, অপরাধী যদি অকুস্থানে তার কৃতকর্মের নিদর্শন বা পরিচিতি না রেখে যেত তবে দুনিয়াটা হয়ে উঠতো একটা মহাপাপের রঙ্গশালা, ন্যায় অন্যায়ের সীমারেখা থাকত না কিছু। প্রস্তরযুগের সেই বন্য বর্বরতা দৈহিক ক্ষুধা ও কামনাকে মেটাতে আপনাদের মধ্যেই চিরদিনের রক্ত-হোলী খেলত

প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে। কিন্তু মানুষের উপার্জিত জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকরশ্মি গুহাবাসীদের সে পশু বর্বরতার আজ অবসান ঘটিয়েছে। আসলে অবসান ঘটেছে মাত্র প্রকাশ্য দৃষ্টিরাজ্যে তার কারণ মানুষের যে অকুতোভয়তা দুর্নিবারতা আজ ইট কাঠ বিজ্ঞান ও পুস্তকের ভাবার চাকচিক্যময় আবরণের মাঝে লুকোতে পটু হয়ে উঠেছে। যাকগে, যে কথা বলছিলাম সেই কথাই বলি।

সিগারেটে একটা মৃদু টান দিয়ে কিরীটী আবার সুরু করে, আবার আমি আসব সেই রহস্যময় রাত্রির কথায়। সেই দিন বিবাহের আগে সন্ধ্যায়…বন্ধুর বৃহৎ বাটীর পিছন দিককার উদ্যানে একটু ঘুরতে গেছি, হঠাৎ আচমকা একটা চাপা কণ্ঠস্বরে সাবধান বাণী কানে এসে আমার বাজল, 'চুপ…'; 'ন' বাবু যেন ঘুণাক্ষরেও না টের পায়। গোয়ালন্দে সোজা গিয়ে ট্রেন ধরবার জন্য আদেশ। এই 'ন' বাবুই হচ্ছেন আমাদের ট্র্যাংগেলের বর্ণিত 'b', আর বক্তা হলেন ট্র্যাংগেলে বর্ণিত 'c' ব্যক্তি। কথাগুলো শুনবার সঙ্গে সঙ্গে আমি চকিত হয়ে উঠলাম। বুঝলাম একটা হীরাখণ্ডকে কেন্দ্র করে কুৎসিত প্রকাণ্ড একটা লোভের জাল ছড়িয়ে পড়েছে। 'c'র চাপা কণ্ঠস্বরও আমার শ্রবণশক্তিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। কেন না পরদিন সকালে চায়ের আসরে তার সে কণ্ঠস্বর আমার কানের মাঝে যথেষ্ট পরিচয়ের সুর নিয়ে বেজে উঠে আমায় এক প্রকার নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিল। এদিকে একটা মজা হয়েছিল, হীরাটা যখন চুরি যায় তখন আমাদের নতুন জামাইবাবু চায়ের সঙ্গে তাকে সলুবারবিউটন নামক ঘুমের ওষুধ দেওয়া সত্ত্বেও আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগরণের মধ্যেই ছিলেন।

'a' 'b' বা 'c' কেউই নিজ হাতে হীরাটা সরাতে চান নি, বোধ হয় তাদের সহজ রুচিবিকারের দোহাই পেড়ে বা নিজেদের বাঁচাতে। এবং ঐ রুচিবিকার যদি না ঘটত এবং শেষপর্যন্ত 'c' যদি নিজে হাতে হীরাটা সরাবার চেষ্টা করতেন তবে এই ব্যাপারটার সেখানেই ঘটত সমাধি।

যা হোক, 'a' 'b' বা 'c' তিন জনই লোক ঠিক করেছিলেন হীরাটাকে সরাবার জন্য। আর সব চাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে 'c' 'b'কে সন্দেহ করলেও 'a' 'b' বা 'c'কে এতটুকুও সন্দেহ করে নি, আর 'b'ও 'a' বা 'c' কে করে নি এতটুকু সন্দেহ। সেই জন্যই অকুস্থানে গিয়ে 'b' ও 'a'র লোকেদের মাথায় মাথায় হলো ঠোকাঠুকি এবং সেই সময় 'c' দূর হতে তাদের সেই ঠোকাঠুকি লক্ষ্য করে প্রাণভরে একচোট হেসে নিল।

অবিশ্যি একটা কথা—যা বলছি সবই mere facts বা ঘটনাগুলোকে পর পর ক্রমিক নম্বরানুযায়ী সাজিয়ে deductionয়ের দ্বারা চুরির ব্যাপারটার একটা possible explanation দাঁড় করিয়েছি—এর মধ্যে সেইজন্য ভুলচুকও থাকতে পারে এবং সেটা থাকাই সম্ভব। যাক এখন যা বলছিলাম—'a'র লোক যখন চুরি করতে এলো এবং সেই চুরি করবার আগে মেয়ে জামাই ঘুমন্ত কি না দেখতে এলো, সেই সময় সতর্ক প্রহরী 'c'-র চোখে পড়ে গেল। অথচ তার ঢের আগেই 'c'-র নিযুক্ত লোক দ্বারা জামাইকে চায়ের সঙ্গে বারবিউটন দেওয়া হয়ে গেছে এবং সেই বারবিউটন-এর কাজ আরম্ভ হয়েছে কি না দেখবার জন্যই 'c'

আসছিল, ঠিক সেই সময়ই একবার উঁকি দিয়ে যেতে।

'c' কিন্তু তখন 'a'র লোককে এতটুকুও সন্দেহ করে নি, কেন না তার সন্দেহটা যে আগাগোড়াই 'b'কে কেন্দ্র করে মনের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

'a'ও সেই সময় দোতলার আশেপাশেই কোথাও ওৎ পেতে ছিল, তার নিযুক্ত লোক কী করলে না করলে জানবার জন্য।

এতগুলো ব্যাপার যে ঘটেছে বাড়ীর মাধ্যই সে ব্যাপারগুলো smoothly ঘটতে পেরেছিল এই জন্যই যে, 'a' 'b' 'c' ও তাদের নিযুক্ত চরেরা সকলেই ঐ বাড়ীর লোক। সন্দেহের কথা উঠা বা গোলমাল হওয়ার তাই এতটুকু অবকাশ ছিল না।

আমাদের জামাইটি যে শুধু একটু অতিরিক্ত চা-বিলাসীই ছিলেন তা নয়, দিনে রাতে ৫।৬কাপ কফিরও তিনি ধ্বংস করতেন, বোধ হয় 'c' যে বারবিউটন তাকে চায়ের সাথে দিয়েছিলেন সেটা জামাইয়ের চোখে গাঢ় ঘুম আনবার পরিবর্তে এনেছিল সামান্য একটু ঢুলু ঢুলু ভাব। এইখানেই 'c'র অনুচর জামাইয়ের হাতে পড়ে ঘা কতক উত্তম-মধ্যম পিঠ পেতে নিয়ে গেল। বোধ হয় 'c'র অনুচর যখন হীরাটা চুরি করে নিয়ে পালায় এবং মাঝপথে জামাইয়ের সঙ্গে যখন কাড়াকাড়ি চলেছে, তখন 'b'র অনুচর এসে হীরাটা ছিনিয়ে নিয়ে পালায়।

তারপর এক পোড়োবাড়ীতে উপস্থিত হয়ে টাকার বিনিময়ে হীরাটা যখন 'b' ও তার অনুচরদের মধ্যে বিনিময় হচ্চে, হঠাৎ চিলের মত ছোঁ মেরে 'c' স্বয়ং হীরাটা তুলে নিল এবং তুলে নেবার আগেই বোধ করি তার সতর্ক দৃষ্টির সামনে আমি পড়ে যাই। সেই জন্যই বোধ হয় তার নির্দেশমত তার অনুচরের হাতে আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

জ্ঞান যখন ফিরে এল, ছদ্মবেশী স্বয়ং 'c' আমার হাত ধরে রাত্রে বাড়ী পেঁছে দিয়ে গেল। কিন্তু পেঁছে দিয়ে চলে যাবার সময় আমার হাতের মুঠোয় সে অলক্ষ্যেই একটু চিহ্ন রেখে গেল।

বলতে বলতে কিরীটী টেবিলে রক্ষিত সবুজ সুতার গুচ্ছ হতে খানিকটা তুলে দেখাল, সেই সবুজ সুতার গুচ্ছর কয়েক গাছি সেই রাত্রে আমার হাতে ছিল এবং বেশীটা চুরি যাবার পর দিন সকালে বাসর ঘর ও আমার বন্ধুর কাকার শোবার ঘরের মধ্যবর্তী দরজার গায়ে আটকে থাকতে দেখে সঙ্গে নিয়ে আসি এবং পরে ঐ সুতার আসল স্থান 'c'র ঘরেই উদ্ধার করেছিলাম এবং মিলিয়ে দেখেছিলাম সেই আসল স্থানের সুতা এবং দুই দিন দুই জায়গায় পাওয়া সুতার মধ্যে অপূর্ব একটা মিল রয়েছে। এবং সেইদিন অর্থাৎ চুরি যাবার দুইদিন পরেই আসল হীরা চোর সম্পূর্ণ ভাবে আমার চোখে ধরা দিল।

'b' অকুস্থান হতে গা ঢাকা দিয়ে যে চাল চালতে গেছিলেন তাতে তার সফলতা তো আনলই না বরং অকুস্থানে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকার দরুণ হীরাটা হস্তগত না করতে পেরে লোকসানই হলো ষোল আনা, যার ফলে 'b' একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মরণ পণে নতুন করে আবার কার্যক্ষেত্রে এসে নামল।

এবং 'a' ও 'b'র প্রকৃত সংঘর্ষ সুরু হলো এইখানেই, কেন না তখন হতেই practically 'a' ও 'b' পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করতে সুরু করলো। অথচ আসল যে চোর বা দোষী সে দিব্যি তখন হীরাটা হাতিয়ে পরম আরামে দূরে বসে 'a' ও 'b'র মাথা ঠোকাঠুকি দেখে প্রাণ ভরে হাসতে লাগল।

হীরাটার উপরে ন্যায্য পাওনা 'a' 'b' বা 'c'র কারও নেই আগেই বলেছি। আছে যার অন্তরম্ভা লাভ করে মুখ চূণ করে সে সরে গেল। এদিকে 'c' যখন বুঝতে পারলে তার অনুচরকে আমি ধরে ফেলেছি ও সন্দেহ করে তার উপরে চোখ রেখেছি, সে রাতারাতিই অনুচরটিকে সেখান হতে সরিয়ে ফেলবার মতলব করলে। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে ত' পারলেই না, বরং আরো দুটো কারণে তার উপরে আমার যে সন্দেহ জন্মেছিল তাকেই আসল হীরাচোর বলে সেটা আরো বিশ্বাস হলো।

প্রথম তার আসল কণ্ঠস্বর ও আসল ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত হলো, দ্বিতীয়ত সেই রাত্রে তার ও আমার মাঝে যে সংঘর্ষ হলো…এবং আমাকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে উৎকট দানবীয় উল্লাস ও স্বভাবজাত অহমিকায় একখানা চিঠি রেখে গেল তার সম্যক পরিচয় দিয়ে আমার টেবিলের উপরে।

চিঠিটা হতে তার পরিচয় আমি পেয়েছিলাম তিনটি কারণে—১নং সে যে একজন আর্টিস্ট তার প্রমাণ সে দিয়েছে চিঠিটা সরু তুলি দিয়ে পাতলা লাল রংয়ের সাহায্যে লিখেছে। ২নং আঁকার সময় bowlয়ে তুলি ডুবিয়ে তুলি হাত দিয়ে মুছবার সময় কোনক্রমে চিঠির কাগজটার গায়ে একটু দাগ লেগে গেছিল। ৩নং অন্যের গায়ে সন্দেহটাকে ফেলবার জন্য অত্যন্ত ছেলেমানুষী করে এবং তাকে যে আমি আদপেই সন্দেহ করতে পারিনি এই অবিশ্বাস্য আনন্দে অন্যের letter pad হতে কাগজ ব্যবহার করে।

Wonderful! চমৎকার!

সহসা একটা উল্লসিত চীৎকার ও প্রশংসাধ্বনিতে নিস্তব্ধ মৌনী শ্রোতৃমণ্ডলী ও বক্তা সকলে চমকে মুখ তুলল।

বক্তা দুলাল চৌধুরী!

দুলালবাবু বললেন ঃ আমি হার মানছি মিঃ রায়! সত্যই আপনার অদ্ভুত বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি! I congratulate you!

উপস্থিত সব কয়টি প্রাণীই বিস্মিত ও স্তব্ধ!…

Yes, I admit, আমি স্বীকার করছি যে হীরা আমিই চুরি করেছি।

এ অপেক্ষা সেখানে বজ্রপাত হলেও বোধ করি কেউ এতখানি চমকে উঠত না।

সলিল চীৎকার করে বলে উঠে, দুলাল তুই! তুই! বাকী কথাগুলো তার গলার মাঝেই আটকে গেল।

দুলাল বলে, হ্যাঁ দাদা আমি!…আমিই হীরাটা চুরি করেচি আর আমিই মিঃ রায়ের বর্ণিত ব্যক্তি 'C', কিন্তু একথা ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারত না যদি মিঃ রায় এর মধ্যে না এসে জড়িয়ে পড়তেন, আর আমার নিজের

আত্মবিশ্বাস যদি না আত্মম্ভরিতায় পরিণত হতো। কিন্তু হীরা আমি ফেরত দোবো না—good night।

কথাগুলি বলে দুলাল ঘর থেকে ধীর পদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সলিল চীৎকার করে ওঠে, শোন! শোন! হীরাটা?…

কিরীটী সলিলকে বাধা দিল ও আসবে না সলিল। ওকে যেতে দাও!… হীরা ও সঙ্গে নিয়ে যায় নি। হীরাটা রেখেই গেছে!

হীরাটা রেখে গেছে? সলিল সবিস্ময়ে কিরীটীর দিকে তাকায়, কী বলছো তুমি কিরীটী?

বলছি আমি ঠিক কথাই। কিরীটী বলে, হীরা সে নিয়ে যায়নি।

তারপর হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে কিরীটী, রাত্রি সাড়ে এগারটা। আমিও এবার বিদায় নেবো ওঠ রাজু!…কিন্তু যাবার আগে একটা কথা তোমায় বলে যাওয়া দরকার। সাপ নিয়ে খেলা করার দুঃসাহস থাকতে পারে কিন্তু বাহাদুরী নেই এতটুকুও। এই নাও তোমার সেই চিঠি—সে রাত্রে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে এসে যে চিঠিটা দিয়ে তুমি আমার উপরে চাল চালতে গিয়েছিলে। তোমার এটুকু অন্ততঃ বোঝা উচিত ছিল যে আমি ঘাস খাই না। তোমাদের মতই ভাত খাই, বাঁ হাত দিয়ে চিঠিটা লিখেছো বটে কিন্তু হাত পাকাতে পারোনি। আর হীরার উপরে এত লোভই যখন তোমার ছিল তখন আমায় এই ব্যাপারে না জড়ালেই বুদ্ধিমানের কাজ করতে! কিন্তু 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'। বলতে বলতে সেই লাল কালি দিয়ে লেখা চিঠিখানি সলিলের গায়ের উপর ফেলে দিল।

সলিল হতভম্বের মত কিরীটীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

কিরীটী বলে, এস রাজু! এবারে যাওয়া যাক্!…হ্যাঁ ভাল কথা সলিল, টেবিলের উপরে ঐ বাক্সটা, যেটা কিছুক্ষণ আগে দুলালবাবু মিঃ নিকলানিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছিলেন ওটার মধ্যেই তোমার হীরাটা খোঁজ করলেই পাবে।

আচ্ছা শুভ রাত্রি!…চল হে রাজু!…

কিরীটী রাজুর হাত ধরে একপ্রকার টানতে টানতে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল।

॥ একুশ ॥

(শেষ কথা)

বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের মোড়ে একটা খালি ট্যাক্সিকে হাত ইশারায় ডেকে কিরীটী ও রাজু চেপে বসল, টালিগঞ্জ! চালাও।

প্রায় জনহীন রাজপথ ধরে ছুটে চলে ট্যাক্সি। গাড়ীর গদিতে গা-ঢেলে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে কিরীটী ধোঁয়া ছাড়তে সুরু করে।

আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত দুলালবাবু! এতেক্ষণে রাজু প্রথম কথা বলল।

সেদিন কামিনী গাছের ডাল ভেঙ্গে সলিলবাবুকে পড়ে যেতে দেখে তার উপরেই আমার সন্দেহ হয়েছিল !···তারপর সেদিন রাত্রে সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে কাকাবাবু নরেন চৌধুরীকে দেখে ও কালী-মন্দিরে তাকে দেখে তার উপরেও খানিকটা সন্দেহ জন্মেছিল কিন্তু এ যে অভাবনীয় !

অভাবনীয় কিছুই নয় ঃ কিরীটী বলে, তোমাদের হিসাবে একটু গরমিল হয়েছে। না হলে অপরাধীকে ধরতে তোমাদের কষ্ট কারোরই হতো না। সলিল, নরেন চৌধুরী ও দুলাল তিন জনেরই লোভ সেই দিনই ছিল হীরাটার উপরে।

সলিল অর্থাৎ আমাদের ট্র্যাংগেলের 'a' ভেবেছিল সম্প্রদানের পর যদি হীরাটা হাতায়, তবে সব দিকই রক্ষা পায়। রথ দেখাও হয়, কলা বেচাও হয়। আবার কালীভক্ত নরেন চৌধুরীর, আমাদের ট্র্যাংগেলের 'b' মনে একটা বাসনা ছিল যে তন্ত্র সিদ্ধ হবার। কিন্তু তার জন্যেও টাকার দরকার। অথচ উইল অনুযায়ী খোরপোষ ভিন্ন অন্য কিছু পাবার তাঁর উপায় ছিল না স্টেট হতে।

হীরা চুরি যাবার পরদিন সকালে চায়ের আসরেই তাঁর কথাবার্তার ভিতর দিয়ে সে আঁচ আমি পেয়েছিলাম।

আর 'c' বা শ্রীমান দুলালের ইচ্ছা ছিল যে ফাঁকতালে হীরাটা চুরি করে সেটা বেচে তার অর্থে বিদেশে গিয়ে চিত্র-বিদ্যাটা একটু ভাল করে শিখে আসা। তাইত' অধিক সন্ন্যাসীতে হলো গাজন নষ্ট !

হীরা চুরি যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বাড়ী দেখে স্থির নিশ্চিত হয়েছিলাম—হীরাটা বাইরের লোক কেউ এসে চুরি করেনি, করতে পারে না, করেছে বাড়ীরই একজন কেউ।

কিন্তু কে সে ?

প্রথমেই সন্দেহ হলো নরেন চৌধুরীকে—কিন্তু সে অনুপস্থিত থাকায় সন্দেহ গিয়ে পড়লো তার নিযুক্ত লোকজনের উপরে, না হয় সলিলের উপরে। কিন্তু সলিলের উপরে সন্দেহ আমার গেল হীরা চুরির পর সলিলের একান্ত হতাশ ভাব দেখে। হীরাটা পেলে সে কখনোই অতটা হতাশ হতো না। কিন্তু তার হীরার উপরে যে লোভ ছিল সেটা তার হতাশার পরিমাণ দেখেই আঁচ করেছিলাম। হীরাটা চুরি যাওয়ায় তার জামাইয়ের কাছে লজ্জা হতে পারে। কিন্তু অতটা হতাশ হবার কারণ কী?···এবং সলিল যে এ ব্যাপারে জড়িত আছে, আরো আমার সন্দেহ হয় এই জন্য যে সে বলেছিল—সে নীচে যখন শোবার বন্দোবস্ত করছে তখন গোলমাল শুনে নাকি সে উপরে যায়। কিন্তু বাড়িটা এমনভাবে তৈরী যে নীচের কোন লোকই উপরের কোন কিছু শুনতে পারে না। আমরা সে কথা নরেন চৌধুরীর কাছেই জানি। তখনই বুঝলাম সলিল এ ব্যাপারে জড়িত থাকলেও হীরাটা হাতে পায় নি।

তবে কে পেল ?···

নরেন চৌধুরী বাড়ীতে ছিলেন না···আর হীরাটা চুরি যাওয়ার অল্পক্ষণ আগে সিঁড়িতে দুলালের সঙ্গে বক্কেশ্বরের দেখা হয়েছিল। বক্কেশ্বর সলিলের লোক এবং সে সলিলের পরামর্শ মতই হীরাটা চুরির সুযোগ খুঁজছিল। সে

যদি হীরাটা সরাতে পারত তবে সেটা সলিলের হাতে নিশ্চয়ই পেঁছাত। তা যখন পেঁছায়নি তখন নিশ্চয়ই দুলাল-এর মধ্যে আছে। তারপর মনে হলো চোর যখন দিব্যি চোখে ধুলো দিয়ে সরে গেল তখন এমন রাস্তা নিশ্চয়ই আছে যা অত্যন্ত গোপন…এবং অনেকেই জানে না।

ভাল করে খোঁজ করতে গিয়ে চোরাপথও ধরা গেল। হীরাটা চুরি করেছিল, সর্বপ্রথম নরেন চৌধুরীরই লোক, কিন্তু মাঝপথে বেঁটে বক্কেশ্বর ও সলিল সেটা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে মার খেয়ে ফিরে এল। নরেন চৌধুরী গুদাম ঘরে অপেক্ষা করছিল। চোর চুরি করেই সেটা নরেন চৌধুরীর হাতে দেয়নি, কারণ তার বিনিময়ে টাকা তাকে দিতে হবে। দুলাল ওৎ পেতে ছিল ভাঙ্গা বাড়ীতে, বিনিময়ের সময় সেটা সে ছিনিয়ে নিয়ে সরে গেল। ফলে নরেনের সন্দেহ পড়ল সলিলের উপর। আবার সলিলের সন্দেহ পড়ল নরেন চৌধুরীর উপরে—ফলে আসল চোর দুলাল সন্দেহের বাইরে রয়ে গেল। সলিল টের পেয়েছিল যে আমি চোরকে সন্দেহ করেছি, কিন্তু পাছে তাকে সন্দেহ করি তাই ভেঙ্গে আমাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারছিল না, তার হয়েছিল সাপের ছুঁচো গেলার মত—গিলতেও পারে না, উগরাতেও পারে না।

তারপর যখন দেখলে আর উপায় নেই তখন হীরাটা যাতে অন্য কেউ না পায় তার বন্দোবস্তের জন্যই আমায় বারবার অমন করে হীরাটা উদ্ধারের জন্য চাপ দিতে লাগল।

সন্দেহ ত' করলাম দুলাল হীরা নিয়েছে, কিন্তু চিন্তা হলো কোথায় সে সেটা রাখলে। কলকাতায় আসার পথে দুলাল আর এক চাল চাললে, ছুরি দিয়ে নিজের হাতে ক্ষত করে ব্যাপারটা অন্য দিকে মোড় ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু আমার চোখে ও ডাঃ দত্তর চোখে ধুলো দিতে পারলে না। Wound দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সেটা আপনা হতে করা (Self inflicted wound), কারুর দ্বারা হয় নি।…আরো এক চাল চাললে দু'দিন আগে সাজান এক চুরির ব্যাপার দাঁড় করিয়ে কিন্তু সেই চুরির ব্যাপার দেখতে এসেই হীরাটার সন্ধান পেলাম। ওর আলমারীতে যে-সব রংয়ের টিউব সাজান ছিল হঠাৎ কয়েকটার গায়ে দেখলাম সব ফুটো ফুটো! কে যেন পিন দিয়ে ফুটো করেছে। অলক্ষ্যে একটা সেই রংয়ের টিউব সরিয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম।

দুপুরবেলা ল্যাবোরেটারী ঘরে চিন্তা করতে করতে বিদ্যুৎ চমকাবার মতই একটা চিন্তা আমার মনে উদয় হলো…হার থেকে হীরাটা খুলে নিয়ে ঐ রংয়ের টিউবের মধ্যে হীরাটা লুকিয়ে রাখা যায় কি না। ভেবে দেখলাম যে খুবই সহজ সেটা এবং চমৎকার উপায়ও একটা।

সমস্ত জুয়েলারী দোকানে দোকানে পুলিশের সাহায্যে কাঞ্চনপুর হতেই জানিয়ে রেখেছিলাম ঐ হীরাটার একটা বর্ণনা দিয়ে যে, ঐ ধরনের হীরা কেউ বেচতে আসলেই বামাল সমেত তাকে যেন ধরা হয়।

দুলালের তীক্ষ্নবুদ্ধি আগেই বলেছি, তাই সে ঐ পথে না পা বাড়িয়ে এক

অভিনব উপায়ে হীরাটা বেচবার চেষ্টা বের করলে। তাই ইটালীয়ান বন্ধুর সাহায্যে হীরাটাকে একেবারে বিদেশ চালান করে বিক্রী করতে উদ্যত হলো। তার পরের ব্যাপার ত তোমরা সবই জান !···

বুদ্ধি ছিল দুলালের প্রচুর, কিন্তু অহমিকা ওর পতন ঘটাল। কিরীটী আর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করল।

গাড়ী তখন রসা রোড ধরে ছুটে চলেছে। মাথার উপরে রাতের আকাশ মৌন গম্ভীর !···

পরের দিন ঘুম ভাঙ্গতেই কিরীটী ফোনে সংবাদ পেল যে দুলালবাবু সুইসাইড করেছে।

কিরীটী স্তব্ধ হয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

নিশীথ রাতের তীরন্দাজ

——দুষ্টু ভোম্বলকে——

—বাবা—

১লা বৈশাখ, ১৩৫১
কলিকাতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

(মোহরের ঝাঁপিতে কাটা হাত)

চুপ ! চুপ !

খুব ভাল করে কান পেতে শোন ! দেখছো না ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে আসছে। বাদুড়ের ডানার মত কালো নিঝুম অন্ধকার সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে ; কোথাও কেউ জেগে নেই, মাঝে মাঝে শুধু নিঝুম রাতের বাতাস ঐ গাছের পাতায় পাতায় শিপ শিপ শব্দ জাগিয়ে দিয়ে যায়।

কান পেতে শোন ! শুনতে পাচ্ছ ! ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ।··· জনহীন আঁধার ঘেরা তেপান্তরের মাঠের মধ্য দিয়ে কে যেন ঐ ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকেই আসছে না ?···

হাঁ ! ঐ ত সেই নিশীথ রাতের তীরন্দাজের কালো ঘোড়ার খুরের শব্দ ! এমনি করেই ত সে ঘোড়া হাঁকিয়ে আসে, যখনই তার কানে গিয়ে পেঁছায় অসহায় দুর্বলের বুকভাঙ্গা কান্নার করুণ আওয়াজ ! নিপীড়িতের মর্মন্তুদ হাহাকার !···

চল আমার পাঠক-পাঠিকার দল আমার সঙ্গে মহারাজ চন্দন সিংহের নিভৃত কক্ষে। যেখানে মহারাজ একাকী পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। আজ যেন তিনি বড়ই চিন্তিত,—কি বুঝি মনে মনে ভাবছেন ! ঘরের এক সুবৃহৎ পালংকে দুধের মত সাদা, হাঁসের পালকের মত নরম মখমলের শয্যায় রাজকুমারী ইলা ঘুমিয়ে !

রুপার পিলসুজে সুবর্ণ পাত্রে ঘৃতের প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলছে। নিশীথের চোরা হাওয়া মাঝে মাঝে নাম-না-জানা মিষ্টি ফুলের গন্ধ নিয়ে বহে যাচ্ছে।

চন্দন সিংহ ঘুরতে ঘুরতে এসে কন্যার শিয়রের ধারে দাঁড়ালেন। প্রদীপের স্বল্পালোকে রাজকুমারীর ঘুমন্ত মুখখানি যেন এক টুকরো স্বপ্নের মতই মনে হয়। আহা ! মা-হারা কন্যা ! গভীর স্নেহে মহারাজ মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন—

ইলা ! ইলু !···মা আমার !···

সহসা এমন সময় বাইরের দালানে কার যেন মৃদু পায়ের শব্দ পাওয়া গেল !···কে বুঝি চোরের মত চুপি চুপি এগিয়ে আসছে ! কে ?··· মহারাজ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য ! কে এত রাত্রে রাজার শয়ন-কক্ষের বারান্দা দিয়ে চুপি চুপি হেঁটে যায় ? কে ?

একান্ত কৌতূহলে মহারাজ পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন !···

বারান্দার দিককার গবাক্ষের দামী পরদা ঈষৎ ফাঁক করে দেখতে লাগলেন ! প্রাসাদ অলিন্দের ঝাড়ের নিভন্ত অনুজ্জ্বল আলোয় সমস্ত অলিন্দে একটা অস্পষ্ট আলো-ছায়ার সৃষ্টি করেছে ! পায়ের শব্দ আরো কাছে শোনা যাচ্ছে ! সেই আবছা আলোর মধ্য দিয়ে দু'জন লোক কি যেন একটা ভারী বস্তু ধরাধরি

করতে করতে নিয়ে গেল। চন্দন সিংহ একান্ত বিস্মিত হয়ে দ্রুত পদে গবাক্ষ থেকে সরে ঘরের কপাট খুলে অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু লোক দু'টোকে আর দেখতে পেলেন না। তারা যেন মুহূর্তে যাদুমন্ত্রের বলেই সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কী আশ্চর্য! এর মধ্যেই লোকদুটো উধাও হয়ে গেল!

চন্দন সিংহ দ্রুতপদে অলিন্দ অতিক্রম করে প্রাসাদ-সংলগ্ন ছাতে এসে দাঁড়ালেন। সামনেই প্রকাণ্ড রাজোদ্যান।

আকাশের ক্ষীণ ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো পৃথিবীর উপর যেন কুয়াসার মত মায়াজাল ছড়িয়ে দিয়েছে। ঘুমন্ত বিশ্বচরাচর নিস্তব্ধতার অতলতলে ডুব দিয়েছে। আকাশের তারাগুলি বুঝি ঘুমন্ত পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে শুধু তাকিয়েই আছে। ওদের চোখেও কি ঘুম নেই?

চন্দন সিংহ ইতস্ততঃ দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। সহসা এমন সময় নজরে পড়লো দুটো অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি উদ্যানের প্রাচীরের কোল-ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে! চন্দন সিংহ দ্রুত গতিতে নিজের শয়ন কক্ষের দিকে ছুটলেন। ঘরের কোণে দাঁড় করানো তীক্ষ্ন বর্শাখানি চকিতে তুলে নিয়ে গুপ্ত পথ দিয়ে দ্রুত উদ্যানের দিকে চললেন! একটু ভাল করে লক্ষ্য করতেই সেই অস্পষ্ট ছায়া মূর্তি দুটো তাঁর নজরে পড়ল!

আঁধারেই নিশানা করে বর্শা নিক্ষেপ করলেন! মুহূর্তে একটা তীক্ষ্ন চীৎকার আঁধারের বুকে জেগে উঠল!

চন্দন সিংহ ছুটে সেই দিকে গিয়ে পেঁছাবার আগেই অন্য লোকটি অদৃশ্য হয়েছিল; সেখানে পেঁছে দেখলেন বর্শাটা লোকটার বাঁ দিককার বুকে এসে আমূল বিদ্ধ হয়েছে—লোকটা মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে!

চন্দন সিংহ এক টানে বর্শাটা টেনে খুলে ফেললেন।···ক্ষতস্থান দিয়ে তীব্র গতিতে রক্ত ছুটতে লাগলো।···

এই তুই কে? তোর নাম কী?···

আমি!···নিদারুণ রক্তস্রাবে অবসন্ন লোকটা তখন হাঁপাচ্ছে!···বললে, আমি!···

হাঁ, তুই কে বল?···

আমি! আমি জানি না! সিংহবাহন!···নয়···না···আমি ত' জানি না!··· হাঁ আমার কোন দোষ নেই!···

সহসা লোকটা বার দুই হেঁচকী তুলে আরো বেশী অবসন্ন হয়ে পড়ল!··· কোন মতে অতি ক্ষীণকণ্ঠে বললে, জল! একটু জল,···জল···

চন্দন সিংহ দ্রুতপদে উদ্যানের মধ্যে যে প্রকাণ্ড দীঘি ছিল সেই দিকে ছুটলেন!···কিন্তু পাত্র? কিসে করে জল আনবেন!···তাড়াতাড়ি দু' হাতের আঁজলায় জল নিয়ে এসে লোকটার মুখে দিলেন। এইভাবে দুই তিনবার আঁজলা ভরে জল দেবার পর লোকটা মৃদুস্বরে বললে আঃ।···ক্ষতস্থান দিয়ে তখনও তীব্র গতিতে রক্ত ছুটছে। যে ঝাঁপিটা নিয়ে লোক দুটো পালাচ্ছিল,

সেটা তখনও একটু দূরেই পড়েছিল।

চন্দন সিংহ ঝাঁপিটায় হাত দিতেই বুঝতে পারলেন সেটা বেশ ভারী।… তাড়াতাড়ি সেটার উপরের ঢাকনীটা খুলে ফেললেন!…এবং খুলতেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল তা'তে তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে, চকিতে দু'পা পিছিয়ে এলেন! ঝাঁপি ভর্তি চকচকে মোহর আর সেই মোহরের স্তূপের উপর কনুই থেকে কাটা মানুষের একখানা হাত! সেই হাতে এখনও রক্তের দাগ কালো হয়ে চাপ বেঁধে আছে। সভয়ে চন্দন সিংহ চোখ বুজলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(দুঃস্বপ্ন)

একি! চন্দন সিংহ স্বপ্ন দেখছেন না ত,…ভাল করে হাত দিয়ে চোখ দুটো একবার রগড়ে নিলেন।…

না! ঐ ত ঝাঁপিভরা মোহর আর তার উপরে একখানি মানুষের হাত! ধীরে ধীরে চন্দন সিংহ একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ঝাঁপির কাছে পুনরায় ফিরে এলেন! ভাল করে দেখে আস্তে আস্তে হাতখানি মোহরের গাদার উপর থেকে তুলে নিলেন! শীতল হাতখানি! নরম ও হাল্কা!…খুব তীক্ষ্ন অস্ত্রের সাহায্যে এক ঘায়ে কাটা হয়েছে!…

হাতের অনামিকায় একটা আংটি। অঙ্গুরী স্বরূপ চাঁদের আলোয় চিকচিক করে জ্বলছিল। ধীরে ধীরে আংটিটা হাত থেকে টেনে খুলে নিলেন! আংটির মাথায় একটা সিংহের মুখ খোদাই করা!…সিংহের চোখ দু'টোতে ছোট্ট ছোট্ট দু'টো চুনী বসান!…

চন্দন সিংহ চমকে উঠলেন।…এই সিংহমুখ চিহ্নিত আংটি যা'র সে ত' তার অত্যন্ত পরিচিত; বিশ্বস্ত।…তবে?…চন্দন সিংহের মাথার মধ্যে কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। পায়ের নীচে পৃথিবী যেন সরে সরে যাচ্ছে। তবে?…

এমন সময় দূরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। খট্…খট্…খটা… খট্।…

অদূরে লোকটার বুঝি শেষ সময় হয়ে এসেছে! গলা দিয়ে কেমন একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ ঘড় ঘড় করে বের হচ্ছে। চন্দন সিংহ লোকটার কাছে এগিয়ে এলেন। চোখের দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে হয়ে এসেছে। সমস্ত শরীরটা মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ধীরে ধীরে লোকটা শেষ নিঃশ্বাস নিল। আকাশের চাঁদের আলো নিভে গেছে।…আঁধার যেন আরো চারদিকে চেপে বসেছে।…শুধু ঝিঁ ঝি পোকার একটানা বিশ্রী আওয়াজ কানে এসে বাজে। চন্দন সিংহ ধীরে ধীরে কাটা হাতের অনামিকায় পূর্বের মতই আংটিটা পরিয়ে সেটা নিয়ে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললেন।…

শয়ন-কক্ষে এসে প্রবেশ করতেই একটা চাপা কান্নার আওয়াজ কানে এসে বাজল।

কে কাঁদে?…

ঘরের ভিতর থেকেইত কান্নার আওয়াজটা আসছে।...

কে এই ঘরের মধ্যে কাঁদছে ?...

এ কি ! এ যে ইলাই বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে !

তাড়াতাড়ি চন্দন সিংহ মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে ঈষৎ ঠেলা দিয়ে ডাকলেন, ইলা ! ইলু !...মা !...

ইলার ঘুমটা ভেঙে গেল !...

কাঁদছিলি কেন মা ?...

ইলা দু'হাত দিয়ে পিতার গলা জড়িয়ে ধরে বলল—বাবা !...

কন্যাকে সস্নেহে আপন বক্ষের উপর টেনে নিয়ে মাথায় গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে আর্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন মা ?...কাঁদছিলি কেন ?...

বাবা আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে বড্ড ভয় পেয়েছিলাম !

দূর পাগলী, স্বপ্ন দেখেই এত ভয় পেলি ?...কি এমন স্বপ্ন দেখেছিস বলত ?

কি স্বপ্ন দেখলাম জান বাবা ? যেন একটা লোক সমস্ত গা তার কালো পোষাকে ঢাকা ! মুখে একটা কালো মুখোশ ! হাতে একটা তীক্ষ্ণ তীর, পিঠে ধনুক !...একটা প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটে আসছে ! চোখ দুটো তার আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে !...হাতের একটা তীর যেন আমার দিকে লক্ষ্য করে উঁচিয়ে রয়েছে ! বলতে বলতে সহসা ইলা কেঁপে উঠল এবং চন্দন সিংহকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরল !...

একি অদ্ভুত স্বপ্ন !...

কিন্তু পরক্ষণেই চন্দন সিংহ সহসা যেন জোর করেই হাঃ হাঃ করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন ! দূর ! পাগলী ! এই স্বপ্ন ! তুই ঘুমো আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই !...

ইলা আবার শয্যায় শুয়ে পড়ল। চন্দন সিংহ ধীরে ধীরে কন্যার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ইলা আবার গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তখন কাটা হাতটি কক্ষের এক গুপ্ত স্থানে সযত্নে লুকিয়ে রেখে চন্দন সিংহ ধীরে ধীরে গবাক্ষের ধারে এসে দাঁড়ালেন। রাত্রি আর বেশী নেই। রাজপুরীর নহবৎখানায় সানাইয়ে মধুর ভৈরবীতে আলাপ ধরেছে। খোলা গবাক্ষ দিয়ে রাত্রি শেষের হাওয়া ঝিরঝির করে এসে চন্দন সিংহের নিদ্রাহীন ক্লান্ত চোখে মুখে যেন শান্তির প্রলেপ দিয়ে গেল !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

("পত্র")

চন্দন সিংহ আনমনে গবাক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন—তীর-উৎসবের আর মাত্র কটা দিনই বা বাকী। বাসন্তী পূর্ণিমার ত আর বেশী দেরী নেই। প্রতি বৎসর ঐ দিনে চন্দন সিংহের রাজ্যে বিরাট উৎসবের এক

আয়োজন হয়।

এই উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে তীরের খেলা। নানা দেশদেশান্তর থেকে বড় বড় তীরন্দাজরা এই উৎসবে তীরের খেলায় যোগ দিতে আসেন এবং সেই উৎসবের শ্রেষ্ঠ খেলা হচ্ছে মৎস্য চক্ষু বিন্ধ করা। প্রায় পনের ষোল হাত উঁচু একটা থামের মাথায় একটা কাঠের মৎস্য এবং সেই মৎস্যের একটা মাত্র লাল স্ফটিকের চক্ষু! যে তীরন্দাজ বর্শা বা তীর নিক্ষেপ করে ঐ চক্ষু বিন্ধ করতে পারবে সে-ই এই উৎসবের হবে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ এবং সেই তীরন্দাজ চন্দন সিংহের কাছে যা প্রার্থনা করবে তাই পাবে!...

মহারাজ!...

কে?

চন্দন সিংহ ফিরে দেখলেন দাসী পেছনে দাঁড়িয়ে।

কি, মঙ্গলা!...

দেহরক্ষী উদয়াদিত্য আপনার দর্শনপ্রার্থী।

আসতে বল!

চন্দন সিংহর এই দেহরক্ষীটি মাত্র কয়েক মাস হলো নিযুক্ত হয়েছে। বয়স খুবই অল্প। সুশ্রী, বলিষ্ঠ গঠন। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। টানাটানা গভীর কালো দুটো চোখ। মুখে যেন হাসি লেগেই আছে।

উদয়াদিত্য ধীর নম্র পদে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

জয়স্তু মহারাজ!

কল্যাণ হোক—

কি সংবাদ উদয়?

একজন বিদেশী অশ্বারোহী আপনার দর্শনপ্রার্থী।

কি চায় সে?

দাসী পুনরায় এসে অভিবাদন জানাল; ভার্গব এসেছেন।

তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা কর উদয়;—ভার্গবকে আসতে বল!

ভার্গব লোকটি চন্দন সিংহের একান্ত প্রিয়পাত্র হলেও রাজ্যের আর সকলেরই অপ্রিয়। ছেলে-বুড়ো, তরুণ-তরুণী কেউই তাকে পছন্দ করে না। সামান্য কয়েক মাস মাত্র চন্দন সিংহের কার্যে ভর্তি হয়ে সে তা'র কাজের দ্বারা চন্দন সিংহের একান্ত প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছে। ভার্গব লোকটা যে সঠিক কি জাতি তা' কেউ জানে না। জাতের কথা কেউ উঠালে হেসে জবাব দেয়ঃ কী হবে জাত দিয়ে, মানুষের সব চাইতে বড় ও সত্যিকারের পরিচয় তার কাজের মধ্যে।

লোকটা যেমন ঢ্যাঙ্গা, তেমনি রোগা। প্রস্থের অনুপাতে দৈর্ঘ্যটা এত বেশী যে, চলতে গেলেই শরীরটা হেলতে দুলতে থাকে। একটা চোখ কানা। যে চোখটা আছে সেটা আবার এত ছোট যে দেখাই যায় না। সরু সরু শির বের করা প্যাকাটির মত আঙ্গুলগুলো দিয়ে যখনই কিছু চেপে ধরে মনে হয় এই

বুঝি সেটা কঠিন চাপে ভেঙ্গে দুমড়ে যাবে। মাথায় একটা পাগড়ী। কপালে একটা রক্তচন্দনের মস্ত বড় ফোঁটা তিলক। ভার্গব এসে অভিবাদন জানাল ঃ

প্রণাম হই !

কল্যাণ হোক !

মহারাজ কাল রাজোদ্যানে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে।

জানি।

ভার্গব মৃদু একটু হেসে জবাব দিল ঃ জানি যে আপনি জানেন। কিন্তু লোক জানাজানি হওয়াটাই কি আপনার ইচ্ছা ?

তোমার কি মনে হয় ভার্গব ?

আমার ত তাই মনে হয়। কিন্তু একটা কথা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না মহারাজ, মোহরের ঝাঁপিতে রক্ত এলো কোথা থেকে ?

তুমি এক কাজ করতে পারবে ভার্গব ?

আদেশ করুন।

আসন্ন উৎসবে যোগ দেবার জন্য নানা দেশ থেকে নানা জাতীয় লোক এসে আমার রাজ্যে উপস্থিত হয়েছে। তুমি শুধু একটু নজর রাখবে—আমার রাজ্যের সীমানার বাইরে কোন রকমের অসুস্থ লোককে যদি যেতে দেখ তাকে আটকে শুধু তার দুই হাত পরীক্ষা করবে। যদি এমন কোন লোক পাও যে তার একটা হাত কাটা তবে সেই মুহূর্তে তাকে বন্দী করে আমার কাছে হাজির করবে।

যথা আজ্ঞা মহারাজ !···

আচ্ছা এখন তুমি যেতে পার। উদয়কে পাঠিয়ে দিও। ভার্গব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এমন সময় ইলা ঘুম থেকে উঠে শয্যার উপর বসল।

কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে চন্দন সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ঘুম হলো মা ?

ইলা বাবাকে প্রণাম করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। অন্য দুয়ার দিয়ে উদয় এসে ঘরে প্রবেশ করল।

চল উদয় তোমার বিদেশী অশ্বারোহীর সঙ্গে দেখা করে আসি। কোথায় সে অপেক্ষা করছে ?

উদ্যানের বাইরে অশোক গাছের নীচে !

চল !

প্রভাতে সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রভাতী হাওয়ায় ভেসে আসে সানাইয়ের করুণ ভৈরবীর আলাপ। চারদিকে যেন একটা শুচিস্নিগ্ধ অম্লান প্রসন্নতা !

উদয়ের পিছু পিছু চন্দন সিংহ উদ্যানের বাইরে নির্দিষ্ট অশোক তরুতলে এলেন।

একজন অশ্বারোহী দাঁড়িয়েছিল, চন্দন সিংহকে অভিবাদন জানাল ঃ মহারাজের নামে একখানি পত্র আছে।

পাগড়ীর ভাঁজ থেকে একখানি ভাঁজ করা কাগজ খুলে সে চন্দন সিংহের হাতে দিল।

চন্দন সিংহ পত্রখানি খুলে মেলে ধরলেন। তা'তে লেখা ছিল—

"এই অশ্বারোহীর মারফত কাটা হাতখানা অবিলম্বে ফেরত দিবেন। অন্যথায় বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

—'সুন্দরলাল'।

এত স্পর্দ্ধা! রাগে অপমানে মুহূর্তে চন্দন সিংহের সমগ্র মুখখানা রক্তবর্ণ হয়ে উঠল!...পরক্ষণেই হাতের পত্রখানা টুকরো টুকরো করে মাটিতে নিক্ষেপ করে ক্রুদ্ধ চাপা স্বরে বললেন: এই চিঠির জবাব! যাও!

অশ্বারোহী মুহূর্তে ঘোড়ায় চেপে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

("আর একখানি কাটা হাত")

রাজোদ্যানে একটা রক্তাক্ত মৃত দেহ পাওয়া গেছে এবং শুধু তাই নয় তার পাশেই একটা প্রকাণ্ড ঝাঁপিভর্তি মোহর!

সমগ্র রাজ্য জুড়ে বিরাট হৈ! চৈ!...নগরপাল তো ভয়েই অস্থির! আজ বুঝি তার গর্দানটাই যায়, কী ধরে মশানে নিয়ে গিয়ে শূলেই চাপিয়ে দেয়! হায়! হায়, কী জবাব দেবে সে দরবারে।

তা বেচারী নগরপালেরও তেমন দোষ দেওয়া যায় না। অনেক দিন পরে কুটুম বাড়ীতে এসেছিল বলে খাওয়ার আয়োজনটা একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল। আর খাওয়ার লোভটা চিরকালই তার একটু বেশী। তাই একটু বেশী খেয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল। তা না হলে—কী আর করা যায়! দুরু দুরু বক্ষে নগরপাল রাজোদ্যানের দিকে চলল। যখন উদ্যানে গিয়ে পেঁছাল সেখানে তখন লোকে গিসগিস করছে। বুকে তীক্ষ্ন বর্শা বিদ্ধ করে লোকটাকে মারা হয়েছে।

নিশ্চয় লোকটা মোহরের ঝাঁপিটা চুরি করে পালাচ্ছিল, কেউ তাই দেখতে পেয়ে বর্শা দিয়ে নিহত করেছে। কিন্তু যে নিহত করল সেইবা মোহরগুলি এখানে ফেলে গেল কেন? আর কে এমন বর্শাধারী যার হাতের নিশানা এত নির্ভুল?

চিন্তিত নগরপালের সমগ্র কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগলো। আর এমন পোড়া অদৃষ্ট মানুষের হয়! খুন হবি ত একেবারে রাজোদ্যানে! একদম বাঘের ঘরে ঘুঘুর বাসা! মৃত দেহের ও মোহরের ঝাঁপির একটা ব্যবস্থা করে নগরপাল ধীরে ধীরে দরবারে এসে দাঁড়াল। অল্পক্ষণ বাদেই তার ডাক পড়ল।

নাদুসনুদুস ঢলঢলে চর্বিবহুল দেহখানা নিয়ে দুরুদুরু বক্ষে নগরপাল সভায় এসে প্রবেশ করল!

কাল রাত্রে আমার উদ্যানের ভেতরে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে জান?

আজ্ঞে মহারাজ !

কিন্তু সেই হত্যাকারীর কোন সংবাদ পেলে ?

আর সংবাদ ! নগরপালের সমস্ত শরীর তখন ঘামে একেবারে ভিজে সপসপে হয়ে উঠেছে।

কি, জবাব দাও, জান ? কে সে হত্যাকারী ?

সহসা এমন সময় ভিড়ের ভেতর থেকে সুমিষ্ট মেয়েলী কণ্ঠে বলে উঠল, মহারাজ চন্দন সিংহ !

সেই মুহূর্তে সভার মধ্যে বাজ পড়লেও বুঝি সভাস্থ সকলে অতখানি চমকে উঠত না যতখানি এই উত্তর শুনে সকলে চমকিত ও বিস্মিত হোল !

উত্তরে চন্দন সিংহও যেন চমকিত ও বিস্মিত হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই জন্যই প্রথমটা কয়েক মুহূর্ত তার কণ্ঠ দিয়ে কোন স্বরই বের হলো না !

পরক্ষণেই চীৎকার করে প্রশ্ন করলো, কে ? কে জবাব দিল ?…শীঘ্র বল কে ?

কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না ! সভার সমস্ত লোক কান পেতে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কোন জবাব নেই।

এমন সময় জনতার মধ্য থেকে লোক ঠেলতে ঠেলতে হাপাতে হাপাতে ভার্গব সভায় এসে প্রবেশ করল।

কি সংবাদ ভার্গব ?

সংবাদ জরুরী…কিন্তু !…

ও, আচ্ছা চল পার্শ্বের কক্ষে।… দ্বারী, সভার দ্বার বন্ধ করে দাও, যতক্ষণ না আমার আদেশ পাবে খুলবে না।…

সশব্দে সভার লৌহ দ্বার বন্ধ হয়ে গেল।

পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করে চন্দন সিংহ বললেন—তারপর ?

সিংহবাহন নিখোঁজ মহারাজ !

তুমি ঠিক জান ?

এবং শুধু তাই নয়, সিংহবাহনের ঘরে একটা কাটা হাত পাওয়া গেছে, বলতে বলতে ভার্গব বস্ত্রের ভেতর থেকে একটা কাটা হাত বের করে চন্দন সিংহের চোখের সামনে তুলে ধরল !

একি, এ হাত তুমি কোথায় পেলে ?

সিংহবাহনের গৃহে।

বজ্রমুষ্টিতে ভার্গবের একখানি হাত চেপে ধরে কঠিন কঠোর কণ্ঠে চন্দন সিংহ ডাক দিলেন—ভার্গব ! ভার্গব অভিভূতের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে তাকাতে বলল—মহারাজ কি আমায় অবিশ্বাস করেন ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(আংটি চুরি)

মহারাজ কি আমায় অবিশ্বাস করছেন ? কিন্তু কিছুই ত আমি বুঝতে পারছি না ?

চন্দন সিংহ ভার্গবের কথার কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। মাথার মধ্যে অজস্র চিন্তা এক সাথে হুড়মুড় করে এসে যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সহসা একসময় ভার্গবের একেবারে অতি নিকটে এসে প্রশ্ন করলেন—সিংহবাহন কোথায় গেছে বলে তোমার মনে হয় ভার্গব ?

আপাততঃ সে এখন পর্যন্ত কোথাও যায়নি মহারাজ !

যায়নি ? তবে যে তুমি একটু আগে বললে সিংহবাহন নিখোঁজ ?

হাঁ, তা বলেছি বটে, তবে নিখোঁজ অর্থে একেবারে নিশ্চিত কোথাও চলেই গেছে এমন ত' নাও হতে পারে !

হতে পারে ?

পারে না ; সে হয়ত এখন কোন কারণবশতঃ দেখা দিতে ইচ্ছুক না বলেই কোথাও আপনাকে গোপন করে রেখেছে।

দেখা দেবে না ? কিন্তু কেন ?

মহারাজ সব কিছুই আমার অনুমান মাত্র।

কিন্তু এই কাটা হাত সিংহবাহনের ঘরে ছিল অথচ ?

এমন সময় একজন দেহরক্ষী এসে জিজ্ঞাসা করল—মহারাজ ! সভাদ্বার কি খুলে দেওয়া হবে ?

না চল, আমি যাচ্ছি !···ভার্গব, চল সভাগৃহে !

সভাস্থ সমস্ত লোকই একটা অনিশ্চিত আশংকায় বিষণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে উঠেছে। একটা চাপা অথচ মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

চন্দন সিংহের সভাগৃহে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সব যেন থেমে গেল।

কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কে যে অত লোকজনের সামনে মহারাজকে হত্যাকারী বলে অভিযুক্ত করতে সাহস পেলে তা জানা বা বোঝা গেল না। সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হল। মহারাজ চিন্তিত মনে প্রাসাদাভিমুখে চললেন এবং সভা ভঙ্গের পূর্বে এই কথা ঘোষকের দ্বারা সভায় ঘোষণা করে দিলেন যে, যদি কেউ সেই প্রচ্ছন্ন বক্তাকে ধরিয়ে দিতে পারে তবে সে উপযুক্ত পুরস্কার পাবে।

মহারাজ আজ সত্যিই পরিশ্রান্ত ও চিন্তিত। এস আমার পাঠকপাঠিকার দল এই ফাঁকে আমরা একবার চন্দন সিংহের রাজপ্রাসাদ ও তার চারপাশ ঘুরে একটু দেখেশুনে নেই ; কেননা আমাদের গল্পের অনেকটাই চন্দন সিংহের প্রাসাদ ও তার মধ্যস্থিত লোকজন, দাসদাসী, দেহরক্ষী ও আরো অন্যান্য সকলকে নিয়ে।

প্রাসাদ থেকে প্রায় চতুর্থাংশ ক্রোশ দূরে রাজপ্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে গভীর পরিখা খনন করা এবং সেই পরিখা জলে পূর্ণ। তারপরই দুই মানুষ সমান উঁচু পাষাণ প্রাচীর। প্রাচীরের উপর দিয়ে অনায়াসেই দুজন লোক একই সময়ে পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারে। প্রাচীরের উপরে কিছুটা অন্তর ছোট এক একখানা কুঠরী।...সেখানে সর্বদাই প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত। সেই কুঠরী থেকে গুপ্ত সুড়ঙ্গ বরাবর মাটির তল দিয়ে একেবারে রাজপ্রাসাদে গিয়ে পেঁাছেছে। প্রাচীরের পরে কিছুটা এগিয়ে গেলে আকাশচুম্বী শাদা দুধের মত ধবধবে রাজপ্রাসাদ! পর পর তিনটি লৌহ দ্বারে অষ্টপ্রহর সুদক্ষ প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত। রাজপ্রাসাদের পেছনে রাজোদ্যান। রাজোদ্যানের ভেতরে প্রকাণ্ড দীঘি। কাকচক্ষুর মত পরিষ্কার টলটলে জল। শ্বেত মরালের দল গ্রীবা দুলিয়ে সেই দীঘির জলে জলক্রীড়া করে। রাজোদ্যান থেকে একটা প্রশস্ত পথ আবার বরাবর পরিখার উপর দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় মিশেছে। এই পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে সাধারণ লোকের প্রবেশ নিষেধ—একমাত্র রাজকর্মচারীদের অনুজ্ঞা ব্যতীত।

এইত গেল মোটামুটি বাইরের কথা। রাজপ্রাসাদের ভেতরকার কথা একটু একটু করে জানতে পারবে।

চন্দন সিংহ ভেতরে আসতেই ইলা কোথা থেকে ছুটে এসে পিতার একখানা হাত চেপে ধরল ঃ বাবা!

আব্দারের সুরে ইলা ডাকল।

চন্দন সিংহ পরম স্নেহে মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—খাওয়া হয়েছে মা?

হুঁ! অনেকক্ষণ।

তোমার কি অসুখ করেছে বাবা?

চন্দন সিংহ অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিলেন—কন্যার প্রশ্ন তার কানে গেল না।

ও বাবা!

এ্যাঁ!

কি হয়েছে তোমার? ভাল করে কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

কই না, কিছুইত' হয়নি।

না, নিশ্চয়ই তোমার অসুখ করেছে, মুখ অত শুঝনো শুকনো দেখাচ্ছে। দেখি নীচু হও ত' কপালে হাত দিয়ে দেখি।

মৃদু একটু হেসে চন্দন সিংহ মেয়ের গালটা একটু টিপে দিয়ে বললেন, না রে পাগলী! কিছু হয়নি। আজ যে খেলতে যাসনি?...

উদয়দা কোথায় বাবা? তাকে যে দেখছি না?

কেন? সে কোথায় গেছে?

কি জানি, কোথায় যে গেছে তা সেই জানে—সারা প্রাসাদ তাকে খুঁজে খুঁজে পেলাম না।

আচ্ছা আমি দেখছি—দ্বারী !

দ্বারী এসে অভিবাদন জানাল।

উদয়াদিত্যকে সংবাদ পাঠাও !

যথা আজ্ঞা মহারাজ ! দ্বারী অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দ্বিপ্রহরে শয়ন কক্ষের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়ালের এক গুপ্ত স্থান থেকে চন্দন সিংহ গত রাত্রের মোহরের ঝাঁপিতে পাওয়া সেই কাটা হাতটা বের করলেন !

হাতটা এখনও বিকৃত হয়নি, চামড়ায় শুধু একটু টান ধরেছে মাত্র। সুগোল স্ফীত মাংসপেশীগুলি একটু শক্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু একি ! সেই আংটিটা কি হলো ? অনামিকায় যে আংটিটা ছিল ! তার নিজের চোখে স্পষ্ট দেখা ! না না একি ভুল হবার ! উঃ, কি দুঃসাহস ! কার এতবড় বুকের পাটা যে তার শয়নকক্ষের গুপ্তস্থানে লুকানো হাত থেকে আংটি চুরি করে নিয়ে গেল।

কে সে ? কে ? এ কথা ত কেউ জানত না ! তবে ? চন্দন সিংহ ভাবনায় চিন্তায় যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন। একি ভোজবাজী ? একি যাদুমন্ত্র ?··· তাড়াতাড়ি কাটা হাতখানা যথাস্থানে লুকিয়ে রেখে কক্ষের দরজা খুলে চন্দন সিংহ কঠিন কঠোর কণ্ঠে ডাক দিলেন ঃ 'দাসী' !···

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

("গুপ্ত কারাকক্ষের বন্দী")

দাসী কক্ষে এসে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল। মহারাজ অস্থির ! অশান্ত পদক্ষেপে সমগ্র ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। মুখের প্রতি রেখায় রেখায় উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা প্রকট হয়ে উঠেছে।···দাসী নীরবে আদেশের অপেক্ষা করে। এক সময় মহারাজ ফিরে ডাকলেন, 'দাসী' !

মহারাজ !···

আমি যখন সভার কাজে ছিলাম তখন কিংবা আমার অনুপস্থিতিতে যতক্ষণ ইলা এই ঘরে খেলা করছিল, কেউ এ ঘরে প্রবেশ করেছে ?

মহারাজ আমার জ্ঞাতসারে কেউ এ কক্ষে প্রবেশ করেনি ! তবে অজ্ঞাতে যদি কেউ···

আচ্ছা তুমি যেতে পার।···

দাসী কক্ষ ত্যাগ করল যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে।

* * * * নিশীথের সারাটা আকাশ জুড়ে মেঘের নিশান উড়েছে। থেকে থেকে বিজলীর চমক-মারা চাউনি কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় !···

চন্দন সিংহ প্রাসাদ কক্ষের খোলা বাতায়নের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। সমগ্র বিশ্ব-চরাচর জুড়ে যেন অবশ্যম্ভাবী

আসন্ন প্রলয়ের বার্তা সূচিত হচ্ছে!

গত দুই দিনের উপর্যুপরি ঘটনাগুলি সত্যই আজ তাকে একান্তভাবেই বিচলিত করে তুলেছে। একটা গভীর ষড়যন্ত্রের কালো ছায়া, দৃষ্টির অন্তরালে যে ঘনিয়ে উঠ্ছে এ তিনি বেশ বুঝতে পারছেন।...

রাজকুমারী ইলা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন! মহারাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কন্যার শিয়রে দাঁড়ালেন। রাতের হাওয়ায় প্রদীপের স্নিগ্ধ কম্পিত শিখাটি ঘুমন্ত রাজকুমারীর মুখে আলো-ছায়ার সৃষ্টি করছে!

মহারাজ কন্যার শিয়রের কাছটিতে দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল কী যেন ভাবলেন। অতঃপর কক্ষের মধ্যে যেখানে পিতা সংগ্রাম সিংহের সুবৃহৎ মর্মর মূর্তি দাঁড় করান আছে সেইখানে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড় করান মূর্তির নীচে মাথা নত করে মহারাজ প্রণাম করলেন।

তারপর মূর্তিখানি ঈষৎ একটু ঠেলে ধরতেই পাশে নীচেতে ছোট একটা দ্বার প্রকাশিত হলো। সেই দ্বারের এক পাশে একটা জায়গায় ঈষৎ একটুখানি চাপ দিতেই দ্বারের কবাট দুখানা খুলে গিয়ে সম্মুখে একটা গুপ্ত কক্ষ প্রকটিত হলো! মহারাজ সেই কক্ষে প্রবেশ করে সেই কক্ষের কুলঙ্গিস্থিত প্রদীপটি আগে প্রজ্বলিত করলেন। সেই কক্ষের দেওয়ালে কতকগুলি সাজসজ্জা টাঙ্গানো আছে দেখা গেল।

মহারাজ সেই পোষাক হ'তে একটি পোষাক বেছে নিয়ে পরিধান করলেন। মাথার উষ্ণীষ খুলে ফেলে কৃষ্ণ বর্ণের এক উত্তরীয় নিয়ে শিরোস্ত্রাণ তৈয়ারী করে নিলেন। কটিদেশে তরবারী ঝুলিয়ে দিলেন এবং এক গোছা চাবি কক্ষস্থিত কুলঙ্গী হতে নিয়ে কক্ষের বহির্দেশে এসে দাঁড়ালেন।

আজ বাদে কাল বাসন্তী পূর্ণিমা! আকাশে যে চন্দ্রের উদয় হয়েছে তার শুভ্র জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি যেন হাসছে। মহারাজ প্রাসাদ অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন।

প্রাসাদ হতে পোয়াটাক পথ দূরে সুউচ্চ এক পর্বতের উপর রাজ-কারাগার। মহারাজ পায়ে হেঁটেই সে পথ অতিক্রম করলেন।

কারাগারের লৌহদ্বারের সম্মুখে একজন সশস্ত্র প্রহরী মুক্ত কৃপাণ হস্তে প্রহরায় নিযুক্ত। মহারাজের নিঃশব্দ পদসঞ্চরণও তার কানে গেল। "হুঁশিয়ার!" সে হুংকার দিয়ে উঠ্ল।

মহারাজ নিঃশব্দে স্বীয় নামাংকিত অঙ্গুরী সমেত হস্ত প্রসারিত করে ধরলেন।

মহারাজের নামাংকিত অঙ্গুরী দেখে প্রহরী সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দাঁড়াল; এবং কারাগারের লৌহ কবাটের চাবি খুলে দিল।

মহারাজ নিঃশব্দে কারাকক্ষে প্রবেশ করলেন।

স্তরে স্তরে কঠিন পাষাণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই সুবিশাল কারাগার। মুক্ত প্রকৃতির আলো-বাতাস এর পাষাণগাত্রে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। পাখীর কলগীতি হেথায় পৌঁছায় না। মৌন ভাষাহীন বেদনা যেন চারধারে গুমরে

গুমরে ওঠে! ছোট ছোট সব কুঠুরী!…সেই কুঠুরীর দেওয়াল ও ছাত যেখানে মিশেছে সেখানে দুটো করে ঘুলঘুলি। দিনের বেলায় অফুরন্ত সূর্যকিরণের যৎ-সামান্য সেখান দিয়ে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাকক্ষে প্রবেশ করে কক্ষটিকে স্বল্পালোকিত করে। রাতের বেলা তৈলের একটা ঝোলায়মান কাচ-চতুস্খণ্ডের মধ্যে একটা বাতি জেবলে দেওয়া হয়, সেটা কিন্তু আলোর চাইতে ধূম উদ্গিরণই বেশী করে।

মহারাজ আপাদমস্তক একটা কালো বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে কারাগারের দুই পাশের কুঠুরীর মধ্য দিয়ে যে স্বল্পালোকিত পথ সেইখান দিয়ে এগিয়ে চললেন।

……কারাগারের একবারে শেষ প্রান্তে পাষাণ চত্বর। সেই পাষাণ চত্বরের পশ্চিম কোণে একটা জলশূন্য ইঁদারা। সেই ইঁদারার ভেতরে একটা লৌহ শিকল ঝুলছে।…মহারাজ সেই শিকল ধরে ধীরে ধীরে সেই জলশূন্য ইঁদারার মধ্যে নামতে লাগলেন। কিছুদূর নামার পর কঠিন পাষাণ সোপানের গায়ে পা স্পর্শ করল। হিমানীর মত শীতল পাষাণ সোপান, পায়ের তলা শির শির করে উঠে। সেই সোপানের দ্বিতীয় তৃতীয় ধাপের শেষে সমতল ভূমি।…

সম্মুখেই একটা লৌহ কবাট। তার গায়ে ভারী তালা লাগান। চাবি দিয়ে মহারাজ তালা খুলে ফেললেন।

সামনেই দেওয়ালের গায়ে একটা মশাল ছিল সেটা পাথরের চকমকি ঠুকে মহারাজ প্রজ্বলিত করলেন।

কঠিন পাষাণের গায়ে কেটে কেটে অপরিসর ঘোরান সোপানশ্রেণী তৈয়ারী করা হয়েছে। মহারাজ মশাল হস্তে সেই পাথরের ঘোরান সোপান বেয়ে নামতে লাগলেন।

নীচে অনেক দূরে দেখা যায়, মৃদু মশালের আলোয় কে একজন আপন মনে নীচু হয়ে একখণ্ড পাথরের গায়ে একটা ছোরা ঘষছে আর ঘষছে!…

পাশেই পাথরের গা বেয়ে বেয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। আঁধার গুহামধ্যে সেই জল পতনের একঘেয়ে টুপটুপ্ শব্দ থেকে থেকে কানে এসে বাজে একান্ত করুণ ও অস্বাভাবিক!…

পর্বত গাত্র দিয়ে প্রবাহিত ঝরণার ধারার সাথে এই ভূগর্ভস্থিত গিরিগুহার সংযোগ আছে। তারই প্রবাহিত জলধারা হতে চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসে গুহার মধ্যে একটি সমচতুষ্কোণ স্থানে সঞ্চিত হচ্ছে। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলবিন্দুগুলি যেন পাষাণ কারায় যুগ যুগ ধরে অবরুদ্ধ আঁধারের অশ্রুর মত জমা হয়ে উঠে।…

পাথরের গায়ে গায়ে স্তূপীকৃত আঁধারের যেন চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ জমাট বেঁধে উঠছে!…

মহারাজ সর্বনিম্ন ধাপে নেমে মশালটি একপাশে রাখলেন।

একটা চতুষ্কোণ পাথরের উপর একটা তৈল প্রদীপ মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় স্বল্পালোকিত গিরিগুহার নিঃসঙ্গ জমাটবাঁধা স্তব্ধতায় লোকটাও যেন মৌন হয়ে গেছে। লোকটার এক মাথা রুক্ষ এলোমেলো চুল, হাতে দুটি লৌহ বলয়!…তার একটার সাথে লৌহশৃংখল পরান!…সেটি অদূরে

পাষাণ গাত্রে আটকান !

লোকটি বন্দী !···কে এই বন্দী ?···

মহারাজ বন্দীর সম্মুখে নতজানু হয়ে কোষ হতে অসি মুক্ত করে প্রণাম জানালেন।

বন্দী মুখ তুলে চাইল। প্রদীপের আলোয় কোটরাগত চোখের মণি দুটো জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠ্‌ল। চোখের কোলে কালি পড়েছে।···তীক্ষ্ন অন্তর্ভেদী দুটো চোখের দৃষ্টিতে নিষ্ফল আক্রোশের ও জীঘাংসা যেন মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠে !

কি চাও ?···ভারী কর্কশ গলায় বন্দী প্রশ্ন করে।

কেমন আছেন ?

চমৎকার ! বলে সহসা বন্দী উচ্চৈস্বরে হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি করে উঠ্‌ল। সেই দানবীয় হাসির উন্দামতা কঠিন মৌন পাষাণের গায়ে গায়ে প্রতিহত হয়ে আঁধার গিরিগুহার চারিভিতে কি এক নিদারুণ বিভীষিকায় প্রেতায়িত হয়ে উঠ্‌ল। পরে সহসা ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বললে, কেমন আছেন, দূর হও আমার দৃষ্টির সম্মুখ হতে !···মৃত্যুভয় যদি থাকে তবে পুনরায় আমায় জ্বালাতন করতে এসো না !···বন্দী পুনর্ব্বার ছোরাটা পাথরের গাত্রে ঘষ্‌তে শুরু করলে। মহারাজ একদৃষ্টে বন্দীর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে মৃদু স্বরে বললেন ঃ বন্দীর খোঁজ নেওয়া রাজার কর্ত্ব্য।···

কর্ত্ব্য !···বিনাবিচারে, বিনাদোষে সামান্য সন্দেহের বশে একজনকে বন্দী করবার কারোরই অধিকার নেই। তুমি কি ভাবো, যেহেতু তুমি এদেশের রাজা, তুমি তোমার খুশীমত কাজ করতে পার ? ন্যায় অন্যায়ের সীমানা তোমার জন্য নয় ? একথা ভুলে যাও কেন মূর্খ, প্রত্যেক বস্তুরই একটা সীমা আছে, সমুদ্রও অসীম নয় ! তোমারই এই স্বেচ্ছাচারিতা, তোমার নিজের পায়ে বেড়ী পরাবে। সেদিন বেশী দূরে নয়।

আপনার কাছে কর্ত্তব্যের উপদেশ নিতে আমি আসিনি ; দেশের যিনি রাজা তার কর্ত্ব্যাকর্ত্ব্যের জ্ঞান আছে।···আচ্ছা, আমি চল্‌লাম। কিন্তু একটা কথা—এই ষড়যন্ত্রের সকল কটিকে আজ পর্য্যন্ত খুঁজে বের করতে পারিনি। আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তাদের নাম বলতে পারেন ; কেননা তাতে শুধু আমারই মঙ্গল নয় ; আপনার, এই রাজ্যের ও ভবিষ্যতে যে রাজা হবে তারও প্রভূত হিত সাধন করা হবে। অবিশ্বাসী, বিশ্বাসঘাতক যারা তারা যুগে যুগে এমনি করেই প্রলয়ের আগুন দেশে দেশে জ্বালিয়ে সব ছারখার করে এসেছে। সেই সব জঘন্য ও নীচ প্রকৃতির কুক্কুরদের শত খণ্ডে খণ্ডিত করলেও তাদের সমুচিত দণ্ডবিধান হয় না। ওদের মত শত্রু দেশের, দশের ও সমাজের আর নেই।

মহারাজের কণ্ঠস্বর রাগে উত্তেজনায় রুদ্ধ হয়ে আসে। তারপর বললেন, সে মূর্খের দল জানে না যে, যতক্ষণ মহারাজ চন্দন সিংহের হাতে তরবারি আছে এ দুনিয়ার কোন কিছুকেই সে ভয় করে না,—মহারাজের কোষমুক্ত অসি স্বরূপ

আলো-আঁধারে মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরে এলো।

সহসা এমন সময় বিদ্যুৎ গতিতে বন্দীর হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ন ছোরাখানি চন্দন সিংহের বক্ষঃস্থলে গিয়ে ঠোক্কর খেয়ে মাটিতে পড়ে ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল তার বস্ত্রের অন্তরালে আচ্ছাদিত লৌহ বর্মে প্রতিহত হয়ে!…

মহারাজের মুখে মৃদু একটুকরো হাসি ফুটে উঠ্‌ল!…দেখলেন, এখন হয়ত আর বুঝতে তেমন কষ্ট হবে না যে, মহারাজ চন্দন সিংহ বিনাবিচারে, শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কাউকে বন্দী করেন না। রাজার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী।

নিষ্ফল আক্রোশের রুদ্ধ আবেগে বন্দী তখন ফুলে ফুলে উঠছে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

("তীরোৎসবে অচেনা তীরন্দাজ")

এসো আমার পাঠকপাঠিকারা! চল তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে, মহারাজ চন্দন সিংহের রাজ্যে আজ হৈ-হৈ ব্যাপার! রৈ-রৈ কাণ্ড, সেখানে আজ তীরের উৎসব! নানা দেশ হতে আজ সেখানে বিখ্যাত তীরন্দাজরা তীরের খেলা দেখাতে এসেছে। চল, দেখে আসি কোন্‌ ভাগ্যবানের গলায় আজ বিজয়লক্ষ্মী তার বিজয় মাল্যটি দুলিয়ে দেন!

রাজবাড়ীর পেছন দিকে প্রশস্ত ময়দানে উৎসবের বিরাট আয়োজন হয়েছে। চারদিকে কদলী বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে, দেবদারু পাতার মালা দুলিয়ে দিয়েছে ও রংবেরংয়ের নিশান বাতাসে উড়ে পত্‌পত্‌ শব্দ করছে!…

প্রতিযোগীদের জন্য তাঁবু ফেলা হয়েছে।

সুদূর মারাঠা হতে এসেছে কেউ, কেউবা এসেছে কনৌজ হতে, কেউ মাড়োয়ার হতে এসেছে, কেউ এসেছে কাঞ্চী হ'তে, কেউ এসেছে কোশল হতে, ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কোন দেশেরই লোক আজিকার এ উৎসবে বাদ যায়নি।

রাজকর্মচারীরা ব্যস্তসমস্তে সব তদ্বির করে বেড়াচ্ছে।

বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রি!…রজতোস্নাতা ধরণী আজি বুঝি উল্লাসে মাতোয়ারা। সুনীল নির্মেঘ, নির্মুক্ত নীলাকাশের বুক বেয়ে অজস্র ধারায় চন্দ্র-কিরণ পৃথিবীর বুকে ঝরে ঝরে পড়ে। মাঝে মাঝে পাপিয়ার আকুল কলধ্বনি আকাশ ও ধরণীতল ভরিয়ে দেয়।

ঘোষক ভেরীতে ফুৎকার দিয়ে আসন্ন উৎসবকাল ঘোষণা করলে, প্রথমে আরম্ভ হলো ঘোড়দৌড়।

প্রতিযোগীরা যে যা'র প্রিয় অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করে সার বেঁধে দাঁড়াল। মহারাজের ইঙ্গিতে ঘোড়দৌড় আরম্ভ হলো! চিহ্নিত এক ক্রোশব্যাপী চক্রাকৃতি অংশে সকলে দৌড়াচ্ছে।

উচ্চ সভামণ্ডপে মখমলের আসনে মহারাজ চন্দন সিংহ উপবেশন করেছেন, পাশে রাজকুমারী ইলা। বহুমূল্য বেশভূষায় আজ তাকে স্বর্গের পরীর মতই

প্রতীয়মান হয়। গলায় বহুমূল্য হীরক হার উজ্জ্বল আলোর আভায় অদ্ভুত দ্যুতি বিকীর্ণ করে।

এর পর আরম্ভ হলো তীরের খেলা।…

ছোট বড় তীরের খেলা শেষ হয়ে গেল।

এইবার মৎস্য চক্ষুর লক্ষ্য-ভেদ।

কনৌজের তীরন্দাজ বীরবাহু ও দু' একজন তীরন্দাজ এই খেলায় তাদের পরীক্ষা দেবার জন্য অগ্রসর হ'ল।

পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে ১৫।১৬ হাত পরিমাণ উঁচু একটা থামের মাথায় একটা চক্র—সেই চক্রের অর্ধহস্ত পরিমাণ ছিদ্রপথে একটি কাঠের মৎস্য দেখা যায়। মৎস্যের ডিম্বাকৃতি দুটি স্ফটিকের চোখ উজ্জ্বল আলোয় চক্ চক্ করে। হাত পাঁচ ছয় দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য-ভেদকারীর তীর দিয়ে সেই চক্ষু বিদ্ধ করতে হবে।

প্রতিযোগীদের মধ্যে সকলেই একের পর এক চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু হাতের তীর কারও বা থামের গায়ে লেগে ছিটকে পড়ে গেল, কারও কাঠের চাকার গায়ে বিঁধে রইল, কারও চক্রের কাছ দিয়েও গেল না।

এইবার শক্তিধরের পালা। শক্তিধর অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য স্থির করে হাতের তীক্ষ্ন তীর নিক্ষেপ করল। বায়ুতরঙ্গে সোঁ সোঁ শব্দ জাগিয়ে বিদ্যুতের মত তীর ছুটে গেল। কিন্তু তীর চক্রখানির এক পাশে বিদ্ধ হয়ে রইল!

এমন সময় সহসা স্তব্ধ ও উৎকণ্ঠিত জনতার ভিতর হতে কে যেন সুমিষ্ট মেয়েলী কণ্ঠে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল!

মহারাজ হতে আরম্ভ করে উপস্থিত জনতা সকলেই চমকে উঠ্‌ল। এ সেই ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি!…সভাস্থলে যে হাসি শুনে তিনি চমকে উঠেছিলেন! কে? কে হাসে?…

সমগ্র দর্শকবৃন্দের মাঝে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা যায়।

তারপর সেই জনতাকে দ্বিধা বিভক্ত করে উন্মুক্ত ময়দানের ক্রীড়াক্ষেত্রে এসে দেখা দিল এক ঘোড়-সওয়ার!…ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তেজী তা'র অশ্ব! গ্রীবা দুলিয়ে দুলিয়ে কদমে কদমে পা ফেলে এগিয়ে আসছে!…অশ্বারোহীর পরিধানেও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছেদ! মস্তকে কৃষ্ণবর্ণের শিরস্ত্রাণ!…সেই শিরস্ত্রাণে একটি স্বর্ণ-পাতের তৈরী তরবারি বসান…উজ্জ্বল আলোয় চিক্ চিক্ করে জ্বলে! শুধু দু' চোখের জন্য দু'টো ছিদ্র রেখে বাকী মুখটা কালোকাপড়ে ঢাকা!…

দক্ষিণ হস্তে অশ্বারোহী অশ্বের বল্গা ধরে আছে। পৃষ্ঠে ধনুক ও তূণে ভরা তীর। বাঁ হাতে সুতীক্ষ্ন বর্শা।…

অশ্বারোহী মহারাজের সম্মুখে এসে অশ্ব হতে অবতরণ করে আভূমি প্রণত হয়ে ধীর-নম্র কণ্ঠে বললেঃ মহারাজ! অধীনের অপরাধ মার্জনা করবেন। জনতার মধ্য হতে আমিই লোকটির অকৃতকার্যতায় হেসেছিলাম।

মহারাজ তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে অশ্বারোহীর দিকে তাকিয়ে,…কোথায় একে তিনি বুঝি দেখেছেন। কোথায়? কবে?

বাবা!…

কন্যার ভয়মিশ্রিত আকুল কণ্ঠস্বরে মহারাজ চমকে কন্যার দিকে মুখ ফেরালেন।

কে বাবা? এ কে?

কে তুমি?…তোমার পরিচয় কী?…

পরিচয়!…আমি একজন সামান্য তীরন্দাজ!…তীরের খেলা দেখানই আমার পেশা।…দেশে দেশে আমি তীরের খেলা দেখিয়ে বেড়াই; এর চাইতে বেশী কোন পরিচয় আমার নেই। আজ ঘুরতে ঘুরতে আপনার রাজ্যের সীমান্তে এসে শুনলাম, এখানে নাকি আজ তীরোৎসব, তাই ছুটে এসেছি।

পার তুমি ঐ চক্রমধ্যাস্থিত মৎস্য-চক্ষু বিঁধতে?

মহারাজের আদেশ হলে ওত' সামান্য।…এমন সময় সহসা সোঁ-সন্-সন্ শব্দ শোনা গেল। এক ঝাঁক বুনো হাঁস নিস্তরঙ্গ বায়ু-সমুদ্রে পাখার বাতাসে আলোড়ন তুলে উত্তর দিকে উড়ে চলে গেল। প্রতিবৎসর এমনি সময় শীতের শেষে বুনো হাঁসের দল পাহাড়ের দিকে উড়ে চলে যায়। সেই রজতস্নাত সুনীল আকাশ-পটে ক্রমে বিলীয়মান উড়ন্ত হংস-সারির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তীরন্দাজ বললে, মহারাজ ঐ একদল বুনো-হংস সার বেঁধে উড়ে গেল!

আপনার যদি অনুমতি হয় তবে ঐ উড়ন্ত হংস-সারি হ'তে যে কোন একটি হংসকে আমার তূণের তীর দিয়ে বিঁধে মাটিতে এনে ফেলতে পারি।…

মহারাজ বললেন: এও কি সম্ভব?

ভার্গব ব্যঙ্গ স্বরে বললে: আর যদি না পার?

যদি না পারি…তবে চির-জীবনের মত আমি আমার হাতের বর্শা ও তীর-ধনুক ত্যাগ করব…আর যে শাস্তি দিতে চান তাই মাথা পেতে নেবো।… মহারাজ! আজ্ঞা করুন।

মহারাজ আদেশ দিলেন!

তখন সেই অচেনা তীরন্দাজ তার কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে তূণ হতে একটি তীর বাছাই করে নিল।

এমন সময় দূরে দেখা গেল; এক সারি হংস অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে রজোতস্নাতো আকাশের কোলে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে; যেন একখানা সাদা বক্ররেখা।

সমগ্র দর্শকবৃন্দ উৎকণ্ঠিত-ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেই আকাশপথে উড়ন্ত হংস-শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে!…ক্রমে সেই হংস-শ্রেণী বাতাসে পাখার সন্ সন্ শব্দ জাগিয়ে এগিয়ে আসছে,…ক্রমে কাছে, আরো কাছে, একেবারে…এই বুঝি মাথার উপরে এল!…সহসা যেন এক যাদু-মন্ত্রে সেই হংস-শ্রেণী চারদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল! চন্দ্রকরোস্নাত নিস্তব্ধ আকাশ-পথে হংসের কাকলীতে ভরে গেল এবং একটা হংস সকলের চোখের সামনে তীরবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে অদূরে মুক্ত ময়দানে এসে ছিট্‌কে পড়ল!

মুক্ত দর্শকজনার মধ্য হতে জয়ধ্বনি উঠল, সাবাস্! সাবাস্!…মহারাজ নিজের কণ্ঠস্থিত বহুমূল্য সুবর্ণ হার খুলে সেই বিজয়ী তীরন্দাজের দিকে

নিক্ষেপ করলেন।

সসম্ভ্রমে মাটি হতে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ হার তুলে নিয়ে বারেকের তরে ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করে এক লাফে নিজ অশ্ব-পৃষ্ঠে উঠে বসল এবং পরক্ষণেই অশ্বপৃষ্ঠের কষাঘাত করে বিদ্যুৎ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(নিরুদ্দিষ্ট কুমার)

আগাগোড়া সমগ্র ঘটনাটাই যেন একটা স্বপ্নের মতই মনে হয়।…বিস্ময়-চকিত জনতার মধ্যে তখন অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন উঠেছে! মহারাজ পার্শ্বে উপবিষ্ট ভার্গবের দিকে চেয়ে কী বলতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, ভার্গবের আসন শূন্য—সে সেখানে নেই! সেদিনকার তীর-উৎসব যেন কেমন বেসুরা হয়ে গেল! মাটিতে পড়ে তীরবিদ্ধ হংসটি তখনও ছট্‌ফট্‌ করছে! রাজকন্যা ইলার আদেশে একজন রক্ষী সেই তীর সমেত হংসটিকে তুলে নিয়ে এল।…

ইলা একটান দিয়ে হংসের নরম গা হতে তীরটা তুলে নিল। দেড় হাত পরিমাণ তীরটা। তীরের পেছন দিকে একটা সরু পাত বসান।

মহারাজ তীরটা হাতে নিয়ে উজ্জ্বল আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। সহসা সেই পাতের গায়ে কী একটা লেখা দেখে কৌতুহলবশে সেই দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

দেখলেন পাতের গায়ে লেখা আছে—

—"সত্যের জয় হোক।

অসত্য, অন্যায় ও পাপ ধ্বংস হোক।"

মহারাজ একদৃষ্টে সেই লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন!

সেদিনও গভীর রাত্রে পার্শ্বে শায়িত ঘুমন্ত কন্যার ক্রন্দন-শব্দে মহারাজের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুমের ঘোরেই ইলা ফুলে ফুলে কাঁদছে।…কন্যার গায়ে ঈষৎ ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন ঃ ইলা! ইলা!

ইলার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাত্রি শেষ হতে আর বড় বেশী বিলম্ব নেই। পূর্বাকাশে রাত্রির ঘোর ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রভাতী বায়ু মুক্ত বাতায়ন পথে আনাগোনা করে।

ইলার চোখের কোলে জলের স্পষ্ট রেখা।

কী হয়েছে মা ?…কাঁদছিলি কেন ?…

স্বপ্ন! আবার সেই স্বপ্ন দেখেছি বাবা! সেই কালো ঘোড়ার সওয়ার!… তীর উঁচিয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে!…বলতে বলতে সহসা ইলা থেমে গেল। কন্যার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে মহারাজ শুধালেন, কী মা ?…

জান বাবা, এ লোকটা অবিকল তীর উৎসবের সেই অচেনা তীরন্দাজের মত দেখতে। আচ্ছা বাবা! স্বপ্ন, সে কি কখনও সত্য হয় ?

স্বপ্ন আমাদের মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র। ওর মধ্যে সত্যের ছায়ামাত্র নেই। অনেক সময় আমরা যা ভাবি, মনের সেই কল্পনাই আমাদের ঘুমন্ত অচেতন মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

রাত্রি শেষের শুকতারা তখনও ভোরের আকাশের একটা প্রান্তে যাই যাই করছে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠতে লাগল। মশালচীরা প্রাসাদে ঘুরে ঘুরে রাতের প্রদীপগুলি নিভিয়ে দিয়ে গেল। ভোরের হাওয়ায় রাজোদ্যান হতে কুসুম সুবাস ভেসে আসে। রাজবাড়ীর তোরণে সানাইয়ের বুকে শুরু হলো টোরীর মধুর আলাপ।

দাসী এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

মহারাজ!

কি সংবাদ দাসী?

কাল রাত্রে ছোট কুমার দুর্জয় সিংহ ফিরে এসেছেন।

সে কি! সত্য?

মহারাজ, আমি আপনার দাসানুদাসী! এখনও তিনি নিদ্রাভিভূত। আপনি কি ছোটকুমারের কক্ষে আসবেন?

নিরুদ্দিষ্ট খুল্লতাত পুত্র কুমার দুর্জয় সিংহ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর বাদে রাজ্যে ফিরে এলেন।

সে আজ সাত বৎসর আগেকার কথা! সংগ্রাম সিংহ তখন এদেশের রাজা! সহসা একদিন তিনি গুপ্ত শত্রুর হস্তে ভীষণভাবে আহত হলেন! এবং অবশেষে সেই আঘাতই তার মৃত্যুর কারণ হ'ল! মৃত্যুকালে যুবাপুত্র চন্দন সিংহের সমস্ত ভার ও সেই সঙ্গে রাজ্যের শুভাশুভের সকল দায়িত্ব ছোট ভাই বিক্রম সিংহের হস্তে অর্পণ করে অন্তিমকালে শেষ অনুরোধ জানিয়ে গেলেন।

সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর চন্দন সিংহ নামমাত্র সিংহাসনে বসলেন; রাজ্যের সকল কিছু দায়িত্বভার বিক্রম সিংহই আপন হাতে তুলে নিলেন।

বিক্রম সিংহের পুত্র দুর্জয় সিংহ চন্দন সিংহ হ'তে বছর পাঁচেকের ছোট। চন্দন সিংহ ও দুর্জয় সিংহ দুই কুমার দুই রকমের।

রাজ্যের লোকেরা বলাবলি করে দুই কুমারের নাম দুটো অদল-বদল হয়ে গেছে। দুর্জয় সিংহ ছিল চন্দনের মত স্নিগ্ধ ও ঠাণ্ডা। স্ত্রীলোকের মত কোমল প্রাণ! কারও দুঃখ বা কষ্ট দেখলে তার দুটো নয়ন অশ্রুভারে টলমল করে উঠে। যেমন তার অন্তরখানি কোমল, কমনীয় তেমনি তার চেহারা।

সারাটি দিনমান সে কখনো অঞ্জনার কূলে যেখানে নব-দূর্বাদল শ্যামল আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে গেছে, সেখানে চিৎ হ'য়ে শুয়ে উপরের নীলাকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে অনিমিখে কী যেন ভাবে।···কখনো জ্যোৎস্না রাতে প্রাসাদের ছাতে বসে বাঁশের বাঁশী বাজায়।···কখনো বা পাহাড়ে পাহাড়ে ঝরণার গতিবেগের সাথে আপন গতিবেগটুকু মিশিয়ে দেয়। দুই বৎসরের মাতৃহারা ইলাকে নিয়ে

রাজ-উদ্যানে খেলা করে!...যেন এক টুকরো আনন্দ, কলহাসির মূর্চ্ছনা, সঙ্গীতের রেশটুকু!

পুত্রের এই শান্তশিষ্ট আচরণে বিক্রম সিংহ রাগে, দুঃখে, লজ্জায় দিবারাত্র গুমরে গুমরে ওঠেন!...তিনি চান, পুত্র তার হোক সত্য সত্যই দুর্জয় ও দুর্বার।...প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পলে সে মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি দাঁড়াক।...আর চন্দন সিংহ, সুবিশাল চেহারা, বলিষ্ঠ পেশল দেহাবয়ব—তীক্ষ্নবুদ্ধি, দুর্বার গতি, শরীরে যেমন শক্তি, বুকে অসীম সাহসও তেমনি! দেশের লোক সম্ভ্রমে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। চন্দন সিংহ ও দুর্জয় সিংহকে দেখলে তারা যে একই মায়ের সন্তান নয় বোঝা দুষ্কর!...

চন্দন সিংহের অপরিমিত সাহস ও দুর্নিবার শক্তির দিকে তাকিয়ে দুর্জয় সিংহের মাথা আপনি নত হ'য়ে আসে।

দুর্জয় সিংহের বিনীত নম্র ও একান্ত নিরীহভাব দেখে মাঝে মাঝে চন্দন সিংহ তার বলিষ্ঠ হাত দুটো দিয়ে ছোট ভাইয়ের শরীরে এক বিশাল ঝাঁকুনী দিয়ে বলেনঃ ওরে তুই যে দুর্জয় সিংহ! তোর মাঝে আমি চাই, উদ্দাম, উচ্ছৃংখল, স্বাধীন বেপরোয়া মনোবৃত্তি। কেন তুই এমনি মৌন? কেন অন্যের চোখে জল দেখলে তোর চোখে জল ভরে আসে?...কেন তুই ভুলিস্ তুই রাজার ছেলে? দাদার কথায় দুর্জয় সিংহ হাসেঃ বলে, ভয় কি আমার!...মহারাজ চন্দন সিংহ যা'র দাদা।...সিংহের গুহায় বাস করে কেউ কি কখনও বনের পশুকে ডরায়?...

চন্দন সিংহ ছোট ভাইটির কথায় হাসতে থাকেন।

চন্দন সিংহ যখন পুরোপুরিভাবে সিংহাসনের সকল কিছু দায়িত্ব নিজস্কন্ধে তুলে নিলেন, তখন মাঝে মাঝে হয়ত দুর্জয়কে ডাকতেন, দুর্জয়! এসো, আমার রাজকার্যে সাহায্য কর!...

ও বাবা; মুখ প্যাঁচার মত গম্ভীর করে সিংহাসনে বসে যত রাজ্যের নালিশ আর অভিযোগ শোনা আমার ধাতে সইবে না, দাদা! আর রাজ্যের লোকগুলির কি খেয়ে দেয়ে আর কাজ থাকে না? চুরি-জোচ্চুরি; খুন-জখম একটা না একটা নিয়ে আছেই। এতও পারে তোমার প্রজারা।

দুর্জয় সিংহ অশ্বশালা হতে তার প্রিয় শ্বেত অশ্ব মুকুট-এর পিঠে চড়ে দূরে বনের দিকে চলে যান। অদ্ভুত ঘোড়াটি দুর্জয় সিংহের! দুধের মত সাদা ধব্‌ধবে রং—তৈলের মত মসৃণ!...মাছি বসলেও বুঝি পিছলিয়ে যায়! রেশমের মত পাতলা ও কোমল ঘাড়ের লোমগুলো। নীল দুটি চোখ।

দুর্জয়ের কথা ও বুঝতে পারে। প্রভুর পায়ের শব্দ পেয়েছে কি আর রক্ষা নেই, হ্রেসারব করে ঘাড়টি বাড়িয়ে দেয়। গভীর স্নেহে প্রিয় অশ্বের মসৃণ গায়ে দুর্জয় হাত বুলাতে থাকেন—মুকুট প্রভুর আদরটুকু যেন সম্যক উপলব্ধি করে, ঘাড়টি বাড়িয়ে দিয়ে প্রভুর গলায় নিজের মুখটা ঘষতে থাকে।

চন্দন সিংহের সুশাসন সত্ত্বেও রাজ্যের চতুর্দিকে অভিযোগ, অত্যাচারের শত করুণ কাহিনী দিবানিশি রাজার কানে ভেসে আসে।

সেনাপতি সিংহবাহন ও মন্ত্রী ভার্গব !

মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন ঃ কেন অত অভিযোগ সিংহবাহন ?…কেন এত কান্না ?…কী তাদের চাই ?

সেনাপতি ও মন্ত্রী একই সুরে কণ্ঠ মিলায় ঃ ছোটলোক যে চিরকালই ছোটলোক মহারাজ ! ওদের অভিযোগ বা কান্নার কোন হেতুই নেই ; অভিযোগ তুলে কাঁদাই ওদের স্বভাব।

কিন্তু ?

মহারাজ, ইচ্ছা হলে নিশীথে নগর পরিদর্শন করুন।

মিথ্যা যা তা চিরদিন ঢেকে রাখা যায় না সিংহবাহন !…সত্যের আলোর স্পর্শে তার স্বরূপ একদিন প্রকাশ হয়ে পড়েই। আমি দেশের রাজা। বিলাসিতা করে শুধু মাত্র কর্মচারীদের উপর সকল কিছুর ভার দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে কাল কাটান আমার ধর্ম নয়। আমি দেখব, আমি শুনব, ওদের দুঃখ কোথায় ? কেন ওদের চোখে জল ?…কী ওরা চায় ?

দুর্জয় সিংহের কানেও প্রজাদের কান্নার সুর এসে পৌঁছায়। সে এসে চন্দন সিংহের কাছে অভিযোগ তোলে, তোমার রাজ্যে অত অনিয়ম কেন দাদা ?

চন্দন সিংহ শিউরে উঠেন। গোপনে গোপনে সন্ধান নেন !…

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ দেখা দেয় ! বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল তার চারদিকে ঘিরে এসেছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের জাল-এর দড়ি ধরেছেন স্বয়ং পিতৃ-সহোদর বিক্রম সিংহ ! লজ্জায় ও অনুতাপে চন্দন সিংহ অভিভূত হয়ে পড়েন !

এমন সময় সহসা একদিন শোনা গেল, বিক্রম সিংহ অনির্দিষ্ট কালের জন্য দেশভ্রমণে বের হয়েছেন। কিন্তু সেই দিনই গভীর রাত্রে মহারাজের গোপন কক্ষে দুর্জয়ের ডাক এল।

রাত্রি গভীর ! প্রাসাদের এক গুপ্ত কক্ষে মহারাজ একাকী অস্থির পদে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। দুটি হস্ত তার পশ্চাতে মুষ্টি বন্ধ।

প্রদীপদানে রক্ষিত প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখাটা মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ধীর পদবিক্ষেপে দুর্জয় এসে কক্ষে প্রবেশ করল ঃ দাদা !

কে ? দুর্জয় ! এসো ভাই !

মহারাজ আবার পূর্বের মত পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন ! চন্দন সিংহ সত্যই আজ যেন চিন্তিত। বহুক্ষণ অপেক্ষা করা সত্বেও মহারাজ মৌন।

দুর্জয় আবার ডাকল, দাদা !

ওঃ ! দুর্জয় !…দুর্জয় ! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য এত রাত্রে ডেকে পাঠিয়েছি।

বলুন !

সত্য করে বল দুর্জয় ! তুমি কি সিংহাসন চাও ভাই ?…বল ! জবাব দাও ! মহারাজ এগিয়ে এসে সস্নেহে ভ্রাতার স্কন্ধে একখানা হাত রেখে গভীর আগ্রহে দুর্জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বল, আমি এতে

এতটুকুও দুঃখ পাবো না ভাই !

দুর্জয় সিংহ ত বিস্ময়ে একেবারে দিশেহারা।

এত রাত্রে কক্ষে ডেকে এনে দাদা কি তার সঙ্গে তামাশা শুরু করলেন ? এসব আবার কি কথা ? সিংহাসন চায় সে !…এ কথা ত' সে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেনি ! তবে ?

কঠিন গম্ভীর স্বরে দুর্জয় সিংহ ডাকল : দাদা !

চন্দন সিংহ চমকে উঠলেন। একি দুর্জয় সিংহের গলা ?…এত দৃঢ় কঠিন সুর কোথা হতে সে পেলে ?

দুর্জয় সিংহ তখন বলছে : দাদা ! তুমি শুধু দেশের নও আমারও রাজা এবং আমার জ্যেষ্ঠ। আমার প্রণম্য ! সত্য হোক, কিম্বা মিথ্যা হোক, যখন ভুলেও তোমার মনে ধারণা হয়েছে, আমি সিংহাসন-লোভী, তখন স্বেচ্ছায় আমি তোমার কাছ হতে দূরে সরে যাচ্ছি। তবে কোন দিন যদি আমাকে তোমার বা দেশের জন্য প্রয়োজন হয়, আমায় ডাক দিও, তা হলেই সে ডাক আমার কানে পৌঁছাবে। যত দূরেই থাকি না কেন আমার জন্মভূমির; আমার স্নেহময় দাদার ডাক আমি শুনতে পাবোই ; আমি তখনই ছুটে আসব। আজ তবে বিদায়।

সহসা নীচু হয়ে দুর্জয় ভক্তিভরে দাদার চরণতলে প্রণাম জানিয়ে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল !

বিস্মিত মহারাজের যখন সম্বিত ফিরে এল, আকুল কণ্ঠে ডাক দিলেন, দুর্জয় ! দুর্জয় ! ওরে ফিরে আয়। আমারই ভুল। ফিরে আয় !

শূন্য কক্ষে সেই আকুল মিনতিমাখা কণ্ঠস্বর করুণ ঝঙ্কারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, ফিরে আয় ! ওরে ফিরে আয় !

সেই দুর্জয় সিংহ আজ আবার সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে ফিরে এসেছে !

নবম পরিচ্ছেদ

(নিশীথ রাতের তীরন্দাজ)

দুর্জয় সিংহ আবার ফিরে এসেছে ! অভিমানী ছোট ভাইটি আবার তার দাদার কাছে এতকাল পরে ফিরে এসেছে, এ আনন্দ চন্দন সিংহ রাখবেন কোথায় !

অধীর আবেগে মহারাজ দুর্জয়ের কক্ষে ছুটে এলেন। দুর্জয় সিংহ সবে মাত্র ঘুম ভেঙ্গে শয্যার উপর উঠে বসেছে।

দুর্জয় ! ভাই !

দুর্জয় এসে চন্দন সিংহকে প্রণাম করতে গেলেন, কিন্তু তার পূর্বেই গভীর স্নেহে দুর্জয়কে আপন বক্ষে অধীর আবেগে টেনে নিয়ে অশ্রুঝরা কণ্ঠে বললেন :

ওরে! ওরে! কেমন করে এতকাল আমায় ফেলে দূরে **ছিলি ভাই!** চন্দন সিংহের দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে গেল!

বাইরে কা'র পদশব্দ পাওয়া গেল!

মহারাজ!...ভার্গবের কণ্ঠস্বর!

কে?

মহারাজ, আমি ভার্গব...

ভার্গব! এসো! এসো! ভেতরে এসো! আজ আমার বড় আনন্দের দিন ভার্গব!

দুর্জয়! দুর্জয় ফিরে এসেছে, রাজ্যে ঘোষণা করে দাও, আজ সবাই সারাদিন ধরে আনন্দ উৎসব করবে!...মহারাজ চন্দন সিংহ আজ দুই বছরের শিশুর মতই কলহাসি মুখরিত, আনন্দ-উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বলিত!...

মহারাজ! শৈবালকুমারকে গত কাল সেই অচেনা তীরন্দাজের খোঁজ নিতে পাঠান হয়েছিল।

হাঁ! হাঁ! সে তা'র কোন সন্ধান পেল?

না, মহারাজ! অশ্বারোহী বিদ্যুৎগতিতে রাজ্যের সীমান্তে গিরিবর্ত্মের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে নাকি অদৃশ্য হয়ে গেল।

যা'ক্ গে। তুমি সিংহবাহনের আর কোন সন্ধান পেলে কি?...

না মহারাজ, তারও কোন সংবাদ পাইনি।

...সেই দিন সন্ধ্যার অল্প পরে রাজ্যের সীমান্তে এক অতিথিশালায় একদল রাহী একটা ঘরের মধ্যে বসে মহারাজের তীর-উৎসবের সেই অচেনা অদ্ভুত তীরন্দাজের অত্যাশ্চর্য তীরের খেলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল।

একজন রাহী এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল; পিঠে তার একটা বোঁচ্‌কা! লোকটা ঘরে ঢুকে ওদের এক পাশে বসল। লোকটাকে দেখলে খুব শ্রান্ত বলে মনে হয়। লোকটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একটা পাশে চাদর বিছিয়ে বোঁচকাটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পথিকদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করল—কোথা হতে আসছ গা?

আসছি অনেক দূরের পথ হতে। আজ দুদিন অনাহারী আছি।...তা অতিথিশালার কর্তা বলে দিল, আহার মিলবে না; যারা নাকি সূর্যাস্তের ঠিক আগে এসে পেঁছায় তাদের ভিন্ন আর কাউকে রাত্রের আহার্য দেবার আদেশ নেই।

কে বললে একথা?

কে আবার বলবে? তোমাদের দেশের রাজারই হুকুম।

মহারাজের হুকুম! লোকটির মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এসেছে।...অত্যাচারে ও ব্যাভিচারে দেশটা ছেয়ে গেল। ঘরে ঘরে প্রজাদের চোখের জলের বিরাম নেই! মহারাজ নিজে যতটা নন, তার চাইতে সহস্র গুণ বেশী তাঁর হতভাগা কর্মচারীর দল। পরান্নে পুষ্ট, পরের শক্তির অধিকারী হ'য়ে আজ ওরা শক্তির গর্বে ফুলে উঠেছে। কুকুরের দল!

দ্বিতীয় পথিকটি তাড়াতাড়ি প্রথম পথিকটিকে বাধা দিয়ে বলে উঠল ঃ ওরে থাম! থাম…দেওয়ালেরও কান আছে। কখন ভার্গবের কানে যাবে—জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবে।

ওই কানা মন্ত্রীই ত' যত নষ্টের গোড়া।

এমন সময় খাবার ঘণ্টা পড়ল, ঢং ঢং ঢং! সকলে যে যার খাওয়ার ঘরের দিকে চলল।

প্রথম পথিক শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত রাহীর দিকে তাকিয়ে বলল ঃ চল হে! তুমিও চল। দেখা যাক বলে কয়ে যদি তোমার আহারটা জুটিয়ে দিতে পারি, আর না হলে আমার আহারটাই না হয় দু'জনে ভাগাভাগি করে খাওয়া যাবে। চল!…

রাহী আপত্তি তুলল, না—না,…তোমরা যাও!…আমার ঘুম পেয়েছে আমি ঘুমাই!…রাহী পাশ পরিবর্তন করে শুল।

ওঠ! ওঠ!…লোকটার হাত ধরে এসে পথিকটি আকর্ষণ করল। তখন অগত্যা ক্ষুধার্ত রাহী ওদের সাথে সাথে খাওয়ার ঘরে এসে প্রবেশ করল।

সার দিয়ে সকলে বসে গেছে, ওরাও এসে এক পাশে বসল।

একজন কালো কুৎসিত-দর্শন মোটা মত লোক হাতে একটা চাবুক নিয়ে এক দুই ক'রে গুণে গুণে যাচ্ছে এবং তার আদেশ মত পাচক আহার্য দিয়ে যাচ্ছে।…

পংক্তির শেষে যখন ওদের কাছে এসে দাঁড়াল, সেই ক্ষুধার্ত রাহীকে পাত পেতে বসতে দেখে লোকটা গর্জন করে উঠল ঃ এই তুই এখানে এসেছিস কেন? একটু আগে না তোকে, বলে দিয়েছি রাতের আহার তুই পাবি না? ওঠ্! যা! ওঠ্!

প্রথম পথিকটি মিনতিমাখা কণ্ঠে বললে ঃ দুটো ভাত দাও কর্তা!…ও আজ দু' দিন কিছু খায়নি।…

ও, খুব যে দরদ দেখছি…একেবারে বন্যা বহে যায়।…থাম্, বেটা চুপ কর।

তোমাদের কত আছে, ওকে দুটো দাও!

সহসা লোকটার হাতের চাবুক সপাং করে এসে পথিকের ঘাড়ের উপর আছড়ে পড়ল। লোকটা একটা অস্ফুট চীৎকার করে উঠল যন্ত্রণায়।…নীচু হয়ে হাত দিয়ে একটান মেরে পাতা সমেত ভাতগুলি চারদিকে ছড়িয়ে দিল। …যা তোরও আজ খেতে হবে না!…

পথিক উঠে দাঁড়াল ; তবে রে শয়তান!

কী, কী বললি? শয়তান!…লোকটা পাগলের মতই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হাতের চাবুক পথিকের সর্বাঙ্গে চালাতে লাগল।

পথিক আর্তস্বরে চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সহসা এমন সময় অতিথিশালার পাষাণ আঙ্গিনা খট্‌খট্, খটাখট্ ঘোড়ার খুরের আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠল! সকলে চমকে চাইল। অস্পষ্ট চাঁদের

আলোয়, সকলে দেখলে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক অশ্বে চেপে আগাগোড়া কৃষ্ণবর্ণ পোষাকে আচ্ছাদন করে কে একজন আসছে। হাতে তার তীক্ষ্ন বর্শা মুখও ঢাকা।

লোকটা চাবুক থামিয়ে দাঁড়াল।

অশ্ব হতে এক লাফে নেমে পড়ে সেই কৃষ্ণবর্ণ বেশধারী মুখোশ আঁটা লোকটা ধীর পদে এগিয়ে এল এবং কটিদেশ হতে তরবারি মুক্ত করে নিয়ে গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললে, অত্যাচারীর ধ্বংস হোক। সকলের চোখের সামনে সেই সুতীক্ষ্ন তরবারির অগ্রভাগ সেই মোটা লোকটার বুকের মধ্যে আমুল ঢুকিয়ে দিল।...

ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত ছুটে এল। লোকটা একটা করুণ দীর্ঘ চীৎকার করে ধরাশায়ী হলো।

তারপর সেই কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছেদধারী লোকটা বল্‌লেঃ আজ এই অতিথি-শালায় সকলেই পেট ভরে অন্ন পাবে।...যদি কখনও এর ব্যতিক্রম হয় তবে আবার আমি ফিরে আস্‌ব।

অশ্বারোহী ফিরে অশ্বে আরোহণ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। সমগ্র ব্যাপারটা আগাগোড়াই যেন একটা স্বপ্ন। ঘুমের মাঝে ধরা দিয়ে আবার ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে মিলিয়ে গেল। বহুক্ষণ পর্যন্ত কারও মুখে একটা কথা নেই, সকলেই নিশ্চুপ।...যেন সব বোবা হয়ে গেছে।

হঠাৎ এমন সময় একজন রাহী বল্‌লেঃ আরে এই ত' গত রাতের সেই অদ্ভুত তীরন্দাজ।...

হাঁ, এই সেই তীরন্দাজ।

তখনও দূর হতে তা'র ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে খট্‌—খট্‌—খটা—খট্‌। ক্রমে দূরে অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে রাতের নিঃসঙ্গতায় হারিয়ে যায়।

উক্ত ঘটনার পর হতে রাজ্যের যখনই যেখানে কোন অত্যাচার হয়, কোথা হতে যে হাওয়ার মত সেই অদ্ভুত তীরন্দাজ এসে হাজির হয়,—অত্যাচারীর দল সশংকিত ও ত্রস্ত হয়ে উঠে।...কখন কা'র মৃত্যু ঘনিয়ে আসে কে জানে?...

সে তীরন্দাজের হাতের তরবারি বড় নির্মম!—সে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু!—তার হাত হতে কেউ রক্ষা পায় না।—অসীম শক্তি তার দুটি বাহুতে। বুকে তার দুর্জয় সাহস, অব্যর্থ হাতের নিশানা। হাওয়ার মত গতি—মৃত্যুর মতই অবশ্যম্ভাবী!—কে এই শয়তানের যম? কে এই দরদী কালো ঘোড়ার তীরন্দাজ? যেখানে অন্যায়, যেখানে অত্যাচার, যেখানে অনিয়ম সেখানেই তার মৃত্যুর মত অমোঘ অস্ত্র লক্‌লকিয়ে ওঠে!

দশম পরিচ্ছেদ

("নীল দুর্গ")

ওগো আমার পাঠক পাঠিকা ! নীল দুর্গে তোমাদের এবার নিয়ে যাব ! এসো আমার সঙ্গে ।

মহারাজ চন্দন সিংহের রাজ্যের শেষ সীমান্তে সুবিশাল এক শাল বন। সেই শালের বন প্রায় দেড় ক্রোশব্যাপী ; সেই শালের বন পার হলে দেখবে উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী।...সেই শৈলশ্রেণীর নাম ময়ূর-কূট পর্বত। তারই পাদমূলে প্রকাণ্ড হ্রদ। হ্রদের চারপাশে ছোট বড় পাহাড় ও শাল-মহুয়ার বন। সেই হ্রদে গভীর কালো জল। নীল আকাশের ছায়া সারাটা দিনমান সেই অথৈ জলের বুকে থিরথির করে কাঁপে !...

জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলো হ্রদের কালো জলের বুকে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। গভীর রাত্রে বাতাসে মহুয়ার উগ্র গন্ধ ভেসে আসে। ঝিঁঝির করুণ ক্রন্দন রাতের সুগভীর মৌনতার ধ্যান ভঙ্গ করে। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বন-টিয়ার ঝাঁক টঁ্যা টঁ্যা করে হ্রদের উপর দিয়ে উড়ে উড়ে যায়।...শাল-মহুয়ার শাখায় শাখায় ও পাতায় পাতায় সোঁ-সন-সন করে দ্বিপ্রহরের করুণ উদাস বাতাস কেঁদে কেঁদে ফেরে। চারদিকে কী সুগভীর নিস্তব্ধতা !

সেই হ্রদের মাঝখানে নীল-দুর্গ।...কঠিন পাষাণে গড়ে তোলা সেই দুর্গ। হ্রদের জল দুর্গের পাদমূলে ধৌত করছে। দুর্গে আসতে হলে দুর্গের ভেতরে নৌকো আছে তাইতে চেপে আসতে হয়। এই দুর্গ মহারাজ চন্দন সিংহের।

চল, এবারে আমরা দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি !...একটু দাঁড়াও, দুর্গে প্রবেশ করবার আগে তোমাদের এই উপন্যাসেরই গোড়াকার কাহিনীর খানিকটা শুনিয়ে দিতে চাই।

শোন !...আমি বলছি সেই রাত্রির কথা। মনে পড়ে ? সেই পাঁচ বৎসর আগেকার এক রাত্রি। যে রাত্রে মহারাজ চন্দন সিংহ দুর্জয় সিংহকে তার নিভৃত কক্ষে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমরা জানি—দুর্জয় সিংহ দাদার উপর বুক-ভরা অভিমান নিয়ে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। মহারাজের কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দুর্জয় সোজা মহারাজের শয়ন কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলো।

ঘুমন্ত ইলার কপালে একটি মৃদু চুম্বন দিয়ে মনে মনে বলল ঃ ইলা না জানিয়েই যাচ্ছি মা ! তোকে জাগালে তুই আমায় ছাড়তিস্‌নে, তাই তোকে না জানিয়েই যাচ্ছি মা ! চোখের কোল দুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসে, দুর্জয় কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দ্রুত পা চালিয়ে সোজা আপন কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল। দেওয়ালে ঝুলানো স্বীয় তরবারিটা নিয়ে বের হয়ে এল।

অশ্বশালায় প্রবেশ করে প্রিয় অশ্ব মুকুটের গায়ে হাত দিতেই, মুকুট মৃদু হ্রেষারব করে মাটিতে পা ঠুকতে থাকে !...

ঃ মুকুট ! দাদা আমায় অবিশ্বাস করেছেন, আর ত আমার এখানে থাকা

চলে না। যেখানে বিশ্বাস নেই সেখানে দুর্জয় সিংহ নেই। মুকুটের পৃষ্ঠে আরোহণ করে ধীরে ধীরে অশ্বশালা হতে বেরিয়ে এল !

ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চাঁদ আকাশের একটি প্রান্তে তখন যাই-যাই করছে ! অস্পষ্ট বিলীয়মান চন্দ্রালোকে সুবিশাল রাজপ্রাসাদ একটুকরো স্বপ্নের মতই মনে হয়। দুর্জয় বার বার ফিরে ফিরে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখের কোল দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। বিদায় ! ওগো আমার জন্মভূমি, বিদায় !… অবিশ্বাসী সন্তানকে বিদায় দাও মা !…

কদমে কদমে পা ফেলে ফেলে মুকুট এগিয়ে চলে। প্রভুর মনোবেদনা আজ বুঝি তারও পশু-হৃদয়ে দোলা দিয়ে গেছে।

ভারাক্রান্ত চিন্তিত মন ! শুধু থেকে থেকে অভিমানে বুকখানা অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে !

বহুক্ষণ হতেই ছায়ার মত একজন লোক অলক্ষ্যে কুমারকে অনুসরণ করে আসছিল। এখন কুমারকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে অগ্রসর হতে দেখে সে দ্রুত দৌড়িয়ে পুনঃ অশ্বশালায় ফিরে আসে এবং একটি তেজী বাছাই করা অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করে অন্য পথে অশ্ব ছুটিয়ে দিল। দুটো পথ এসে এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে মিশেছে।

লোকটি দুর্জয় সিংহের বহু পূর্বেই অশ্বত্থ-মূলে এসে হাজির হলো এবং সেই অশ্বত্থ বৃক্ষে আরোহণ করে দুর্জয় সিংহের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।…

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দুর্জয় সিংহ ঘোড়ায় চেপে সেখানে এসে হাজির হলো !…ঠিক যে সময়ে সে বৃক্ষের তলদেশে এসে উপস্থিত হয়েছে সহসা উপর হতে একখানা কালো মোটা চাদর ঝুপ্ করে এসে তাকে একেবারে আচমকা ঢেকে ফেল্‌লে। সমগ্র ব্যাপারটা এত চকিত ও এত আকস্মিক ঘটে গেল যে, দুর্জয় সিংহ প্রথমটা অত্যন্ত হকচকিয়ে গেল ; এবং কিছু বুঝে উঠবার আগেই অশ্বপৃষ্ঠ হতে তার দেহ ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

এতক্ষণে দুর্জয় সিংহ বাধা দিতে গেল, কিন্তু বৃথা !…চারদিক্ হতে চাদরটা এখন তাকে চেপে ধরেছে, মুক্তির আর কোন উপায়ই নেই।…আবার ধীরে ধীরে তাকে সেই অবস্থায়ই নামানো হলো।…তারপর অশ্বের পৃষ্ঠে ঝুলিয়ে অশ্বকে কষাঘাত করে অশ্ব ছুটিয়ে দেওয়া হলো !…

বহুক্ষণ এমনি করে দৌড়াবার পর, এক সময় কারা যেন এসে তাকে অশ্বপৃষ্ঠ হতে নামিয়ে স্কন্ধে তুলে নিল।…

তারপর সে টের পেল তাকে নিয়ে নৌকায় চাপানো হয়েছে, বৈঠায় জল কাটার শব্দ পাওয়া যায় !…

এরপর আবার তাকে কারা যেন কাঁধের উপর তুলে নিল। একটা ভারী লৌহ-কবাট খোলার শব্দ পাওয়া গেল। কঠিন পাষাণের উপর দিয়ে কারা তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ; পাষাণের গায়ে তাদের নাগড়ার শব্দ খট্ খট্ আওয়াজ তোলে !…এরপর আবার দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল এবং কারা তার উপরের চাদরটা খুলে নিল !

চোখ মেলে দুর্জয় সিংহ দেখলে, একটা ছোট ঘরে তাকে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ঘরের চারপাশে পাষাণে গাঁথা দেওয়াল। ছোট্ট একটা বাতায়ন, সেই বাতায়ন-পথে প্রথম ভোরের রাঙা আলোর একটুখানি এসে উঁকি দিচ্ছে।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে একজন প্রৌঢ়। মাথার চুলগুলি কাঁচা-পাকায় মিশানো। বলিষ্ঠ দেহের গঠন। মুখটা যেন পাথরের কুঁদে তোলা। ভাবের কোন লেশ মাত্র নেই !

তুমি কে ? দুর্জয় সিংহ জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা কোন জবাব দিল না। পুনরায় দুর্জয় সিংহ জিজ্ঞাসা করল ঃ শুনছো। তুমি কে ?...এবারেও লোকটা নিশ্চুপ। দুর্জয় সিংহ এগিয়ে এসে লোকটার সম্মুখে এসে আবার কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলে ঃ শুনছো ! তুমি কে ? শীঘ্র জবাব দাও, না হলে ..দুর্জয় সিংহ কোষ হতে অসি মুক্ত করতে গেল।

এতক্ষণে লোকটা হাঁ করে নিজের মুখের দিকে দুর্জয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। দুর্জয় সবিস্ময়ে দেখল, লোকটার জিহ্বা নেই। বুঝলে লোকটা বোবা। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়াল। তখন হ্রদের কালো জল প্রথম ভোরের আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলতে শুরু করেছে।

লোকটা কক্ষের দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল।

সমগ্র শরীর জুড়ে গভীর অবসন্নতা। বাতায়ন পথে হ্রদের বক্ষ হতে সুশীতল বায়ু বহে আসে।...ঘুম-জাগা বুনো পাখীর কল-কাকলীতে শাল-মহুয়ার বন মুখরিত হয়ে ওঠে। হ্রদের কালো জলে রৌদ্রের আভা চিক্‌চিক্ করে রুপালী স্বপন জাগায়। এ তাকে কোথায় আনা হয়েছে ?...কারাইবা তাকে এখানে আনলে ? কেনই বা তারা এমনি করে ধরে আনলে ? নানা চিন্তা একটার পর একটা জাল বুনে চলে দুর্জয় সিংহের মনে। পরিশ্রান্ত দেহ-মন ভেঙ্গে আসে, দু'চোখের পাতায় পাতায় ঘুমের ঢুলুনী নেমে আসে। দুর্জয় ধীরে ধীরে বাতায়নের ধার হতে সরে এল।

ছোট একটা লোহার খাটিয়া, সামান্য শয্যা তার উপরে বিছানো। শিয়রে ক্ষুদ্র উপাধান, দুর্জয় এসে শয্যার উপরে আপন দেহভার এলিয়ে দিল।

নিদ্রা ভাঙ্গল যখন পূবের সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে ; দিনান্তের শেষ রক্তিমাভ রশ্মিগুলি নীল দুর্গের কালো পাষাণ গাত্রে ও হ্রদের কালো জলে হোলি উৎসব লাগিয়েছে। শাল-মহুয়ার বনে পাখীর কিচিরমিচির শব্দ শোনা যায়।

একটা বুড়ী এসে ঘরে প্রবেশ করল ঃ ঘুম ভাঙ্গল রে ! কিছু খাবিনে বেটা ?

সত্যই বত্রিশ নাড়ীর পাকে পাকে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়।

হাঁ খাবো। তার আগে স্নান করতে চাই।

আয় আমার সঙ্গে।

বুড়ীর পিছু পিছু দুর্জয় কক্ষের বাইরে এল। সামনেই একটা আঙ্গিনা, কঠিন পাষাণে তৈরী। চতুষ্পার্শ্বে দু' মানুষ সমান উঁচু পাষাণ প্রাচীর। ঠাণ্ডা জলে স্নান করে শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। বুড়ী আগে হতেই ভাত তৈরী

করে রেখেছিল। পেট ভরে দুর্জয় আহার করল।

চতুর্দশীর চাঁদ আকাশের এক প্রান্তে দেখা দিয়েছে। রাতের নিঃসঙ্গতা হ্রদের জলে ও দুর্গের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে বুনো পাখীর ডাক শোনা যায়।

দুর্জয় আসবার সময় বাঁশীটা এনেছিল, সেটা জামার মধ্যেই ছিল, দুর্জয় বাঁশীটা নিয়ে আঙ্গিনায় এসে বসল। ধীরে ধীরে বাঁশীতে ফুঁ দিল।

এমনি করেই দুর্জয়ের একটা একটা করে সাতটা দিন ও সাতটা রাত্রি কেটে গেল। সারা দিন বুড়ীর সাথে বকর বকর করে নানা গল্প করে।

বুড়ী রান্না করে—তিনজনে মিলে খায়। বুড়ী নিজে, দুর্জয় ও সেই বোবা ভৃত্যটা। দুর্গে মানুষের মধ্যে ওরা তিনজনই। আর ত কেহই নেই।

গভীর রাত্রে দুর্জয় বাঁশীতে ফুঁ দেয়, বাঁশীর করুণ সুর আঁধারের গায়ে গায়ে মায়া জাল রচনা করে।

রাত্রি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে বিশ্বচরাচর করুণ নিঃসঙ্গতায় ভরে উঠে। শাল-মহুয়ার বন হতে বনমর্মর ও রাতজাগা পাখীর ডাক মাঝে মাঝে ভেসে আসে। হ্রদের কালো জলে রাতের আঁধার থম্ থম্ করতে থাকে। বাঁশীর সুর কেঁদে কেঁদে ফিরে। বোবা চাকরটা বাঁশী শুনতে শুনতেই হয়ত এক পাশে ঘুমিয়ে পড়ে।

বুড়ী এসে ডাকে—ওরে শুবি আয়!···

বাঁশী থামিয়ে দুর্জয় শুতে যায়।

এমনি করেই বর্ষা এল, অবিরাম অবিশ্রাম বর্ষার বারি ঝর-ঝর করে প্রকৃতির বুক বেয়ে ঝরতে থাকে।···মেঘের কালো ছায়া হ্রদের কালো জলে ঘনিয়ে আসে।···গুরু গুরু দেয়ার ডাক নীল দুর্গের পাষাণ গাত্রে ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠে। সোঁ সোঁ বাদল বাতাস হ্রদের জলে ঢেউ তুলে যায়। বনযুঁইয়ের গন্ধ বাদল বাতাসে ভেসে আসে; ডাহুক-ডাহুকী ডেকে ডেকে উঠে! বর্ষা গেল, এলো শরৎ। আকাশে লঘু সাদা পেঁজা তুলার মত মেঘগুলি পাল তুলে ছুটাছুটি করে ফেরে।···হ্রদের ধারে ধারে কাশ গাছে অজস্র সাদা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। হাওয়ায় দোল খেয়ে হ্রদের কালো জলে কাশ ফুলের ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠে।···শরতের সোনালী রোদ হ্রদের জলে ঝিল্‌মিল্ করে হেসে উঠে! তারপর এল শীত। শাল-মহুয়ার গাছে গাছে শুক্‌নো পাতা-ঝরার পালা শুরু হয়। উত্তরে হাওয়া শরীরের মধ্যে কাঁপন জাগিয়ে গেল। এর পর বসন্ত। মহুয়ার গাছে অজস্র হলুদ ফুল ফুটে উঠ্‌ল।

দক্ষিণ পবনে মহুয়ার উগ্র গন্ধ মাতাল করে দিয়ে গেল। পাপিয়ার আকুল-কান্না কণ্ঠস্বর আকাশের বুকে ধ্বনিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এমনি করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস গিয়ে বছরও ঘুরে এল।

তারপর একদিন দুর্জয় সিংহ বুড়ীকে বল্‌লে, এমনি করে ত' আর দিন কাটে না বুড়ী মা!

কি করবি বল বাছা?...

যা হয় একটা কিছু...বসে থেকে থেকে হাড়ে যে আমার ঘুণ ধরে গেল।

শেষকালে একদিন দেখ্‌বি তোর মত চোখের দৃষ্টি হয়ে এসেছে ক্ষীণ, গায়ের চামড়া গেছে ঝুলে। চলতে গেলে শরীর বেঁকে যায়...বল্‌তে বল্‌তে দুর্জয় হা হা করে হেসে ওঠে।

বুড়ী সঙ্গে সঙ্গে হাসতে থাকে।

বোবা চাকরটা সেও হাসিতে যোগ দেয়।

পরের দিন হতে দেখা গেল তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে দুর্জয় সিংহ দূরের একটা কাঠের গুঁড়িকে লক্ষ্য করে হাতের নিশানা ঠিক্‌ করছে।...এরপর হতে দুর্জয় সিংহ ভোর বেলা উঠে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করত, তারপর সারাটা দুপুর তীর-ধনুক ও বর্শা নিয়ে মেতে থাকত, এবং রাত্রে বাঁশী নিয়ে তাতে ফুঁ দিত।

মাস ছয়েকের মধ্যেই কোথায় গেল দুর্জয়ের সেই নারী-সুলভ কমনীয় কোমল চেহারা। বুকের ও হাতের মাংসপেশী সজাগ হয়ে উঠ্‌ল!...হাতের নিশানা হলো অব্যর্থ। চোখ বুজে আজকাল দুর্জয় লক্ষ্যভেদ করতে পারে। বন্দী-জীবনের সকল বাঁধন ও গণ্ডীকে দু'পায়ে থেঁতলে অস্বীকার করে ওর দেহ ও মন বাইরের মুক্ত প্রকৃতির দিকে আকুল হয়ে ছুটে যেতে চায়।

মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে কে যেন বুড়ীর কাছে আসত,...দুর্জয়ের সকল খবর নিয়ে যেত ও ওদের আহার্য দিয়ে যেত।

সেদিনও গভীর রাত্রে পাশের ঘরে কার কণ্ঠস্বরে দুর্জয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

(দুর্গের গুপ্ত দ্বার)

কে যেন পাশের ঘরে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বুড়ীর সঙ্গে কথা বলছে। আজ কিন্তু দুর্জয় সিংহ তার কৌতূহল কোন মতেই চেপে রাখ্‌তে পার্‌লে না। ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে দেওয়ালের গায়ে এসে কান পেতে দাঁড়াল।...

ছোঁড়াটা কি বলে? পাখী পোষ মান্‌ল?

একি! এ কার কণ্ঠস্বর!...এ স্বর ত দুর্জয় সিংহের অপরিচিত নয়।...

বুড়ী জবাব দিল,—না ছোঁড়া বড় লক্ষ্মী।...কোন গোলমাল নেই।

হাঁ ছোঁড়াটা ভালই; চিরদিনই ঠাণ্ডা প্রকৃতির।...আর কিছুকাল বন্দী করে রাখ্‌ব; কাজটা হাসিল হলেই ছেড়ে দেব।

হাঁ ছেড়ে দিও।...দেড় বছর ত হতে চলল; মানুষ ত!

মানুষ! যে পুরুষের দেহে পুরুষের শৌর্যবীর্য ও দুঃসাহস নেই সে আবার মানুষ নাকি? ও মরলেই বা কী, বাঁচলেই বা কী? ওর বাঁচা-মরা দুই সমান। যে মানুষ এমনি করে পঙ্গুর মত একটানা দেড় বৎসর বন্দী-জীবন যাপন করতে

পারে, তার মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে কিছু আবার আছে নাকি? যার বুকে বন্দীর হেয় জীবনের গ্লানি ধিক্কার জাগায় না···তা'র মরাই মঙ্গল।

দুঃসহ রাগে দুর্জয়ের সমগ্র শরীর কথাগুলো শুনে ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগল। ইচ্ছা হয় এক ধাক্কা দিয়ে এই পাষাণ দুর্গের প্রাচীর ধূলিসাৎ করে দেয়। দেহের সমগ্র মাংসপেশী তীব্র প্রতিবাদে স্ফীত ও লোহার মত কঠিন হয়ে উঠে। লোকটা বলছিল, চিরদিনই ও শান্তিপ্রিয়, বাঁশী বাজিয়ে আর হেসে গেয়ে ওর দিন যেত!···

তারপর আরো দু' চারটে অবশ্যকীয় কথাবার্তা বলে লোকটা বোধ হয় ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। দুর্জয় সিংহের কক্ষের পাশ দিয়েই নাগরার খট্ খট্ আওয়াজ কানে ভেসে আসে। দুর্জয় চকিত হয়ে উঠ্‌ল। তবে কি কক্ষের পাশ দিয়ে কোন চলাচলের গুপ্ত পথ আছে! নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ও যতদূর জানে ওখানে ত হেঁটে যাওয়ার মত জায়গা নেই, একেবারে খাড়া পাষাণ প্রাচীর হ্রদের গা হতে ঠেলে উঠেছে। তবে?

নানা চিন্তার আশা ও দুরাশায় সে রাত্রির বাকীটুকু দুর্জয়ের দু' চোখের পাতায় আর ঘুমই এলো না।

পরের দিন বুড়ী যখন দৈনিক আহার্য প্রস্তুত নিয়ে ব্যস্ত তখন দুর্জয় এসে চুপিচুপি বুড়ীর কক্ষে প্রবেশ করল। এ কক্ষে এর পূর্বেও বহুবার প্রবেশ করেছে, তখন এতটুকু কৌতূহল ছিল না তার অন্তরে। আর আজ?···

নীল দুর্গের পাষাণ প্রাকারের ওপার হ'তে নীল আকাশের গহন নিলীমা হতে মুক্ত বাতাসে ভেসে আসে মুক্তির অস্পষ্ট স্বর।···যে স্বর যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার সুকঠিন লৌহ শৃংখল ছিঁড়ে ফেলবার সাহস ও অপরিসীম শক্তি পরাধীন অসহায়ের বুকে জাগিয়ে গেছে,···হাস্‌তে হাস্‌তে জীবন দিয়ে মৃত্যুকে বুক পেতে নেবার মন্ত্র জুগিয়েছে···সেই সুর আজ বন্দী দুর্জয়ের কানে এসে পেঁাচেছে।···

বুড়ীর কক্ষ দুর্জয়ের কক্ষ হ'তে বড়ই হবে। হ্রদের দিকে মাঝারী গোছের একটা জানালা, তাতে মোটা মোটা লোহার শিক্ বসানো। দুর্জয় জানালার মোটা মোটা শিকগুলি দু'হাত দিয়ে ধরে এসে দাঁড়ালো। হ্রদের কালো জলে সূর্যের আলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে নানারূপে বিভক্ত হয়।

ওপারে শাল-মহুয়ার বনে পাখীর কিচির-মিচির শব্দ শোনা যায়।···এক ঝাঁক্ বন-টিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডাকতে ডাকতে হ্রদের জলে ছায়া ফেলে ও-পাশের বনে উড়ে গেল।

সমস্ত কক্ষটাই তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিয়ে দুর্জয় নানাভাবে ঘুরে ফিরে দেখ্‌ল। না, কোথাও কোন গুপ্ত দ্বার বা তেমন কিছু নেই!···কঠিন পাষাণের দেওয়াল। এই লৌহ গরাদ। দুর্জয় দু'হাত দিয়ে দুটো গরাদ চেপে ধর্‌ল।

শরীরের বল প্রয়োগ করতেই গরাদ দুটো যেন হাতের মুঠোর মধ্যে কেমন নরম হয়ে আসে! নিয়মিত ব্যায়ামে তিল তিল করে যে শক্তি আজ তার শরীরে

প্রতি মাংসপেশীর কোষে কোষে সঞ্চিত হয়েছে, সামান্য লৌহ গরাদের বাধা আজ তার কাছে কিছুই নয়! অধীর আনন্দ ও উত্তেজনায় দুর্জয় সিংহের সমস্ত শরীর ঘন ঘন কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হতে থাকে।

সে ত অনায়াসেই এই গরাদ ভেঙ্গে ফেলে দুর্গের বাইরে যেতে পারে। কে আজ তাকে আটকাবে? তার এই বলিষ্ঠ দেহ ও মনের মুক্তি পিপাসা উত্তাল তরঙ্গের মত সকল কিছু বাধা ও বিপত্তি কাটিয়ে বাইরের মুক্ত বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে ছুটে যেতে চায়। এ তরঙ্গ রোধ করবে কে?

কিন্তু না!···তাহলে এতদিনকার তার যে প্রাণ-ঢালা সাধনা সবই হয়ে যাবে ব্যর্থ।···আজ তা'র সমগ্র মনখানি জুড়ে যে আশার স্বপ্ন-জাল রচিত হয়েছে সবই অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে। অধীর মনকে সে শান্ত করলে।

এরপর হতে দুর্জয় সিংহের আর একটা কাজ হলো—এই দুর্গ হতে বাইরে যাওয়ার গুপ্ত পথটিকে খুঁজে বের করা। তা'র মনে কেমন যেন একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে, এই দুর্গের গুপ্ত পথ নিশ্চয়ই আছে।···কিন্তু সেটা কোথায়?···কোন্ দিকে?

মানুষের একনিষ্ঠ সাধনাই চিরকাল মানুষকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ এগার দিন খুঁজতে খুঁজতে সেদিন দ্বিপ্রহরে—প্রশস্ত আঙ্গিনাটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তার একধারে প্রকাণ্ড লৌহ কবাট। সেটার দুই মাথায় দুটো প্রকাণ্ড মোটা মোটা শিকল আঁটা। সেই শিকল দুটো কবাটের মাথায় পাষাণ গাত্রে দুটো লৌহ বলয়ের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে একটা মোটা শিকলের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে,···সেই মোটা শিকলটা টেনে এনে একটা লোহার চাকার গায়ে জড়ানো। এই চাকাটা ঘোরালেই আস্তে আস্তে সেই প্রকাণ্ড লৌহ কবাটটা নেমে এসে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ-পথ করে দেয়!···কিন্তু সেই চাকায় প্রকাণ্ড একটা তালা আটকানো। দুর্গের প্রাকার আগাগোড়া সব চৌকো পাথর দিয়ে গেঁথে তোলা। সেই প্রকাণ্ড লৌহ কবাটের ডান দিকেই দুর্জয় গুপ্ত পথ আবিষ্কার করলে এবং সেও বড় অদ্ভুতভাবেই আবিষ্কৃত হয়ে গেল।

বর্শা নিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে করতে সহসা এক সময় হাতের বর্শা ছিট্‌কে লৌহ কবাটের পাশে এসে দুর্গ প্রাকারের পাষাণ গাত্রে বিঁধে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে সেই চৌকো পাথরটা আপনা হতেই ঘুরে গিয়ে আবার যথাস্থানে সন্নিবেশিত হলো! পাথরের গায়ে বর্শা বিঁধে এও কি সম্ভব? দুর্জয় ত বিস্ময়ে একেবারে অবাক! একি আশ্চর্য!···খানিকক্ষণ সে হাঁ করে রইল; তারপর এক সময় দুরু দুরু বক্ষে সেই প্রাকারের দিকে অগ্রসর হলো। মনে মনে যথেষ্ট সন্দেহ ও দ্বিধা নিয়ে সেই চৌকো পাথরের উপর একখানা হাত রাখলে, তারপর ধীরে একটু চাপ দিতেই আশ্চর্য···পাথরখানা ঘুরে গেল। পাথরখানা ঘুরতেই দুর্জয় সিংহ বিস্মিত হয়ে দেখল, সামনে এক হাত পরিমাণ একটা চৌকো পথ প্রকাশিত হয়েছে। বিস্ময়ে আনন্দে দুর্জয় চোখ দুটো বুজিয়ে ফেললে। চকিতে ফিরে দেখলে, আশে পাশে কেউ আছে কি না! না, কেউ নেই। বোবা চাকরটা তার ঘরে ঘুমুচ্ছে, আর বুড়ীও ঘরে নিদ্রাভিভূত।

দুর্জয় বুঝলে, সেই চৌকো পাথরটা ঠিক আসলে পাথরের মত দেখ্‌তে হলেও সেখানা পাথর নয়, ভারী শাল কাঠের তৈরী, এবং তার রং অবিকল পাথরের গায়ের রংয়ের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, কার সাধ্য যে পার্থক্য টের পায়।

তাড়াতাড়ি সেই চৌকো কাঠটার গা হতে বর্শাটা টেনে খুলে নিয়ে দুর্জয় সিংহ নিজের ঘরে ফিরে এল।

অধীর আগ্রহে সে রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল। আজ যেন সময় আর কাটে না! ধীরে ধীরে এক সময় সাঁঝের কালো ছায়া হ্রদের কালো জলে ও দুর্গের পাষাণ গাত্রে ছড়িয়ে পড়্‌ল।

গভীর রাত্রে বোবা ভৃত্য ও বুড়ী অঘোরে তখন ঘুমোচ্ছে। দুর্জয় সিংহ পা টিপে টিপে চোরের মত রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কক্ষের বহির্দেশে এল। বাইরে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠেছে। স্বল্প আলো-আঁধারেতে বিশ্বচরাচরের চোখের পাতায় পাতায় নিদ্‌ নেমেছে। তারায় ভরা নিশীথের আকাশ আঁধারের কোলে বিবশার মত শায়িত।

দুর্জয় সিংহ পায়ে পায়ে লৌহ কবাটের দিকে এগিয়ে চলল। বুকের মাঝে দুপ্‌ দুপ্‌ করে, মনে হয় সেই শব্দে বুঝি সবাই এখুনি জেগে ছুটে আসবে। সেই গুপ্ত পথের চৌকো কাঠটার গায়ে চাপ দিতেই পাথরটা ঘুরে গেল, সামনেই অন্ধকার গুপ্ত দ্বার-পথ প্রকাশিত হলো। দুর্জয় সিংহ সেই গুপ্ত দ্বার-পথে নিজের দেহ গলিয়ে দিল।

সামনেই দুর্গের পাষাণ প্রাকারের বাইরে প্রাকারের কোল ঘেঁষে আধ হাত পরিমাণ চওড়া সরু কার্নিশ! সেখান দিয়ে অনায়াসেই একজন মানুষ হেঁটে যেতে পারে।

হ্রদের গভীর কালো জলের বুকে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে উপরের আকাশের তারার ছায়া থির্‌ থির্‌ করে কাঁপে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

("মুখোশের অন্তরালে")

পাথরের সেই সরু কার্নিশ-এর পথ বেয়ে দুর্জয় সিংহ সন্তর্পণে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এগিয়ে চলল। সেই কার্নিশ যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখানে দুর্গের পাষাণ গাত্র হতে একটা সরু লোহার শিকল হ্রদের জলে নেমে গেছে! দুর্জয় সিংহ শিকলটা ধরে টান দিয়ে দেখ্‌লে, সেটা বেশ মজবুত। একটুক্ষণ কী যেন মনে মনে ভাব্‌ল, তারপর সেই শিকল ধরে ঝুলে হ্রদের জলে নাম্‌ল। হিমানীর মত শীতল জল, গা যেন কেটে যায়।

জলে নেমে সাঁতার দিয়ে নিঃশব্দে পাড় লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল।

ভিজে কাপড়-জামা সমেত ওপারে গিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অস্পষ্ট আলো-আঁধারে শাল-মহুয়ার শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় রাতের হাওয়ার শিপ্‌ শিপ্‌ পত্র মর্মর শব্দ জাগায়। মাঝে মাঝে রাতজাগা পাখীর

ডানা ঝাড়ার ঝট্‌পট্‌ শব্দ পাওয়া যায়। বহুক্ষণ ইচ্ছামত দুর্জয় সেই শাল-মহুয়ার বনে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়াল।

দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল বন্দী-জীবনের যে দুঃসহ গ্লানি ওর দেহের প্রতি রোম কূপে ছড়িয়ে পড়েছিল, আজিকার এই মুক্ত হাওয়ায় সব একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়। ভুলতে চায় ও গত দেড় বৎসরের সেই বন্দী-জীবনের পীড়িত স্মৃতি।

তারপর চাঁদ যখন রাতের শেষে দুর্গের পেছনে আপনাকে লুকিয়ে ফেললে, দুর্জয় সিংহ আবার হ্রদ সাঁতরে দুর্গের মাঝে ফিরে এল এবং বাকী রাতটুকু সে আজ বহুদিন বাদে গভীর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটালো।

পরের দিন প্রত্যূষে যখন দুর্জয় সিংহের নিদ্রা ভাঙ্গল—সমগ্র শরীর ও মনে একটা অসহ্য পুলকোচ্ছ্বাস ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। মুক্তির পরশ এমনি করেই মানুষের প্রতি রক্তবিন্দুতে আনন্দের সাড়া দিয়ে যায়। এর পর হতে প্রতি রাত্রেই সকলে ঘুমিয়ে পড়লে দুর্জয় সিংহ দুর্গের গুপ্ত দ্বার-পথ দিয়ে বেরিয়ে যেত। আবার ভোরের আলো আকাশে ফুটে উঠার সাথে সাথেই ফিরে আসত।

সেদিনও এমনি করেই সারাটা রাত বাইরে কাটিয়ে যখন ফিরে এসে গুপ্ত দ্বার-পথে আঙ্গিনায় পা দিতেই দেখতে পেল, অদূরে দাঁড়িয়ে বুড়ী…সহাস্য মুখে, ওর দিকে চেয়ে। প্রথমটায় দুর্জয় বেশ একটু অপ্রস্তুতই হয়ে পড়েছিল। এত দিনকার সযত্ন লুকোচুরি এমনি করে ধরা পড়ে গেল, কিন্তু বুড়ীকে হাসতে দেখে ও নিজেও না হেসে আর থাকতে পারলে না, ও হেসে ফেললে। বুড়ী হাসতে হাসতে বললে, ওরে চোর! তুমি এমনি করে রোজ রাতে পালিয়ে যাও।

বুড়ীর কাছে এগিয়ে এসে আব্দারের সুরে দুর্জয় সিংহ বললেঃ আমায় বাধা দিসনে মা! তাহলে আর আমি বাঁচবো না, এমনি করে দীর্ঘ দেড় বছরের উপর বন্দী-জীবন যাপন করে দেহ ও মনে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। তোকে ছুঁয়ে শপথ করছি, বিশ্বাস কর, দেশমাতৃকাকে স্মরণকরে শপথ করছি তোকে না বলে এ দুর্গ হতে পালিয়ে যাবো না। তো'র যা'তে বিপদ্‌ হয় এমন কাজ করব না। তোকে বাঁচিয়েই আমি চলব।

বুড়ীর দুই চোখের কোল বেয়ে তখন ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রু নেমেছে। সে দুই হাতে গভীর স্নেহে দুর্জয়কে বুকের উপরে টেনে নিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বললে, আজ দীর্ঘ কাল ধরে তুই আমার এই বুড়ো ঘুণধরা হাড়ের মধ্যে যে স্নেহের বন্যা বহিয়েছিস্‌ সে আমি ভুলতে পারব না বাবা।…ত্রি-সংসারে আমার আপনার বলতে এক ছেলে ছিল, সেও আজ বছর পাঁচেক মারা গেছে। সেও তোরই মত তীর-ধনুক ও বর্শাখেলায় ওস্তাদ ছিল; তোর দিকে চেয়ে চেয়ে আমি তারই কথা ভাবি!…তুই আমার সেই হারানো মাণিক!

দুর্জয় সিংহেরও চোখের কোল বেয়ে জল ঝরতে শুরু করেছে। লুকোচুরি করে ও পালিয়ে যাতায়াত করতে সদাসর্বদা যে একটা অদৃশ্য আশঙ্কার কাঁটা

খচ্ খচ্ করে বিঁধত। এর পর হতে সেটা আর দুর্জয় সিংহের রইল না।…

একদিন দুর্জয় সিংহ বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মা! আমাকে যখন এরা বন্দী করে এখানে নিয়ে আসে তখন আমার মুকুট-এর কী করেছিল জানিস্ কিছু?…

মুকুট!—বুড়ী জিজ্ঞাসা করল।

হাঁ! মুকুট আমার ঘোড়ার নাম।…কী চমৎকার দেখ্তে। তুই যদি একটিবার তাকে দেখতিস্ বুড়ীমা, তবে আর ভুল্তে পারতিস্ না।—দুধের মত সাদা ধবল গায়ের রং। চোখ দুটো নীল। রেশমের মত মসৃণ ও নরম ঘাড়ের লোমগুলো। পশু হলে কী হয়, সে আমার গলার স্বর চিন্ত, আমার পায়ের শব্দ শুন্লে কান দুটো খাড়া করতো।—বল্তে বল্তে দুর্জয়ের গলার স্বর স্মৃতির বেদনায় ভার হয়ে এল।

একটা সাদা ঘোড়া এই দুর্গের আস্তাবলে বাঁধা আছে বটে! মংলু ওই বোবা চাকরটা রাত্রে সেটাকে রোজ খেতে দিতে যায়!—

সত্যি!—দুর্জয় আনন্দে যেন সাতখানা হয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। তারপর নিতান্ত যেন হতাশ হয়েই বললে, কিন্তু আস্তাবলে যাওয়ার রাস্তা ত' আমার জানা নেই।

বুড়ী বল্লে, তুই যেমন এ পাশে গুপ্ত দরজায় বাইরে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করেছিস, ঠিক তেমনি কবাটের ওপাশেও অমনি আর একটা গুপ্ত দ্বার আছে, ওখান দিয়েই মংলু দুর্গের বাইরে অন্য অংশে যাতায়াত করে,…এবং আমিও দরকার হলে যাই।

দুর্জয় পরীক্ষা করে দেখলে সত্যই, বুড়ীর কথা মিথ্যে নয়। সেইদিন রাত্রে বোবা চাকর মংলু নিদ্রা গেলে অন্য গুপ্ত দ্বারপথের মধ্য দিয়ে দুর্জয় দুর্গের বাইরের অংশে গেল। দুর্গের বাইরের অংশেও প্রশস্ত একটা পাথরে বাঁধানো আঙ্গিনা। সেই আঙ্গিনা দুর্গের চারপাশকে চক্রাকারে ঘিরে রেখেছে। আঙ্গিনা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে চা'র মানুষ সমান উঁচু কঠিন পাষাণ প্রাকার। প্রাকারের গায়ে গায়ে সব বড় বড় গোলাকার গর্ত। সেখান দিয়ে যোদ্ধারা যুদ্ধকালে হয়ত বর্শা ও তীর নিক্ষেপ করত শত্রুদের উপরে। সেই প্রাকারের এক পাশে প্রকাণ্ড লৌহের পাতে মোড়া কবাট।…তার গায়ে সব মস্ত মস্ত লোহার বল ও চাক্তী বসান।…সেই লৌহের পাতে মোড়া ভারী কবাটটা মোটা মোটা চারটে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা পাষাণ প্রাকারের গায়ে। সেই লোহার শিকল আবার মস্ত মস্ত দুটো লোহার চাকার গায়ে জড়ানো। সেই চাকা ঘোরালেই শিকল আল্গা হয়ে গিয়ে ভারী কবাটটা নেমে আসে, এবং হ্রদের উপর দিয়ে সাঁকোর মত হয়ে পারের মাটিতে গিয়ে ঠেকে এবং এইটাই হচ্ছে দুর্গে আসা-যাওয়ার পথ।

আঙ্গিনার এক পাশে ছোট একটা কুঠুরীই আস্তাবল রূপে ব্যবহৃত হয়। সেই আস্তাবল হতে আঁধারে ঘোড়ার খুরের পাষাণের গায়ে ঠোকার খট্ খট্ শব্দ

মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছিল।

আজ দুর্জয় ছোট মত একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছিল। প্রজ্বলিত মশাল হস্তে দুর্জয় সেই অপ্রশস্ত ছোট কুঠুরীর মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

এইত তার প্রিয় অশ্ব মুকুট। মশালের আলোয় দীর্ঘ কাল পরে প্রভুকে দেখে প্রভুভক্ত অশ্ব বোধ হয় চিনতে পারলে। সে তার পায়ের লোহার নাল পাষাণের উপর ঠুকতে ঠুকতে ও ঘাড়টা দুলিয়ে দুলিয়ে দু' চারটে মৃদু হ্রেষা রব করে মনের আনন্দ জ্ঞাপন করলে। কিন্তু একি হয়েছে তার প্রিয় অশ্বের চেহারা! মুকুটের অমন সুন্দর দেহশ্রী আর নেই, সেই মসৃণ বলিষ্ঠ মাংসল দেহ আর নেই;···রুগ্ন কঙ্কালসার হয়ে গেছে। পেটের কোল ঘেষে পাঁজরাগুলো সজাগ হয়ে উঠেছে, স্নেহে মুকুটের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে দুর্জয়ের চোখের কোল দুটোতে জল ভরে উঠে। সে বললেঃ এত রোগা হয়ে গেছিস কেন রে মুকুট? ওরে! নে তাড়াতাড়ি শরীরটা সারিয়ে নে! আমাদের যে অনেক কাজ এখন করতে হবে রে! জানি না বনের পশু কি বুঝলে, সে তার লম্বা গলাটা বাড়িয়ে প্রভুর পিঠে ঘষতে লাগল। আর পা দিয়ে পাথরের মেঝের উপর নালের শব্দ করতে লাগল। পরদিন গভীর রাত্রে দুর্জয় মুকুটকে নিয়ে দুর্গের পশ্চাৎ দিকে যেখানে শত্রু সৈন্যকে লক্ষ্য করবার জন্য পাষাণের বেদীর মত একটা ছিল তার উপর উঠে দাঁড়ালো। এখানে দুর্গ প্রকারের উচ্চতা মাত্র হাত তিনেক হবে। মুকুটকে ইশারা করতেই শিক্ষিত অশ্ব দুর্গ প্রাকার এক লাফে টপকে ঝপাং শব্দে ও পাশে হ্রদের জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রাত্রির জমাট ভরা নিস্তব্ধতায় একটা শব্দ সহসা জেগে উঠে হ্রদের বুকে ঢেউ জাগিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

দুর্জয় আগেকার সেই গুপ্ত পথ দিয়ে দুর্গের বাইরে গিয়ে পূর্বের মত শিকল ধরে ঝুলে হ্রদের জলে নামল।

ধীরে নিঃশব্দে মুকুট মাথাটা উঁচু করে জলের ভিতর দিয়ে সাঁতরে পারের দিকে এগিয়ে চলেছে। সাঁতার দিয়ে দুর্জয় মুকুটের পাশে এসে ওর পিঠে হাত দিল এবং পাশাপাশি সাঁতরিয়ে চলল।

বহুদিন পরে প্রিয় অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করে দু'পা দিয়ে মুকুটের পেটে মৃদু একটু চাপ দিতেই মুকুট চলতে শুরু করলে। ক্রমে চলার বেগ বাড়িয়ে মুকুট ছুটতে শুরু করল।

রাত তখন অনেক হবে। পাহাড়ের কঠিন চূড়ায় চূড়ায় চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে। দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একটা ছোট স্বল্প পরিসর গুহার মত ছিল, এখানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে সেটা আবিষ্কার করেছিল। মুকুটকে নিয়ে দুর্জয় সেখানে এসে হাজির হ'ল। এই পাহাড়ের শ্রেণী দুর্গের পিছন দিকে হ্রদের ঠিক পারেই।···

মুকুটের লাগামটা একটা বড় পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে রেখে দুর্জয় দুর্গে ফিরে এসে ওর খাবারের বালতিটা নিয়ে আবার মুকুটের কাছে গিয়ে রেখে এল।

ভোরের আলো এখন রাতের আঁধারকে ফিকে করে আকাশ পটে ফুটে উঠছে। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে দুর্জয় দুর্গে প্রবেশ করে শয্যায় আশ্রয় নিল। শীঘ্রই ঘুমে চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে নেমে আসে।

বুড়ী বললে, ওরে আজ আবার সেই লোকটা আসবে বোধ হয়। দুর্জয় শুনে আগে হতেই সাবধান হলো।

সমগ্র নীলাকাশ ভরে গেছে আজ চাঁদের অজস্র আলোয়। অমল ধবল জ্যোৎস্নায় সমস্ত প্রকৃতি আজ এতটুকু এক শিশুর মতই বুঝি খিল্ খিল্ করে হাসছে।

লোকটা যথাসময়েই দুর্গে এসে বুড়ীর ঘরে প্রবেশ করল। বুড়ীর সঙ্গে যখন সে কথাবার্তায় ব্যস্ত দুর্জয় চুপিচুপি ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সেই দুর্গের বহির্প্রাঙ্গণে এসে সেই লোহার চাকার আড়ালে লুকিয়ে লোকটার আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

ও বুড়ীর কাছ হতেই শুনেছিল, লোকটা বহির্প্রাঙ্গণের পাষাণ বেদীর উপরে উঠে দড়ি ধরে নীচে নৌকায় গিয়ে নামে, তারপর বোবা চাকরটা ওকে ওপারে পেঁাছে দিয়ে আবার ফিরে আসে। আজ সে মাথা নীচু করে আস্তাবলের একটা পাশে দাঁড়িয়ে। এখুনি অল্প পরে তাকে যে ভীষণ কৈফিয়তের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে তারই চিন্তায় সে আজ হয়ত ম্রিয়মান।

কিছুক্ষণ বাদে পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দুর্জয় লক্ষ্য করলে, মুখে কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া উঁচু-লম্বা-চওড়া-বলিষ্ঠ একজন লোক নিঃশব্দে গুপ্ত পথ দিয়ে আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াল। লোকটা সোজা এসে যে কুঠুরীর মধ্যে দুর্জয়ের ঘোড়াটা ছিল সেই কুঠুরীর সামনে এগিয়ে গেল। প্রথমে সে কুঠুরীটা শূন্য দেখে একটু যেন আশ্চর্যই হল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বোবা ভৃত্যটার দিকে দৃষ্টিপাত করল।

কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঃ এই ঘোড়াটা কী হলো ?

ভৃত্য নীরব। কী জবাব দেবে সে ?

রাগে উত্তেজনায় কোষস্থিত অসিতে হাত রেখে পুনরায় প্রশ্ন করল ঃ কী রে জবাব দে ?

তথাপি সে নীরব।

বিশ্বাসঘাতক ! শয়তান !

বিদ্যুৎগতিতে তলোয়ার কোষমুক্ত করে তার তীক্ষ্ন সুঁচের মত অগ্রভাগ সমূলে বোবা ভৃত্যটার বুকের মধ্যে বসিয়ে দিল। একটা দীর্ঘ চীৎকার নিশীথের বোবা স্তব্ধতায় মুহূর্তের জন্য জেগে উঠল ; হতভাগ্য কঠিন পাষাণ চত্বরের উপর লুটিয়ে পড়ল।

আকাশের চাঁদ বারেকের জন্য মেঘের আড়ালে বুঝি ঢাকা পড়ল। স্তিমিত-প্রায় চন্দ্রালোকে এক হতভাগ্যের করুণ শেষ নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে শূন্যে মিলিয়ে যায়।

তারপর সেই লোকটা সেই রক্তাক্ত মৃত দেহটা অক্লেশে আপন স্কন্ধে তুলে নিয়ে দুর্গ প্রাকারের পাষাণ বেদীর দিকে এগিয়ে চলল।

আর অপেক্ষা নয়। দুর্জয় সিংহ এক লাফে মুক্ত তলোয়ার হাতে সেই লোকটার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। লোকটার একহাতে এখনও রক্তাক্ত মুক্ত তলোয়ারখানি।

লোকটা প্রথমটা একটু চমকে উঠল এবং পরক্ষণেই মৃত দেহটা স্বীয় স্কন্ধ হতে ফেলে দিয়ে আপন হাতের তলোয়ার উঁচিয়ে ধরল।

মেঘে ঢাকা চাঁদ মুক্ত হয়ে আবার আকাশের গায়ে হেসে উঠেছে। পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে উন্মুক্ত দু খানি খাপমুক্ত তলোয়ার ঝিক্‌মিক্ করে যেন মৃত্যু-হাসি হেসে ওঠে।

দুর্জয় সিংহের মুখখানিও শিরস্ত্রাণ দিয়ে ঢাকা।

বিদ্যুৎগতিতে সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে দুর্জয় সিংহ ক্ষিপ্র ও কৌশলী তরবারি চালনায় প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের ঢাকনাটা কানের পাশ দিয়ে ফাঁসিয়ে দিয়ে এক টান দিল, মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে পরিপূর্ণ হয়ে জেগে উঠল···একটা অস্ফুট চীৎকার দুর্জয় সিংহের বিস্মিত কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে আসে।···শয়তান তুই! সেদিনকার অনুমান আমার তাহ'লে মিথ্যে নয়? দু'খানি তরবারির ঝন্‌ঝনানীতে স্তব্ধ রাত্রির সুগভীর মৌনতাও মুখরিত হয়ে উঠল।

অসি ক্রীড়ায় দু'জনেই সুনিপুণ। প্রতিদ্বন্দ্বী সেই পাষাণ বেদীর উপর এক লাফে গিয়ে উঠল। দুর্জয় সিংহ মুক্ত অসি হাতে তার দিকে ঝাঁপিয়ে এগিয়ে গেল।

সহসা দুর্জয় সিংহের তরবারির আঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতের তরবারি ছিটকে দুর্গের সুকঠিন পাষাণ চত্বরে গিয়ে ঠিক্‌রে পড়ে ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল।

শয়তান!

দুর্জয় সিংহের সুতীক্ষ্ন তরবারির অগ্রভাগ প্রতিদ্বন্দ্বীর বাঁ দিক্‌কার স্কন্ধে গিয়ে বিঁধতেই একটা দীর্ঘ অস্ফুট চীৎকার করে লোকটা ঘুরে প্রাচীরের উপর দিয়ে প্রাচীরের ওপাশে গিয়ে পড়ল এবং ঝপাং করে জলের বুকে একটা শব্দ জেগে উঠে পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল।

দুর্জয় সিংহ ততক্ষণে এক লাফ দিয়ে পাষাণ বেদীর উপরে গিয়ে উঠেছে।

চাঁদ আবার মেঘের আড়ালে মুখ ঢেকেছে। অস্পষ্ট আলো-আঁধারেতে দুর্জয় সিংহ দেখলে, হ্রদের জলে, একটু আগে যে আবর্তন জেগে উঠেছিল তারই বিলীয়মান শেষ রেশ ঢেউয়ের আকারে চক্রাকারে দূরে দূরে ভেসে ভেসে মিলিয়ে যাচ্ছে। দুর্গের কোন ফাটল হতে একটা প্যাঁচা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল। মুহূর্তে যেন কী ভেবে দুর্জয় সিংহ হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

(সাপুড়ে)

তোমরা জান বহুকাল পরে নিরুদ্দিষ্ট কুমার দুর্জয় সিংহ রাজ্যে ফিরে এসেছে। তার সে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আজ মহারাজ চন্দন সিংহের রাজ্যে বিরাট এক উৎসবের আয়োজন হয়েছে। রাজপ্রাসাদের সর্বত্র লাল, নীল, সবুজ, পীত, নানা বর্ণের পতাকা বাতাসে পত্ পত্ করে উড়ে। ফুলের মালা দুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নগরের তোরণে তোরণে! কদলী বৃক্ষ রোপণ করে তার গোড়ায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে মঙ্গলঘট ও আম্রপল্লব। নহবতের মধুর সানাই-আলাপ বাতাসের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ইলা একটি মুহূর্তের জন্যও কাকাকে ছাড়ে না, সর্বদা তার পিছু পিছু ঘোরে।

বর্তমান রাজা চন্দন সিংহের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী রাজকুমারী ইলা। কিন্তু এ রাজ্যের নিয়ম কোন স্ত্রীলোক সিংহাসনে বসতে পারবে না; অতএব সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হয় দুর্জয় সিংহ নিজে অথবা তার পুত্র।

দুর্জয় সিংহ রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পর চন্দন সিংহ একদিন তাকে ডেকে বললেন: আমার একমাত্র সন্তান ইলা এবং আমার স্ত্রীও মৃতা। অতএব এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হয় তুমি কিংবা তোমার পুত্র। আমার রাজত্বকালে অশান্তি ও দুঃখ দেখা দিয়েছে। চারদিকে অভাব ও অনুযোগের সুর। আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য চতুর্দিকে ষড়যন্ত্রকারীরা মাকড়সার জালের মত আমায় ঘিরে এনেছে। আমি সিংহাসন হাসিমুখে ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত আছি, কিন্তু তার আগে, সহসা চন্দন সিংহের কণ্ঠস্বর কঠিন ও গম্ভীর হ'য়ে উঠল, বল্লে: আগে সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল আমি ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবো। তারপর আমার অন্য চিন্তা। সামনে একটা শুভদিন দেখে তোমাকে আমি এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা বলে প্রজাদের সামনে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করব।

দুর্জয় সিংহ দাদার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বল্লে, মহারাজ! আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আপনার যেরূপ অভিরুচি করবেন। আমি আপনার দাসানুদাস।

আজ সেই শুভদিন।

মহারাজ প্রকাশ্য রাজসভায় দেশের সকল গণ্যমান্য ও মাতব্বর প্রজাবৃন্দকে আহ্বান করে দুর্জয় সিংহকে আপনার পার্শ্বে টেনে এনে বললেন, আমার দেশের প্রজা ভাইয়েরা, আমি সানন্দ চিত্তে ঘোষণা করছি—এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা হবে আমার ছোট ভাই শ্রীমান দুর্জয় সিংহ। একেই তোমরা দেশের ভবিষ্যতে ত্রাণ-ও পোষণকর্তা বলে জানবে। এস, আমরা সকলে এই শুভদিনে আমাদের ভবিষ্যৎ রাজাকে অভিনন্দন জানাই; বল 'জয়স্তু কুমার দুর্জয় সিংহ,' 'জয়স্তু

কুমার দুর্জয় সিংহ,' সমবেত সকলে রাজার সাথে কণ্ঠ মিলালঃ 'জয়ন্তু কুমার দুর্জয় সিংহ'।

সন্ধ্যা হ'তে আর বেশী বিলম্ব নেই। রাজ উদ্যানে দুর্জয় সিংহ ও ইলা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজহংসীর দল মরাল গ্রীবা বাঁকিয়ে দীঘির কালো জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। সাঁঝের বাতাসে ভাসিয়ে আনে কেয়া ফুলের গন্ধ।

শৈবালকুমার এসে অভিবাদন জানাল, কুমার! আপনার আদেশ মত কাল প্রত্যুষে অশ্ব প্রস্তুত রাখবার জন্য অশ্বরক্ষীকে উপদেশ দিয়ে এলাম।

আচ্ছা। তুমি এবার যেতে পার শৈবাল! হাঁ, আমার দেহরক্ষী হয়ে তুমিও কাল আমার সঙ্গে যাবে, বুঝলে?

যথাদেশ কুমার! কিন্তু এ অশ্ব আপনার আগেকার অশ্ব মুকুটের মত নয় কিন্তু।

হুঁ! মুকুটের কথা আমি কোন দিনই ভুলতে পারব না।...সুখে দুঃখে সে যেন আমার চিরসাথী ছিল। দুর্জয় সিংহের কণ্ঠস্বর ভাবের দোলায় রুদ্ধ হয়ে এল, চোখের কোল দুটো জলে হয়ে উঠল সজল।

পরদিন প্রত্যুষে! প্রভাতী বায়ু হিল্লোলে নহবতখানা হতে ভেসে আসে সানাইয়ের ইমন কল্যাণ আলাপের সুর। কুমার দুর্জয় সিংহ ও শৈবালকুমার দু'জনে দুটো অশ্বে আরোহণ করে নগর-তোরণ দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রশস্ত রাজপথ ধরে দু'জনে অশ্ব চালনা করতে লাগল।

পথিমধ্যে ভার্গবের সাথে দেখা। জয়ন্তু কুমার দুর্জয় সিংহ!

এই একচক্ষু ঢ্যাঙ্গা শকুনের মত নাকওয়ালা কুৎসিত-দর্শন লোকটাকে দুর্জয় সিংহ চিরদিনই এড়িয়ে চলেছে।

ভার্গব! দুর্জয় সিংহ একটু যেন চম্‌কে কথাটা উচ্চারণ করলে।

ভার্গব দুর্জয় সিংহের ভাবান্তর লক্ষ্য করেও যেন করলে না, বল্‌লে, কোথায় চলেছেন এই প্রত্যুষে?

এমনি একটু ভ্রমণে বের হয়েছি।

ওঃ! ভার্গব অভিবাদন জানিয়ে গন্তব্য পথে চলে গেল।

ক্রম অপসৃয়মান ভার্গবের দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে শৈবালকুমার বললে, লোকটাকে দেখলেই যেন কেমন আমার অস্বস্তি লাগে কুমার! মনে হয় সর্বদাই যেন ওর মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তার জাল বুনে চলেছে।

কিন্তু মহারাজ চন্দন সিংহের একান্ত বিশ্বাসের পাত্র ওই ভার্গব। জবাব দিল দুর্জয়।

জানি। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারি না যে, মহারাজ চন্দন সিংহ সত্য সত্যই অন্ধ না এটা তার অন্ধত্বের ভান মাত্র। বিশ্বাস আর বিশ্বস্ততা ত এক বস্তু নয় কুমার! একটা মনের জোর অন্যটা কর্তব্য। আজ যে মহারাজের চারপাশে ষড়যন্ত্রের কালো ছায়া ঘনিয়ে এসেছে তার জন্য মূলত দায়ী মহারাজের

নিজের বিশ্বাস। যা তিনি সর্বজনে সর্বভাবে করে এসেছেন।

কিন্তু এমনি করে বিশ্বাস না করেই বা উপায় কি শৈবাল? জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতিটা খুঁটিনাটি কাজে যাদের নিয়ে চলব ফিরব তাদের প্রত্যেককে যদি কেবল আমরা অবিশ্বাসই করতে থাকি তবে আমাদের বাঁচাই ত একটা দুরূহ ব্যাপার।

অনেক পথই তারা ঘুরল। দ্বিপ্রহরে নীলাকাশ প্রখর রৌদ্রতাপে ঝলসে যাচ্ছে। সাদা সাদা মেঘগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে ভেসে ভেসে বেড়ায়। সমগ্র প্রকৃতির চোখে যেন রৌদ্রতাপে ঝিমুনি এনেছে। দুর্জয় সিংহ ও শৈবালকুমার ঘোড়া ছুটিয়ে এখন নগরাভিমুখে প্রত্যাগমন করেছেন। মাঝে প্রান্তরের উত্তপ্ত হাওয়া দ্বিপ্রহরের শান্ত নির্জনতায় পথের বাঁকে বাঁকে দামাল শিশুর মত হৈ হৈ করে বেড়ায়।

সহসা সেই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের করুণ নির্জনতায় বাঁশীর আলাপ কানে এসে বাজে। শৈবালকুমারের কান দুটো সজাগ হয়ে ওঠে। অল্প দূরে কোথাও নিশ্চয়ই বাঁশী বাজে।

দু'জনে অশ্ব চালিয়ে এগিয়ে চলে। অল্প দূরে একটি বটবৃক্ষের তলায় একজন সাপুড়ে বাঁশী বাজিয়ে সাপ খেলাচ্ছে। সাপুড়ের মাথায় লম্বা লম্বা চুল; একটা গেরুয়া রংয়ের ন্যাকড়ার ফালী মাথায় বাঁধা। গায়ে একটা শতছিন্ন শত-তালী দেওয়া ঝলঝলে আংরাখা সাপুড়ে আপন মনে মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে, আর প্রকাণ্ড একটা দুধরাজ গোখরো সাপ তার প্রশস্ত ফণা বিস্তার করে আপন মনে হেলছে আর দুলছে, হেলছে আর দুলছে বাঁশীর সুরের তালে তালে। একদল লোক চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে।

ওরা দু'জনে এসে ঘোড়া হ'তে নেমে জনতার একপাশে দাঁড়ালো।

কুমার দুর্জয় সিংহ ও শৈবালকুমারকে দেখে জনতা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালো। জনতার মধ্যে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা যায়ঃ রাজভ্রাতা দুর্জয় সিংহ।

সাপুড়ে কিন্তু একমনে সাপ খেলিয়েই চলেছে। সাপটার গায়ের রং সাদা দুধের মত, মাথার উপরে একটা খুর আঁকা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটো রক্তের দুটো বিন্দুর মত ঘোর লাল।

অনেকক্ষণ ধরে সাপ খেলাবার পর সাপুড়ে বাঁশী থামিয়ে সাপটিকে একটা ঝাঁপির মধ্যে পুরে রাখলে; তখন জনতার ভিতর হতে দু' একজন তাদের হাতের পাতা সাপুড়ের সামনে প্রসারিত করে তাকে অনুরোধ জানাতে লাগল, হাত দেখে ভাগ্য গণনার জন্য।

সাপুড়ে তা হলে শুধু সাপই খেলায় না, ভাগ্য-গণনাও করতে জানে। সাপুড়ে কারও কারও হাত দেখে দু' একটা কথা বললে, আবার কারো হাত দেখে গম্ভীর হয়ে গেল, কোন কথাই বললে না।

সকলের দেখাদেখি শৈবালকুমারও এসে হাতটা প্রসারিত করে ধরল সাপুড়ের সম্মুখে।

আপনি কী বিষয়ে জানতে চান ? সাপুড়ে প্রশ্ন করল।

আমি যা এই মুহূর্তে ভাবছি তা কি সত্য ?

সাপুড়ে শৈবালকুমারের প্রশ্ন শুনে সহসা যেন চমকে উঠে শৈবালকুমারের মুখের দিকে তাকালো। মুহূর্তের জন্য যেন তার চোখের তারা দুটো মেঘলাকাশে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় ঝিলিক দিয়ে উঠল। ঠোঁটের কোলে একটু বক্র হাসি খেলে গেল, বললে, না, যা মনে মনে ভাবছ তা নয়।

কিন্তু মনকে কি ফাঁকি দেওয়া যায় ? যে চোর সে বাইরে যত সাধু সেজেই লোককে ঠকাক না কেন, মনে মনে সে ভালই জানে যে, সে একজন চোর ছাড়া আসলে আর কিছুই নয়। তার বাইরের সাধুতার সাজ-পোশাক যদি হঠাৎ কোনক্রমে খুলে যায় তবে লোকে তার আসল রূপের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় শিউরে উঠবে। কিন্তু সে কথা যাক, রাত্রে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পার ? আমাদের মহারাজের হাতটা তোমাকে একটি বার দেখাতাম।

কেন যাব না! একশ'বার যাবো, কিন্তু আমার মত সামান্য একজন সাপুড়ের কাছে তিনি কি তাঁর হাত দেখাবেন ?

গুণী যে সে চিরদিনই তার গুণের পূজা পেয়ে থাকে, তাঁর আবার জাতধর্ম নিয়ে কেউ তার বিচার করে নাকি ? তুমি আমার কুটীরে গিয়ে দেখা করো, আমি মহারাজকে আগেই বলে রাখব, আমার কুটীর হতে মহারাজের ওখানে যাওয়া যাবে।

...সেইদিন গভীর রাত্রে। শৈবালকুমার একাকী আপন শয়ন কক্ষে পালঙ্কের উপর বসে ডান হাতখানা চিবুকের তলে রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন। সম্মুখে শয্যার উপর উন্মুক্ত তরবারি পড়ে আছে। অদূরে প্রদীপদানে প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখাটা মৃদু আলো দিচ্ছে। বাইরে শুষ্ক পাতার উপর কা'দের নিঃশব্দ চলা-ফেরায় মাঝে মাঝে মর্মর ধ্বনি জেগে ওঠে।

শৈবালকুমার খুব পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পারছে—একদল স্বার্থলোভী শয়তান বন্ধুত্বের মুখোশ এঁটে আসলে রাজার সর্বনাশের ফন্দী আঁটছে। এরা শুধু মহারাজেরই শত্রু নয়, সমগ্র দেশ ও সমস্ত দেশবাসীর শত্রু।

মহারাজ চন্দন সিংহের জন্য শৈবালকুমারের সত্য সত্যই বড় দুঃখ হয়।

হতভাগ্য দেশবাসী বুঝলে না তারা কি রামরাজত্বে আছে !

মানুষের স্বভাবই এমনি : তারা যত পায় তত চায়। তৃপ্তি তাদের কিছুতেই হয় না। শৈবালকুমার ত বুঝতেই পারে না, মানুষ যা পায় তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না কেন ? মানুষ যতদিন তার মনগড়া কান্না গাইবে ততদিন সে কিছুতেই সুখী হতে পারবে না। ভার্গব লোকটাকেও এতটুকুও বিশ্বাস করতে পারে না ; অথচ মহারাজের ও একজন বিশিষ্ট বিশ্বাসের পাত্র ! ওর পরামর্শ মতই মহারাজ উঠেন ও বসেন।

লোকটার একটা মাত্র চক্ষু দিয়ে যেন যত রাজ্যের শয়তানী ও দুরভিসন্ধি ফুটে বের হয়। ভৃত্য এসে সংবাদ দিল, বাইরে একজন লোক সাক্ষাৎপ্রার্থী। শৈবালকুমার বলল, তাকে এই ঘরে নিয়ে আয়।

ভৃত্য প্রস্থান করলে।

অল্পক্ষণ বাদে ভৃত্যের পিছু পিছু দ্বিপ্রহরের সেই সাপুড়ে এসে ঘরে প্রবেশ করল।

এই যে তুমি এসেছো, শৈবাল বললে।

হাঁ, তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে।

শৈবালকুমার চমকে উঠে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সাপুড়ের দিকে তাকাল।

শোন শৈবালকুমার! তোমার অনুমানই সত্য। কিন্তু জানার পরে তোমার এ জগতে আর বেঁচে থাকা কোনমতেই সম্ভব হতে পারে না; অতএব তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু বিনা অস্ত্রে অসহায়ের মত তোমায় আমি মারব না, কেননা সেটা প্রকৃত বীরের ধর্ম নয়, অস্ত্র নাও···বলতে বলতে সহসা গায়ের ঝলঝলে আংরাখার তল হতে বিদ্যুৎগতিতে সাপুড়ে তীক্ষ্ন তরবারি টেনে বার করল। প্রদীপের আলোয় সেই তরবারি যেন মৃত্যু বিভীষিকায় খিল্ খিল করে হেসে উঠল।

শৈবালকুমারও ততক্ষণ শয্যা হতে তলোয়ারখানা তুলে নিয়েছে।

মৃত্যুকে শৈবালকুমার ডরায় না—আর আমিও এরজন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। আমি জানতাম, তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছ এবং এও জানতাম আমার কাছে তোমায় আসতেই হবে।

সাপুড়ে তলোয়ার উঠিয়ে শৈবালকুমারের সামনে এগিয়ে এল।

শৈবাল স্বীয় তরবারি দিয়ে তাকে প্রতিঘাত দিল।

তখন সেই স্বল্প পরিসর কক্ষের মধ্যে মৃৎ প্রদীপের আলোয় দুজনে অসিযুদ্ধ আরম্ভ হলো। কিন্তু সাপুড়ে অসিযুদ্ধে অত্যন্ত সুনিপুণ, শৈবালকুমার শীঘ্রই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে আসে, তার অসিচালনাও ক্রমে মন্থর হয়ে আসতে থাকে। ক্রমে শৈবালকুমারকে ঠেলতে ঠেলতে সাপুড়ে একেবারে ঘরের কোণে এনে ফেলে। হাতের অসির সুতীক্ষ্ন অগ্রভাগ চকিতে সমূলে শৈবালকুমারের বক্ষে ঢুকিয়ে দিয়েই সেটা আবার টেনে খুলে নিয়ে আপন পাগড়ীতে মুছতে মুছতে বললে, তোমার মত সামান্য একটা কীটকে মেরে কলঙ্কের ভাগী হওয়ার ইচ্ছা আমার এতটুকুও ছিল না; কিন্তু তুমি আমায় চিনতে পেরেছ, সেই জন্যই তোমায় এমনি করে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হলো।

মৃত্যু পথযাত্রী শৈবাল তখন মাটির বুকে পড়ে হাঁপাচ্ছে; ক্ষত মুখ দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে এসে সমস্ত পোশাক তার রক্তে রাঙা করে তুলেছে।

এমন সময় দূরে রাত্রির স্তব্ধ নির্জনতার বুকে ঘোড়ার খট্-খট্-খটা-খট্ শব্দ শোনা গেল। অনেক দূর হতে ঘোড়া ছুটিয়ে বুঝি এদিকেই আসছে।

খট্-খট-খটা-খট্।

শৈবালকুমারের মুখে মৃত্যুযন্ত্রণাকে ছাপিয়ে একটু যেন হাসির রেখা জেগে ওঠে।

সাপুড়েও সেই শব্দ শুনে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি করে আংরাখার নীচে কোষের মধ্যে অসিটা লুকিয়ে ফেলবার জন্য সন্ত্রস্থ হয়ে ওঠে।

কোনমতে টেনে টেনে শৈবালকুমার বলে, বৃথা!...তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে ; ও খুরের আওয়াজ আমার বড় চেনা! নিশীথ রাতের তীরন্দাজ ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। এ তারই ঘোড়ার খুরের শব্দ। শত যোজন হ'তে শুনলেও এ আওয়াজ ভুল হয় না। হে ভগবান্! সত্যই তুমি আছ দয়াময়! শৈবালকুমার বিষম হাঁপাতে থাকে। গলার স্বর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে ক্ষীণতর হয়ে আসে। গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে আসে।

সাপুড়ে তখন সন্ত্রস্থ হয়ে উঠেছে। দরজা দিয়ে যেমন পালাতে যাবে সহসা একটা কালো বর্শার সূচাগ্র ভাগ ঈষন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে কক্ষের মধ্যে এসে মৃত্যু বিভীষিকায় জেগে উঠ্ল। সাপুড়ে চমকে দু' পা পিছিয়ে এল। পরক্ষণেই দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল ও একটা সুমিষ্ট মেয়েলী হাসির ঢেউ খিল্‌খিল করে স্তব্ধমৌনতায় ছড়িয়ে পড়্ল এবং সঙ্গে সঙ্গে কক্ষস্থিত ক্ষীণ প্রদীপালোক যেন স্বপ্নের মতই খোলা কবাটের উপর জেগে উঠ্ল সেই কালো ঘোড়ার সওয়ারের প্রতিচ্ছবি! আগাগোড়া নিকষ কালো রংয়ের পোষাকে ঢাকা। মুখটা কালো কাপড়ে ঢাকা দেওয়া, শুধু চোখের দুটো জায়গায় দুটো ছিদ্র, কটিদেশে কোষস্থিত তলোয়ার ঝুল্ছে। হাতে তীক্ষ্ন বর্শা।

এই সেই নিশীথ রাতের তীরন্দাজ!

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

(রাজ-তিলক)

ক্ষণেকের জন্য সাপুড়ে হকচকিয়ে গেছিল কিন্তু পরক্ষণেই আংরাখার তল হতে তলোয়ারখানা আবার টেনে বের করল।

বন্ধু আমার দেখ্ছি তা'হলে তলোয়ার যুদ্ধেই সিদ্ধহস্ত! তীরন্দাজ বিদ্যুৎগতিতে আপন কটিদেশস্থিত তরবারি কোষমুক্ত করে এক লাফ দিয়ে সাপুড়ের সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখের পলকে নিজের তরোয়াল দিয়ে সাপুড়ের তলোয়ারের গায়ে প্রচণ্ড এক আঘাত হেনে ডান পা'টা বাড়িয়ে দিয়ে সাপুড়ের হাতের তরবারিখানা মাটির সাথে চেপে ধর্ল এবং বল্লে ঃ যারা বলে অহিংসা পরম ধর্ম—হয় তারা কাপুরুষ নয়ত ক্লীব। আজ পর্যন্ত বিনা রক্তপাতে কোন ষড়যন্ত্রকারীদের বশে আনা যায়নি—জগতের ইতিহাসে এমন কথা পেয়েছো কি বন্ধু? মৃত্যুর সাথে খেলা সে বড় বিষম খেলা। তাজা লাল টক্‌টকে রক্ত মানুষের দেহ হতে ফিন্‌কি দিয়ে ছুটে আসছে, সে দৃশ্য আমার বড় ভাল লাগে দেখ্তে। বল্‌তে বল্‌তে তীরন্দাজ পা'টা টেনে নিল, এবং সাপুড়ে মুক্ত তরবারি দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হতেই ক্ষিপ্র গতিতে স্বীয় হস্তস্থিত তরবারি দিয়ে তার সে উদ্যত আঘাত প্রতিহত করে খিল্‌খিল্ করে সুমিষ্ট মেয়েলীস্বরে হেসে উঠ্ল এবং বল্লে ঃ শয়তানের শয়তানী চিরদিন তার বুকের রক্ত ঢেলেই তর্পণ দেয়।

অক্লেশে অতি সহজভাবে সাপুড়ের প্রতি সতর্ক আঘাত তরবারি দিয়ে প্রতিহত করতে করতে তাকে কোণ-ঠাসা করে নিয়ে আসতে লাগল এবং ক্ষিপ্র ও সুনিপুণ অসির আঘাতে সহসা সাপুড়ের হাতের অসি ছিটকে পড়ে গেল ; তীরন্দাজ চীৎকার করে উঠল ঃ এবার ! এখন তোমায় কে বাঁচাবে বন্ধু ? একজনের প্রাণ নেওয়াটা খুবই সহজ কিন্তু প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া বড় কঠিন !… কিন্তু তোমার মরবার সময় এখনও আসেনি। তোমার শেষের দিনটি ঘনিয়ে আসবে সেইদিন যেদিন তোমার আসল রূপ সকলের চোখের সামনে ফুটে উঠবে, আজ তবু মাত্র তোমার পরাজয়ের একটা মাত্র কলঙ্কের দাগ তোমার কপালে এঁকে দেব। রাজা হতে সখ তোমার—কপালে রাজ-তিলক পরে নাও বন্ধু, বলতে বলতে ক্ষিপ্র হস্তে সুতীক্ষ্ন তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে দুটি দাগ কেটে দিল। হাতের চেটো দিয়ে সাপুড়ে অনুভব করে হাতটা চোখের সামনে মেলে ধরতেই দেখল, হাতের পাতার রক্ত লেখার '×' দুটো রক্তের দাগ পরস্পরকে কাটাকাটি করে ফুটে উঠেছে।

যাও…আবার দেখা হবে !…

মাথা নীচু করে সাপুড়ে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ওদিকে শৈবালকুমারের শেষ নিঃশ্বাসটুকু রাতের হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে !

বুকের তাজা রক্তধারায় আশেপাশের সমস্ত স্থান লাল হয়ে উঠেছে। প্রদীপের তৈল বুঝি ফুরিয়ে এল। প্রায় নিবন্ত প্রকম্পিত ক্ষীণ প্রদীপ শিখাটা বার কয়েক থির্ থির্ করে কেঁপে কেঁপে দপ্ করে নিবে গেল।

মুহূর্তে কক্ষখানি আঁধারে ভরে গেল। তীরন্দাজ ঝুঁকে পড়ে সস্নেহে শৈবালকুমারের মৃত্যুশীতল ললাটে স্বীয় তরবারি স্পর্শ করে ধীরমন্থর পদে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

…পরদিন প্রত্যূষে শৈবালকুমারের মৃত্যু-সংবাদে চন্দন সিংহ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

দুর্জয় সিংহের সাথে মহারাজের যখন দেখা হলো বললেন, শুনেছ দুর্জয়, শৈবাল কাল রাত্রে তার গৃহে এক অচেনা আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছে। মহারাজের চোখের কোলে জল। দুর্জয় চমকে উঠল, সে কি !…কে বললে ?

ভারী গলায় মহারাজ জবাব দিলেন, ভার্গব সংবাদ এনেছে।

কে সংবাদ এনেছে ?

ভার্গব !

ভার্গব !…ভার্গব ! সেই একচক্ষু কুৎসিত দর্শন লোকটা।

কে ও ? কী ওর পরিচয় ?

শৈবালকুমারের মৃত্যু সংবাদ সত্য সত্যই দুর্জয় সিংহের প্রাণে ব্যথার আলোড়ন জাগিয়ে গেল। বেচারী সত্য সত্যই বড় নিরীহ ও বিশ্বাসী।

সন্ধ্যার আঁধারে দুর্জয় সিংহ গা ঢেকে শৈবালের গৃহের দিকে চলল।

নগরের এক প্রান্তে শৈবালকুমারের গৃহ। অল্প পরিসর একটা প্রাঙ্গণ,… প্রাঙ্গণের এক পাশে একটা আমলকী বৃক্ষ। দুর্জয় সিংহ পায়ে পায়ে এসে

প্রাঙ্গণের এক পাশে দাঁড়ালো। কালো আকাশের পটে তারাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে সজাগ হয়ে উঠে! প্রাঙ্গণের দু'পাশে দু'টো ঘর। একটাতে শৈবালকুমার ও তার ভৃত্য থাক্‌ত, অন্যটা ওদের দুজনার রান্না ও অন্যান্য যাবতীয় কাজের জন্য ব্যবহৃত হত।

ভৃত্যটা বোধ হয় কোথাও বের হয়েছে।

দুর্জয় সিংহ শৈবালকুমারের কক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। কক্ষের দুয়ারটা ভেজান।…ঈষন্মুক্ত দুয়ারের ফাঁক দিয়ে কক্ষস্থিত আলোর একটুখানি উঁকি দিচ্ছে। ভেজান দুয়ার ঠেলে দুর্জয় সিংহ কক্ষের মাঝে এসে দাঁড়ায়।

আজও তেমনি প্রতিরাত্রের মতই বাতিদানের মাথায় প্রদীপটা জ্বল্‌ছে। বাতায়ন পথে হাওয়া আনাগোনা করে, তারই পরশ লেগে ঘরের স্নিগ্ধ প্রদীপ শিখাটি কেঁপে উঠে বারবার।

এই কক্ষের মাঝেই কাল একজনের শেষ নিঃশ্বাস হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কে জানে…হয়ত বা এখনও তার অতৃপ্ত আত্মা মাটির মায়ায় এই কক্ষের প্রতি ধূলিকণার কানে কানে হাহাকার ক'রে ফির্‌ছে।

দুর্জয় সিংহ উন্মুক্ত বাতায়নের কোলে এসে দাঁড়ায়।

দূরে আকাশের তারার আলোয় পৃথিবী ও আকাশের মাঝে মাঝে এক অপূর্ব ছায়াপথ তৈরী হয়েছে। সেই ছায়াপথে যারা আজও পৃথিবীর মায়া কাটিয়েও কাটাতে পারেনি তাদের আনাগোনায় হয়ত মুখর হয়ে উঠে। এই মাটির পৃথিবীর ফুলের সুবাস, বাতাসের স্নিগ্ধ পরশ ওদের মনের কোণে হয়ত আজও কৌতূহল জাগায়। যাদের ওরা এই মাটির পৃথিবীর মাটির ঘরে ফেলে গেছে; যাদের স্নেহের ডাক এখনও হয়ত ওদের অশরীরী কানে কানে বেজে ওঠে তাদের কী ওরা ভুল্‌তে পারে? তাই বুঝি রাত্রি যখন ঘনিয়ে আসে, পৃথিবীর চোখের পাতায় পাতায় ঘুমের ছোঁওয়া লাগে, তখন ওরা ছায়াপথ বেয়ে নেমে আসে এই ধূলোর ধরণীতে …স্বপন হয়ে আঁখির ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো হয়ে বাতায়ন পথে স্নেহের পরশটি বুলিয়ে যায়; এমনি করে নীল আকাশ ও মাটির পৃথিবীতে জন্ম ও মৃত্যুর চিরদিনের জানাজানি!

সহসা স্বীয় স্কন্ধে কার যেন হাতের স্পর্শে চম্‌কে ফিরে দাঁড়ায়।

সহাস্য মুখে পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ভার্গব! এর মধ্যে কখন যে সে এসে এমনি করে চুপিসাড়ে পিছনটিতে দাঁড়িয়েছে তা দুর্জয় মোটেই টের পায়নি।

চম্‌কে গেলেন কুমার দুর্জয় সিংহ! ভার্গবের কথার সুরে কোথায় যেন একটু ব্যঙ্গের চাপা আভাস লুকিয়ে।

দুর্জয় সিংহ বিস্মিত হয়ে ভার্গবের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা সেই 'শকুন কাঁদে গরুর শোকের' মতই হয়ে দাঁড়াচ্ছে কুমার! বলে ভার্গব অকারণেই কেন যেন প্রচুর হাসতে থাকে।

ভার্গব! তীক্ষ্ণ স্বরে দুর্জয় সিংহ ডাক দেয়।

বৃথা! বৃথা বন্ধু! একেবারেই বৃথা। ময়ূর পুচ্ছের আড়ালে দাঁড়কাকের আসল রূপ ধরা পড়ে গেছে। ভার্গবের আসলে একটা মাত্র চক্ষু হলে কি হয়?

সেই একটা চোখের ভেতরেই তার দশটা চোখের দৃষ্টি। লোকে বলে আঁধারে নাকি প্যাঁচার মত দেখতে পায়। অবিশ্যি দুর্জনেরা অনেক কথাই আমার সম্বন্ধে বলে থাকে।

বিদ্যুৎগতিতে দুর্জয় সিংহ কটিদেশস্থিত খাপ হতে তীক্ষ্ন তরবারি টেনে বের করল। ব্যাপারটা যেন ভার্গবের কাছে প্রকাণ্ড একটা হাসির খোরাক জুগিয়েছে। সহসা বাজের মত তীক্ষ্ন ও উচ্চ পৈশাচিক হাসির ধাক্কায় ভার্গব ফেটে পড়ল, হা-হা-হা-হা। নিশীথ রাত্রির মৌন নিঃসঙ্গতা সেই হাসির আঘাতে যেন ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল। হাসতে হাসতেই ভার্গব বল্‌লে, আগুন নিয়ে যখন খেলতে নেমেছি হাত ত তখন পুড়বেই এবং তার জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত কুমার দুর্জয় সিংহ! কিন্তু আপনি বড় অল্পে অধীর হচ্ছেন কুমার!

মূর্খ! কি এসব তুমি পাগলের প্রলাপ বকছো?

এমন সময় দূরে সহসা রাত্রির স্তব্ধতায় জেগে উঠ্‌ল সেই চিরপরিচিত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ খট্‌-খট্‌-খটা-খট্‌।

দু'জনেই উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে। নিশীথ রাতের তীরন্দাজের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ না?

আকস্মিক সেই ঘোড়ার খুরের শব্দ যেন দু'জনের প্রাণে এক মৌন ত্রাসের সঞ্চার করেছে। খুরের শব্দ তখন ক্রমে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হ'য়ে এসেছে।

ভার্গবের এত ব্যঙ্গ, এত হাসি, মুহূর্তে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। বোবা ব্যগ্র ব্যাকুলতা যেন ওর চোখমুখে ও সর্বদেহ দিয়ে ফুটে বের হচ্ছে। নিজের একান্ত অজ্ঞাতে ঘুমের মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে শিউরে ওঠার মতই ভার্গব যেন শিউরে শিউরে উঠ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে।

সহসা এমন সময় মুক্ত দ্বারপথে সেই তীরন্দাজ কালো ঘোড়ার সওয়ারের প্রতিমূর্তি জেগে উঠ্‌ল। এই সেই নিশীথ রাতের তীরন্দাজ। ভার্গব চম্‌কে দু'পা নিজের অজ্ঞাতেই পিছিয়ে এল।

সহসা গম্ভীর কঠিন সুরে তীরন্দাজ বললে, এই যে শকুনি তুমি এখানেই! অনুমান তাহলে আমার মিথ্যা হয়নি। তোমার কাছে বড় প্রয়োজনেই এত রাত্রে আসতে হলো বন্ধু! রাজা হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছো কিন্তু এখনও যে রাজ-তিলকই নাওনি। এস, রাজার তিলক এঁকে দিয়ে যাই, বল্‌তে বল্‌তে সুতীক্ষ্ন বর্শার অগ্রভাগ দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে ভার্গবের কপালে দুটো দাগ কেটে দিল। তারপর হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন সহসা ঘুমের ঘোরে চোখের পাতায় জেগে উঠেই আবার ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

ভার্গব হাতের পাতাটা কপালে ছুঁয়ে প্রদীপের আলোয় মেলে ধর্‌তেই দেখ্‌তে পেলে হাতের পাতায় রক্ত লেখায় '×' দুটো রক্তের দাগ পরস্পরকে কাটাকাটি করে ফুটে উঠেছে।

সহসা দুর্জয় সিংহ ভার্গবের মুখের দিকে তাকিয়ে হা হা করে জোরে হেসে

উঠল।

ভার্গব তার একটা মাত্র চোখের অগ্নিদৃষ্টি দুর্জয় সিংহের দিকে হেনে দ্রুত পদে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। প্রদীপ শিখাটা তখনও হাওয়ায় কাঁপছে আর কাঁপছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

(মাকড়সার জাল)

দুর্জয় সিংহের কক্ষ। একাকী সে বাতায়ন পথে হাতের উপর চিবুক স্থাপনা করে গভীর চিন্তায় মগ্ন। চোখের কোলে জল। রাত্রি এখন কত হবে কে জানে? কোথায় একটা রাতজাগা পাপিয়া 'পিউ কাঁহা', 'পিউ কাঁহা' বার বার ডেকে ডেকে উঠে। আকাশ পথে তারই সুরের রেশটুকু হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেড়ায়।

কক্ষের বাতি নিবানো; স্বল্প চন্দ্রালোকের যে ক্ষীণ আভাসটুকু মাত্র কক্ষের খোলা বাতায়ন পথে এসে অনধিকার প্রবেশ করেছে, তাতে কক্ষের মধ্যে স্বপ্নময় এক আলো আঁধারের সৃষ্টি করেছে। অদূরে প্রাসাদের সীমানায় প্রাচীরের উপর একজন প্রহরী ঢাল ও তলোয়ার হাতে প্রহরায় নিযুক্ত।

কিসের চিন্তায়ই বা আজ কুমার দুর্জয় সিংহ মগ্ন? আর কেনই বা তার দুটো চোখে অশ্রুর আভাস? কেন? রাজার ছেলে, অতুল ঐশ্বর্যের ভাবী অধীশ্বর, তা'র আবার কিসের চিন্তা থাকতে পারে? আর কেনই বা চোখে তার জল? অতীতের অনুশোচনা বা দুঃখ নেই; নেই বর্তমানের উদ্বেগ বা ভবিষ্যতের চিন্তা। যা গেছে তা যা'ক। যা চলছে তা চলুক। যা আসবে আসতে দাও তাকে।

নিয়তির নির্মম রথচক্র ঘর্ঘর রবে মানুষের জীবনের পথ বেয়ে চলে যায়; অসহায় দুর্বল মানুষ শুধু নীরবে করুণ চোখে পথের ধূলার বুকে চাকার চিহ্নের দিকে চেয়ে থাকে! কিন্তু এ জগতে চিন্তা নেই কার? কার দুঃখ নেই?

হাসি-কান্না, চিন্তা ও ভুলে যাওয়া নিয়েই ত মাটির পৃথিবীর মাটির ঘরে ঘরে মানুষের ঘরকন্না গড়ে উঠে চিরকাল।

সেই ত জগতের ইতিহাস। সেই ত যুগযুগান্তের মানুষের ইতিকথা।

কাকা! একি ঘর অন্ধকার? প্রদীপ নিবে গেছে বুঝি? প্রদীপকার কি আজ এ কক্ষে বাতি দেয়নি?

কে? দুর্জয় সিংহ চমকে উঠল, সহসা তার চিন্তাজাল ছিন্ন হলো।

রাজকুমারী ইলা!

কে? ইলা! এত রাত্রে, এখনও ঘুমাও নি?

রাত্রি কি খুব বেশী হয়েছে কাকা? কিন্তু আপনিও ত ঘুমাননি?

তা মধ্যরাত্রি প্রায় হবে বৈকি। মহারাজ কোথায়?

কোন একটা বিশেষ রাজকীয় জরুরী কাজে তিনি অল্পক্ষণ আগে বাইরে

গেছেন, আমি তখন জেগেই ছিলাম। আমায় বলে গেলেন, যদি ঘুম না আসে তবে আপনার কাছে আসতে। বাবা বলছিলেন, আপনি নাকি প্রতি রাত্রেই বহুক্ষণ পর্যন্ত এমনি করে জেগে কাটান।

কে? মহারাজ বললেন বুঝি?

হাঁ।

আচ্ছা ইলা, মহারাজ আমায় খুব ভালবাসেন না?

হাঁ, খুব ভালবাসেন।

হাঁ, আমি তা বুঝতে পারি, আমার প্রতি তার কি গভীর স্নেহ। কিন্তু আর আমি তার প্রতিদানে দিবানিশি তাঁকে কী প্রতারণাই না করছি। কিন্তু কী করবো? আমার ইচ্ছা করে, এই ময়ূর পুচ্ছ ত্যাগ করে ছুটে পালিয়ে যাই। পারি না তো! দিবারাত্র সে আমার পিছু পিছু ছায়ার মত ঘোরে!

আপন মনে দুর্জয় সিংহ বকে চলে!

কী বলছেন কাকা?

কী বলছি! কিন্তু তুমি বড় ছেলেমানুষ তুমি বুঝবে না।

কাকা! ইলার স্বরে কান্নার সুর। ইলা রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে। সে দু' হাতে দুর্জয় সিংহের একখানা হাত সজোরে চেপে ধরে।

ইলা ঘুমোগে যাও, রাত অনেক হয়েছে। রাজবাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে রাত্রি তৃতীয় প্রহর ঘোষিত হলো।

ভোরের ইশারা জেগেছে মাত্র রাতের আকাশে। ঘুমের শেষে জাগরণের আভাস। দুর্জয় সিংহ এখনও ঘুমোয়নি।

সহসা খুট করে একটা মৃদু শব্দ হলো।

একটা লোক ছায়ার মতই চুপিসাড়ে এসে কক্ষের ভেতর প্রবেশ করে কক্ষের দুয়ার বন্ধ করে দিল। দুর্জয় সিংহ ফিরে দাঁড়ালো।

লোকটার মুখে একটা কাপড়ের ঢাক্‌নী দেওয়া সেটা সরিয়ে ফেলে দুর্জয় সিংহের দিকে তাকাল, ডাকল—দুর্জয় সিংহ!

চুপ! আস্তে! তুমি, তুমি এখানে কী প্রয়োজনে এসেছ?

প্রয়োজন? লোকটা অদ্ভুত হাসি হেসে বললে, প্রয়োজন অনেক কুমার দুর্জয় সিংহ।

থাক। ও ধার-করা নামে আর ডেকো না! ও নামের তীব্র উপহাসের জ্বালা আমার সর্বাঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

চমৎকার ঢং শিখেছো ত; কিন্তু আর বেশী দিন নয়, শীঘ্রই এবার জাল গুটাবো, নিশ্চিন্তে থাকো। কিন্তু আমি যা জানতে চাই শোন।

যা, জানতে চাও তুমি নিজে জেনে নিও। আমি আর কোন সংবাদই তোমায় দিতে পারব না।

পারবে না?

না…না…না। আমায় জ্বালাতন করো না, শীঘ্র যাও।

মূর্খ ! ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছো—না ? সুন্দরলালকে আজো চেননি ! নিজ হাতে যে সোনার তক্তে তোমায় বসিয়েছি, সেখান হতে মুহূর্তে টেনে পথের ধূলোয় আন্‌তে পারি জান ?

একবার কেন, একশ বার জানি বলে হাঃ হাঃ করে দুর্জয় সিংহ হেসে উঠল। ওসব কথা থাক ! এস দু'জনে সন্ধি করা যা'ক। এক যাত্রায় পৃথক ফলে লাভ কি ? তুমি যা' সংবাদ জানতে চাও আমি তোমায় দেব, কিন্তু তোমার কাছেও আমি একটা সংবাদ জানতে চাই।

কী ?

সিংহবাহন কোথায় বলতে পার ?

সুন্দরলাল চমকে উঠল, পরে বললে, কে ?

সিংহবাহন ?

সিংহবাহন ত মৃত। জান না, তার একখানা কাটা হাত মোহরের ঝাঁপিতে ও অন্যটা তার গৃহে পাওয়া গেছিল।

হুঁ, শুধু তাই কেন ? তার ঐ হাত দু'খানা ছাড়া দেহের আর কোন অংশের পাত্তা পর্যন্ত মেলেনি এও জানি ! কিন্তু ও সব গল্প-কাহিনী শোনবার জন্য তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই ; আমি জানতে চাই সেই সিংহবাহন এখন কোথায় ?

তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে নইলে এ সব কী আবোল তাবোল বকছো কুমার ?

মাথা খারাপই হয়েছে বটে ! দুর্জয় সিংহের ওষ্ঠে বড় দুঃখেই একটুখানি হাসির আভাস জেগে ওঠে। তারপর আপন মনে বলতে থাকে, আমি জানি এ সংবাদ তুমি জান অথচ তুমি দেবে না। কিন্তু আমিও জানবই।

বৃথা চেষ্টা। তার সংবাদ জানতে হলে পৃথিবীর অপর পারে যেতে হবে। এপারে আর তার দেখা মিলবে না। আচ্ছা আমি এখন আসি। আজ রাত্রে ধর্মশালায় যেও সেখানে কথা আছে।

সুন্দরলাল ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সুন্দরলাল চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ দুর্জয় সিংহ আনমনে কক্ষের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াল।

ক্রমে দিনের আলো পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। নহবতের সানাইয়ের আলাপও এক সময় থেমে যায়। দুর্জয় সিংহ তখনও কক্ষের মাঝে পায়চারি করে ফিরছে আর ঘুরছে।

মহারাজ চন্দন সিংহ কক্ষে এসে প্রবেশ করল। রাজসভায় যাবার সময় হয়েছে। সদ্যস্নাত চুয়াচন্দনচর্চিত সুন্দর মুখশ্রী শ্রদ্ধায় শির অবনত হয়ে আসে।

ইলা বলছিল, তুমি নাকি কাল সারা রাত ঘুমাও নি ? শরীর অসুস্থ না কি ?

দুর্জয় সিংহ অবনত হয়ে মহারাজের চরণতলে প্রণতি জানালো।

রাজসভায় যাবে না ? মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন।

রাজসভায় যেতে মন আমার চায় না, দুর্জয় সিংহের গলার স্বর বুজে আসে চোখের দৃষ্টি অশ্রু-বাষ্পে ঝাপসা হয়ে আসে।

দাদা ! দুর্জয় সিংহ ডাকে।

মহারাজ যেন চমকে ওঠেন, আমায় কিছু বলবে ? দুর্জয় সিংহের মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থাপনা করেন।

দাদা আপনার চারদিকে যে শত্রুরা জাল বিছিয়েছে তা কি আপনি টের পান না ?

চন্দন সিংহের ওষ্ঠে অতি অস্পষ্ট একটু হাসির আভাস জেগে ওঠে। তারপর সস্নেহে ভায়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন ঃ ওরে আমি যে দেশের রাজা। এত অল্পে অধীর হওয়া কি আমার সাজে ? আমি জানি সব ; বুঝতেও পারি সব কিছুই। ওরা ভাবে ওরাই বুঝি একমাত্র চালাক আর দুনিয়ায় সবাই বোকা ! কিন্তু এ ষড়যন্ত্রের মূলে যারা লুকিয়ে আছে তারা কেউই আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। ওরা বোঝে না, নিজেদের স্বার্থ নিয়ে দিবারাত্র নিজেদের মধ্যে এমনি করে খাওয়াখাওয়ি করে ওরা যে নিজেদেরই দুর্বল করে ফেলে। যুগে যুগে এমনি করেই জাতির অধঃপতন ঘনিয়ে এসেছে। কত জাতি এমনি করে ধুলোয় মিশিয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানি এ বিপ্লবের শেষ নেই। আজ আমার মৃত্যু যদি হয় ওদের হাতে, আর কেউ বসে সিংহাসনে, আবার যেতে না যেতেই ঠিক এখনকার মত অসন্তোষের ধোঁয়া দুদিনে এসে জড়ো হবে। কেননা ওটাই ওদের ধর্ম। ওরা সুখী হতে জানে না তাই কিছুতেই সুখী হতে পারে না !

দুর্জয় সিংহের অন্তর শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে। এত উদার ! এত মহৎ মহারাজ চন্দন সিংহের অন্তর ! মহারাজ চন্দন সিংহ ! তুমিই রাজার উপযুক্ত !

ধর্মশালার এক নিভৃত কক্ষ। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। অল্পক্ষণ আগে দূরে ঘননির্জন বনপ্রান্ত হতে শৃগালের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। পাথরের কুলঙ্গীতে একটা পাথরের বাতিদানে একটা মাটির তৈল-প্রদীপ জ্বলছে। কক্ষের মাঝে একটা মাত্র ছোট বাতায়ন। একটা মাত্র দুয়ার ; তারও কবাট ভিতর হতে অর্গলবদ্ধ। ঘরের মধ্যে একাকী সুন্দরলাল পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

দরজার কবাটে টুক টুক করে মৃদু দুটো টোকা পড়ল।

সুন্দরলাল এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে। এসো কুমার দুর্জয় সিংহ !

দুর্জয় দক্ষিণ হস্তের একটা অঙ্গুলি দুই ওষ্ঠের উপর স্থাপন করে ইশারায় চুপ হতে বলল।

আমি ভাবছিলাম, তুমি বুঝি আর এলে না।

তোমার অনুমান সত্য ! আমি মনে মনে একপ্রকার ঠিকই করে ফেলেছিলাম আসব না ; কিন্তু আসতে হল শেষ পর্যন্ত ! দুর্জয় সিংহ জবাব দিল। তারপর একটু থেমে থেমে আস্তে আস্তে বললে, আমি আমার সত্য পরিচয় আজই

মহারাজকে দেব !···এমনি করে আর লুকোচুরি খেলতে পারছি না, একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি।···

মূর্খ ! তুমি কি ভেবেছ, পরিচয় দিয়ে এখন সাধু সাজবার চেষ্টা করলেই মহারাজের হাত হতে রক্ষা পাবে ? মাকড়সার জালে মাছি পড়লে সে কখনও মাকড়সার হাত হতে নিষ্কৃতি পায় ?

কিন্তু আমি !—দুর্জয় সিংহ আমতা আমতা করে কি যেন বলতে চাইল।

তুমি ! হাঃ হাঃ করে সুন্দরলাল হেসে ওঠে। তার সেই কঠিন হাসির দুর্দাম রেশ ছোট্ট কক্ষের পাষাণ গাত্রে ঠোকর খেয়ে খেয়ে ঝন্ ঝন্ করে যেন বেজে ওঠে।

সুন্দরলাল ! তুমি যদি ভেবে থাক মৃত্যুভয়ে আজ আমি কাতর হয়ে পড়েছি তবে তোমার সে অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আজও আমার এই দুই বাহুতে অসীম শক্তি ধরে ; বুকে আছে দুঃসাহস !

তাই যদি হয়, তবে কেন তুমি এতদূর এগিয়ে এসে পিছিয়ে যেতে চাও ? এত বড় রাজ্য আজ তোমার করায়ত্ত—এ অবস্থায় তোমার এ অহেতুক ছেলে-মানুষির কী সার্থকতা আছে ?

দুর্জয় সিংহ চুপ করে ভাবতে থাকে ; সত্যই এত বড় সুবিশাল রাজ-ঐশ্বর্য আজ তার একেবারে করায়ত্ত !···আজ তার একটা মাত্র মুখের কথায় সহস্র সহস্রলোক ছুটে আসে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অফুরন্ত প্রাচুর্যতার মাঝে একান্ত নিরুদ্বেগে দিন কেটে যাচ্ছে ; ভাবনা নেই, দুশ্চিন্তা নেই, একেবারে সহজ, সরল, অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি !···আর কে জানে তাকে ? তার পরিচয় সে ত কেউই জানে না। এই অতুল সুখ-ঐশ্বর্য ছেড়ে কোথায় কোন অনিশ্চিতের মাঝে গিয়ে ঝাঁপ দেবে।

কিন্তু তখুনিই আর একখানি শান্ত-ধীর-ক্ষমা-সুন্দর মুখ মনের কোণে এসে উঁকি দেয় ; সেই অনাবিল স্নেহ, সেই অন্ধ বিশ্বাস। না না সে পারবে না। পারবে না সে মহারাজ চন্দন সিংহকে এমনি করে প্রতারণা করতে।

একদিকে লোভ অন্যদিকে বিবেকের কষাঘাত, দুইয়ের মাঝে পড়ে দুর্জয় সিংহ হাঁপিয়ে ওঠে। কি করবে সে ? কে তাকে পথ দেখাবে এ সংকটে ?

কি ভাবছ কুমার ? সুন্দরলাল দুর্জয় সিংহের চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে।

দুর্জয় সিংহ সুন্দরলালের প্রশ্নে কোন জবাব না দিয়ে কক্ষের মাঝে দ্রুত পায়চারি করতে শুরু করে। সুন্দরলাল দুর্জয় সিংহের চঞ্চলতা গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

(ঝড় উঠ্‌ল)

অনেকক্ষণ পরে সুন্দরলাল ডাকে, কুমার দুর্জয় সিংহ!

দুর্জয় সিংহ মুখ তুলে তাকায়।

ভার্গব তোমাকে সন্দেহ করেছে জান?

জানি।

জান?

হাঁ জানি; আর এও জানি সেও আমারই মত সিংহবাহনের খোঁজে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে!…

অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে? তোমার কথা ত আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না?

কুমার দুর্জয় সিংহ! সুন্দরলালের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর!

বুঝতে পারছ না! কিন্তু না বুঝবার মত ত এর মধ্যে কিছুই নেই? অত্যন্ত সহজ ও সরল, কিন্তু সে কথা যাক্, তুমি আজ রাত্রে কেন এখানে আসতে বলেছিলে সুন্দরলাল?

সে কথা এখন থাক্! আমার প্রশ্নের উত্তরটা আগে দাও!

শোন সুন্দরলাল! মহারাজ চন্দন সিংহকে যতখানি নিশ্চিন্ত ও সহজ ভাবো ততখানি ঠিক তিনি নন। সূচের মতই তীক্ষ্ন তাঁর বুদ্ধি। নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতনও যথেষ্ট।…তোমাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে তাঁকে এতটুকুও বেগ পেতে হবে না।

মহারাজ চন্দন সিংহ যতই তীক্ষ্ন বুদ্ধিশালী ও শক্তির আধার হন না কেন, তাকে সুন্দরলাল ডরায় না। তুমি একটা সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবে কুমার? তবে বিনা কৌশলে সফল হতে পারবে না।

কি সংবাদ?

মহারাজের খুল্লতাত অর্থাৎ দুর্জয় সিংহের পিতা এখন কোথায় এই সংবাদটা তুমি মহারাজ চন্দন সিংহের নিকট হতে কৌশলে জেনে নেবে। এবিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত যে, তিনি মহারাজের হাতে বন্দী। কিন্তু কোথায়? কেন না আমি জানি, মহারাজ, আর যাই হোক আপন খুল্লতাতকে মারতে পারেন না! আমার এত দিনকার পুষে রাখা আশা সে কি একেবারে বৃথাই হবে? না না, সে আমি কিছুতেই হতে দেব না। শেষের কথাগুলো সুন্দরলাল যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই বলল।

দুর্জয় সিংহ প্রাসাদে ফিরে এল। রাত্রি তখনও শেষ হয়নি। শুধু আকাশের গায়ে অস্পষ্ট কুয়াশার আবরণের মত আঁধারের একটা আভাস যাই যাই করছে। প্রদীপকার প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে কক্ষে কক্ষে প্রদীপ নেভাতে

শুরু করেছে।

দুর্জয় সিংহ গুপ্ত পথ দিয়ে প্রাসাদে ঢুকতে যাচ্ছিল, সহসা একটা সুতীক্ষ্ন তলোয়ারের অগ্রভাগ বিদ্যুৎগতিতে পথরোধ করল!

দুর্জয় সিংহ। গম্ভীর চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন এল।

একি? এ যে স্বয়ং মহারাজ চন্দন সিংহের কণ্ঠস্বর। দুর্জয় সিংহ চমকে উঠল। অদূরে প্রাচীর গাত্রে একটা আলো জ্বলছে, তারই খানিকটা এদিকটায় এসে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই অস্পষ্ট মৃদু আলোয় দুর্জয় সিংহ দেখল, শুধু একা মহারাজ নন, তার পাশেই দাঁড়িয়ে ভার্গব; একটা কুটিল হাসির ঢেউ যেন তার চোখে মুখে খেলে যাচ্ছে।

দুর্জয় সিংহ। এত রাত্রে তুমি কোথায় গেছিলে?

দুর্জয় সিংহ নীরবে মাথা নীচু করল। কী জবাব দেবে সে?

নীরব কেন? উত্তর চাই! দাও, উত্তর দাও।

কিন্তু তথাপি দুর্জয় সিংহ নীরব।

বিশ্বাসঘাতক; শয়তান!···রাজবংশের কলংক!···তোমার মৃত্যুই মঙ্গল। মহারাজ ক্ষিপ্রগতিতে অসি টেনে বের করলেন।—

সহসা সেই সময় পশ্চাৎ হতে কে যেন বলে উঠল: ক্ষান্ত হন মহারাজ!··· বিশ্বাসঘাতক দুর্জয় সিংহ নন,···বিশ্বাসঘাতক যে সে আপনার পাশেই।

মহারাজ চকিতে ফিরে দাঁড়ালেন···কে?

প্রাসাদ অলিন্দে স্বল্প আলো-আঁধারে দাঁড়িয়ে নিশীথ রাতের তীরন্দাজ।

মহারাজ এই শয়তান ভার্গবের কপালের শিরস্ত্রাণ সরিয়ে লক্ষ্য করুন; দেখবেন—এখনও আমার দেওয়া রাজ-তিলক ভাল করে হয়ত শুকিয়েও ওঠেনি!

ভার্গব বিদ্যুৎগতিতে কোমর হতে সুতীক্ষ্ন ছোরা টেনে নিয়ে নিশীথ রাতের তীরন্দাজকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করল। কিন্তু চোখের পলকে তীরন্দাজ সেটা ডান হাত দিয়ে লুফে নিয়ে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল।

আচ্ছা চললাম। বিদায়!···আবার শীঘ্রই দেখা করবো, এবং আশা করি সেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। চকিতে তীরন্দাজ অদৃশ্য হয়ে গেল, তার কঠিন হাসির রেশ তখনও প্রাচীর গাত্রে খল খল করে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

মহারাজ পাশে তাকাতে গিয়ে দেখলেন, পাশে ভার্গব নেই, ইতিমধ্যে কখন সে এক সময় নিঃশব্দে সরে গেছে।

দুর্জয় কক্ষে চল···মহারাজ দুর্জয় সিংহকে বললেন। দুজনে মহারাজের কক্ষের দিকে চললেন।

অন্ধকার রাত্রি। চারদিকের কঠিন নিস্তব্ধতা নিঃসঙ্গ আঁধারে চাপ বেঁধে উঠেছে। কালো আকাশের গায়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লক্ষ কোটি হীরার কুচির মত তারাগুলি ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে আর জ্বলছে!···ঐ দূরে মানুষের নাগালের বাইরে নীল আকাশের গহন নীলিমায় চোখের দৃষ্টি যেখানে গিয়ে

আহত হয়ে ফিরে আসে। কে তোমরা মেঘপুরীর অজানা অচেনার দল এমনি করে নিত্য বাতায়নে বাতায়নে তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে এই মাটির পৃথিবীর দিকে সারাটা রজনী তাকিয়ে থাক? তোমরা কে? আঁধার রাতের কানে কানে কি কথা তোমরা বল?

মহারাজ চন্দন সিংহ মুক্ত বাতায়ন পথে হাতের উপর চিবুক স্থাপনা করে গভীর চিন্তায় মগ্ন। শেষ পর্যন্ত তার এত আদরের ছোট ভাই পর্যন্ত তার বিপক্ষে দাঁড়াল! এরপর কাকেই বা তিনি বিশ্বাস করতে পারেন।...

খুট্ করে একটা শব্দ হলো, মহারাজ কিন্তু টের পেলেন না।

কে একজন লোক সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে ঢেকে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে মহারাজের পেছন দিক দিয়ে এগিয়ে আসছে, ডান হাতের দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ চকচকে একখানা ছোরা।

সহসা এমন সময় একটা তীক্ষ্ন হাসির শব্দ ঘরের জমাট নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মহারাজ চমকে উঠলেন এবং সঙ্গে সেই লোকটাও—যে ছোরা হাতে চুপিচুপি এগিয়ে আসছিল।

অপরিচিত কণ্ঠে শ্লেষ দিয়ে কে যেন বললে, মহারাজ! আপনার পরম বিশ্বাসের পাত্র ভার্গব চুপিচুপি ছদ্মবেশে ছোরা হাতে কি দরকারে বুঝি এত রাত্রে আপনার ঘরে এসেছে দেখুন!...

মহারাজ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে ফিরে তাকালেন। ওপাশের উন্মুক্ত বাতায়নের উপর বর্শার উপর শরীরের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে 'নিশীথ রাতের তীরন্দাজ'!...

লোকটা ততক্ষণে চমকে উঠে পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যে মুহূর্তে সে দরজার দিকে পা বাড়াতে যাবে, ঠিক সেইক্ষণে তীরন্দাজ বাতায়নের উপর হতে চোখের পলকে এক লাফ দিয়ে ছদ্মবেশী লোকটার সামনে এসে পড়ল এবং হাতের বর্শাটা উঁচিয়ে লোকটার গতিরোধ করল।...

মহারাজও দ্রুত এগিয়ে এলেন।

বন্ধু ঘোমটা খোল! চাঁদ মুখখানা একটিবার দেখতে দাও।...ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে কথাগুলো বলতে বলতে তীরন্দাজ হাত দিয়ে মুখের ঢাকনীটা ধরে এক টান দিল, এবং কক্ষের প্রদীপের আলো সেই মুখের উপর প্রতিফলিত হতেই যেন ভূত দেখছে এমনি ভাবে সভয়ে একটা অস্ফুট চীৎকার করে তীরন্দাজ পশ্চাৎ দিকে হটে এল!

মহারাজও একটা অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

(অসিমুখে)

মহারাজ চন্দন সিংহের খুল্লতাত ও দুর্জয় সিংহের পিতা স্বয়ং বিক্রম সিংহ!...বিক্রম সিংহের কেমন যেন একটা আচ্ছন্নর মত ভাব!...চোখের দৃষ্টি অসংবদ্ধ!

কাকা!

সহসা এমন সময় ভার্গব এসে কক্ষের দরজা খুলে প্রবেশ করল এবং তীক্ষ্ন কঠিন কণ্ঠে তীরন্দাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, মহারাজ পলাতক সিংহবাহন আপনার সম্মুখে। বন্দী করুন!…সিংহবাহনের মৃত্যু সত্যসত্যই হয়নি!…

বিস্ময়ের পর বিস্ময়!…

মহারাজ চমকে তীরন্দাজের দিকে ফিরে তাকালেন!…কিন্তু তীরন্দাজ ততক্ষণে এক লাফ দিয়ে খোলা বাতায়নের উপরে গিয়ে উঠেছে।

সিংহবাহন মরেনি একথা সত্য ভার্গব, কিন্তু তোমার কেরামতি বানচাল হয়ে গেছে!…তোমার হাতের নিক্ষিপ্ত শর তোমার বুকেই ফিরে এল, সিংহবাহনের তাতে এতটুকু ক্ষতিও করতে পারলে না!…বলে সড় সড় করে বাতায়ন পথে ঝোলান একটা মোটা দড়ি ধরে তীরন্দাজ ঝুলে পড়ল। তিনটি প্রাণী নির্বাক! তারা যেন বোবা বনে গেছে!…

বাতায়নের ঠিক নীচেই দাঁড়িয়েছিল তার ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে পড়ে বল্গা ধরতেই অন্ধকার হতে কে একজন বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীক্ষ্ন তলোয়ার উঠিয়ে তীরন্দাজের গতিরোধ করল!…শিক্ষিত আরোহী প্রভুকে নিয়ে সামনের দিকের পা দুটো তুলে পশ্চাতের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

কে তুমি তীরন্দাজ? কী তোমার পরিচয়? লোকটা প্রশ্ন করল।

কুমার দুর্জয় সিংহ!… পথ ছাড়ুন!

পরিচয় না দিয়ে এক পাও এগুতে পারবে না!

তীরন্দাজ হেসে উঠে ঃ সামান্য একজন তীরন্দাজ মাত্র! আমার পরিচয়ে আপনার কি হবে কুমার?…এই রাজ্যেরই সামান্য দীনহীন একজন প্রজা মাত্র—এর বেশী পরিচয় আমার দেবার মত নেই রাজকুমার! আমার পথ ছেড়ে দিন।

না, না! আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাইনে!

কাল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে নীল দুর্গে দেখা হবে!…

দুর্জয় সিংহ তীরন্দাজের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল, তীরন্দাজ তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘোড়ার খুরের শব্দ তখনও একেবারে মিলিয়ে যায়নি, দূর হতে অস্পষ্ট শোনা যায়।

দুর্জয়! মহারাজ চন্দন সিংহের কণ্ঠস্বরে দুর্জয় সিংহ চমকে উঠে।

এ কি! সিংহবাহনকে ছেড়ে দিলে? মূর্খ!… কি করলে?…মহারাজের স্বরে ব্যাকুলতা!

মহারাজ কক্ষে চলুন!…

না আমি যাই…মহারাজ অশ্বশালার দিকে ছুটলেন!…

মহারাজ ফিরুন! তীরন্দাজের অশ্বের গতি কারও কাছে পরাভব মানে না!

মহারাজ তবু ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শুক্লা সপ্তমীর ক্ষীণ চাঁদ আকাশের এক প্রান্তে কেমন যেন বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ মনে হয়। ম্লান চন্দ্রালোকে হ্রদের কালো জলের বুকে নীল দুর্গের কালো অস্পষ্ট ছায়া থির থির করে কাঁপে। ঝিঁঝির একঘেয়ে আর্তনাদ প্রকৃতির নিঃসঙ্গতায় ছড়িয়ে যাচ্ছে।...মাঝে মাঝে শাল-মহুয়ার পত্র-মর্মর নিশীথের হাওয়ায় ভেসে আসে! নিঃশব্দে ঘোড়া হতে দুর্জয় সিংহ এসে হ্রদের তীরে নামল। তারপর ঘোড়ার লাগাম একটা শাল বৃক্ষের গুঁড়ির গায়ে বেঁধে ধীরে ধীরে হ্রদের জলে গিয়ে নামল। নিঃশব্দে সাঁতার কেটে হ্রদের দিকে এগিয়ে চলে!...

দুর্জয় সিংহ সাঁতার দিয়ে এসে দুর্গের গায়ে ঝোলান লোহার শিকল ধরল! সেদিন দ্বিপ্রহরেই সে তীরন্দাজের এক পত্র-মারফত সমস্ত কিছু জেনেছিল। গুপ্তদ্বার খোলাই ছিল, খুঁজে নিতে বেশী বেগ পেতে হলো না। কিন্তু সেই গুপ্তদ্বার পথে দুর্গের বহিরাংশে গিয়ে দাঁড়াতেই, অল্প আলো-আঁধারীতে একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি তার পথরোধ করল।

কুমার দুর্জয় সিংহ! দাঁড়াও!

কে? সুন্দরলাল, বিস্মিত দুর্জয় সিংহের কণ্ঠ দিয়ে বের হয়ে এল।

তোমার অনুমান সত্য। এখানে আর তোমার কোন প্রয়োজন নেই। যে অশ্বে চেপে দুর্গে এসেছো, সেই অশ্বে চেপেই এই মুহূর্তে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। তোমার পারিশ্রমিক রাস্তার তেমাথায় সেই বড় বট গাছের তলায় একটা লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছ হতে বুঝে নিও!...

ব্যঙ্গমিশ্রিত কঠিন কণ্ঠে দুর্জয় সিংহ বলল: যবনিকা এখনও পড়েনি! এখনও একটু দেরী আছে। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ সুন্দরলাল তোমার হাতের পুতুল হতে আমার এতটুকুও ইচ্ছা নেই।

ইচ্ছা নেই? তবে কি রাজা হবার ইচ্ছা আছে নাকি?

ক্ষতি কি? বেশ ত, তখন না হয় তোমায় আমার রাজ্যের প্রধান সেনাপতি করা যাবে কি বল?

অপরিণামদর্শী বালক! সহসা সুন্দরলালের হাতের অসি ঝন্‌ঝন্‌ করে কেঁপে উঠল।

দুর্জয় সিংহও ক্ষিপ্র গতিতে কোষ হতে তলোয়ার মুক্ত করে সুন্দরলালের উদ্যত অসির আঘাত প্রতিরোধ করল!

সুন্দরলাল ও দুর্জয় সিংহের মধ্যে অসিযুদ্ধ আরম্ভ হলো। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দুর্গের পাষাণ চত্বরে আবছা আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে, দু'খানা অসির আঘাত ও প্রতিঘাতের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ দুর্গপ্রাচীরের পাষাণ গাত্রে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সহসা সুন্দরলাল তার তীক্ষ্ণ অসির সূচের মত অগ্রভাগ দুর্জয় সিংহের বক্ষের মাঝে আমূল বিদ্ধ করে দিল।

এক হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে উঃ শব্দ করে দুর্জয় সিংহ বসে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে খোলা গুপ্তদ্বার পথে প্রথমে মহারাজ চন্দন সিংহ, তাঁর পশ্চাতে ভার্গব ও তার পশ্চাতে তীরন্দাজ এসে একে একে প্রবেশ করল।

তীরন্দাজ এক লাফে কোষ হতে তলোয়ার মুক্ত করে সুন্দরলালের সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সুন্দরলাল! এস বন্ধু, এবার তোমার ও আমার পালা।

ওদিকে দুর্জয় সিংহের এই অবস্থা দেখে চন্দন সিংহ আকুল চীৎকারে ভাইয়ের দিকে ছুটে গিয়ে দু'হাতে রক্তাক্ত কলেবর ভাইকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়! দুর্জয়! ভাই!

তীরন্দাজের যেন সেদিকে লক্ষ্যই নেই।···তীরন্দাজ ও সুন্দরলালের দু'খানা অসি ততক্ষণে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে আঘাত ও প্রতিঘাতের শব্দ তুলছে। অসি চালনায় সুনিপুণ তীরন্দাজ।

যুদ্ধে পরিশ্রান্ত সুন্দরলাল। অক্লেশে অতি সহজে তীরন্দাজ সুন্দরলালের তলোয়ারের প্রতিটি আঘাত যত প্রতিরোধ করে, সুন্দরলাল ততই মরীয়া হয়ে যেন একেবারে ক্ষেপে ওঠে। চক্রাকারে সন্‌ সন্‌ শব্দে দু'খানা তীক্ষ্ণ অসি মাথার উপর আশেপাশে চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। মাঝে মাঝে আঘাতে প্রতিঘাতে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ জাগায়।···সুন্দরলাল যেন আজ মৃত্যুপণ করেছে।

আর তীরন্দাজ সেও আজ একান্ত সতর্ক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সহসা তীরন্দাজের তলোয়ারের এক প্রচণ্ড আঘাতে সুন্দরলালের হাতের তলোয়ারখানা ছিটকে দুর্গের কঠিন পাষাণ চত্বরের উপর পড়ে ঠন্‌ করে বেজে উঠল।

মহারাজ! আপনার বিশ্বস্ত সেনাপতি মৃত সিংহবাহন আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখুন।

মহারাজ মুহূর্তের জন্য শোক ভুলে চমকে ফিরে তাকালেন!

ভার্গব ও মরণোন্মুখ দুর্জয় সিংহ ফিরে তাকাল।

অস্ফুট কণ্ঠে মহারাজ শুধু বললেন, সিংহবাহন!

হ্যাঁ! সিংহবাহন! ইনিই সুন্দরলাল···ইনিই সাপুড়ে ও হতভাগ্য নির্দোষ শৈবালকুমারের হত্যাকারী, সকল অপকর্মের হোতা সিংহবাহন!···কিন্তু আজকের দিনে এই শয়তানের হত্যার অপরাধ স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমার শেষ কাজ করে যাই, বলতে বলতে তীরন্দাজ তার উদ্যত তলোয়ারের সূচ্যাগ্রভাগ সমূলে সিংহবাহনের বুকের মাঝে বসিয়ে দিল। একটা অস্পষ্ট চীৎকার করে সিংহবাহন দুর্গের পাষাণ চত্বরে লুটিয়ে পড়ল! ফিনকি দিয়ে তাজা রক্ত মুহূর্তে পাষাণ চত্বর ভাসিয়ে দিল।

আমার কাজও শেষ।···এই রইলো আমার তলোয়ার···আপনারা সকলেই আমার পরিচয় জানতে উদগ্রীব ছিলেন,...তাই আমার পরিচয় এই পত্রে রেখে গেলাম।

একখানা ভাঁজ করা পত্র পাষাণ চত্বরের উপর রেখে দ্রুত পদে গিয়ে তীরন্দাজ প্রাচীর গাত্রস্থিত পাষাণ বেদীর উপর লাফিয়ে উঠল, বিদায়!···প্রাচীর টপকে তীরন্দাজ হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঠিক যেন সেই মুহূর্তে একটি ক্ষীণ আকুল ডাক শোনা গেল, দাদা! দাদা!···বিদায়! বিদায়!···

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

(উপসংহার)

দাদা ! দাদা ! ক্ষীণ শব্দ বাতাসে মিলিয়ে গেল।

চন্দন সিংহ চমকে উঠলেন !

ঝপাং করে জলের শব্দ উঠল।

মহারাজ ছুটে বেদীর উপরে লাফিয়ে উঠলেন !

রাতের আঁধার ভাল করে তখনও অস্পষ্ট হয়নি। হ্রদের জলের বুকে ঢেউ চক্রাকারে ক্রমে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। আবর্ত যা একটু আগে জেগেছিল তাও মিলিয়ে যাচ্ছে।

যতটা সম্ভব মহারাজ তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন, কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না।···

ধীরে অতি ধীরে একটু একটু করে রাতের আকাশের গায়ে আঁধার অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।···ভোরের ইশারায় আলোর চাপা আভাস প্রকাশ পায়।

সিংহবাহনের প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

দুর্জয় সিংহেরও শেষের ক্ষণ বুঝি ঘনিয়ে এল।

এক সময়ে ভোরের আলোয় চারদিক পরিষ্কার হয়ে ওঠে ! মহারাজ চন্দন সিংহ পত্রখানা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

মহারাজ !

আজ আর গোপনতার আশ্রয় নেব না। আমিই আপনার নিরুদ্দিষ্ট ভাই হতভাগ্য দুর্জয় সিংহ। আজ চিরবিদায়ের আগে শেষ বারের মত ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি। ছোট ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করবেন।

মনে পড়ে সেই চিরবিদায়ের রাত্রি। সে দিন বড় অভিমানই বুকে আমার বেজেছিল। আপনি আমার উপরে বিশ্বাস রাখতে পারছেন না ! কিন্তু সেদিনও সব আমার অজানাই ছিল। আপনার কক্ষ হতে বেরিয়ে অশ্বশালা হতে মুকুটকে নিয়ে সেই রাত্রেই চলে এলাম। পথে গুপ্ত শত্রুর হস্তে ধরা পড়ে নীল দুর্গে বন্দী হলাম !···বন্দী জীবনের দুঃখ ভুলবার জন্য অস্ত্র শিক্ষা আরম্ভ করি নিজে নিজেই। কিন্তু তখনও জানি না আমায় কে নীল দুর্গে বন্দী করে রেখেছে। এমন সময় দুর্গের এক পথ আবিষ্কার করে দুর্গের বাইরে গোপনে যাতায়াত শুরু করলাম। হঠাৎ একদিন আচমকা আবিষ্কার করলাম আমায় যে বন্দী করে রেখেছে সে আর কেউ নয় সিংহবাহন স্বয়ং ; কিন্তু সিংহবাহন আমায় চিনতে পারলে না।···সেইদিনই আমি প্রথম বুঝতে পারি আপনার চারিপাশে কতবড় একটা গভীর চক্রান্ত গড়ে উঠেছে আপনার নিরীহ, সহজ ও সরল প্রকৃতির সুযোগ নিয়ে। সেই দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, যেমন করে হোক ঐ চক্রান্ত জাল ছিন্ন করবো ! তীরন্দাজের ছদ্মবেশে রাজ্যে ফিরে এলাম ;

তারপরের সকল ব্যাপারই আপনি জানেন।

শৈবালকুমার ও উদয়াদিত্য আমার পরিচয় জানত, এবং উদয়াদিত্য আমারই প্রেরিত লোক ; সে আমায় প্রাসাদের সকল খবর সরবরাহ করত। গোপনে খোঁজ নিয়ে নিয়ে চক্রান্তের সবই জানলাম, এও জানলাম সিংহবাহন চক্রান্ত করে একটা বাজে লোককে হত্যা করে তার একখানা কাটা হাতে নিজের নামাঙ্কিত আংটি পরিয়ে মোহরের ঝাঁপিতে ভরে ইচ্ছা করে যাতে আপনার নজরে পড়ে সেইজন্য আপনার কক্ষের পাশ দিয়ে নেওয়াচ্ছিল। তার মতলব ছিল, এতে করে সকলেরই মনে বদ্ধমূল ধারণা হবে যে, সিংহবাহন মারা গেছে এবং নিজেকে মৃত প্রতিপন্ন করে অনায়াসেই সে ছদ্মবেশে নিজের কাজ গোপনে হাসিল করতে পারবে। কিন্তু তার এ চাল আর একজন ধরে ফেলল, সে মন্ত্রী ভার্গব। কেননা ভার্গব নিজেও মনে মনে আপনার ধ্বংসের উপায় খুঁজে ফিরছিল।

সিংহবাহন আর একটা গভীর চাল চেলেছিল। অবিকল আমারই মত একটা লোক বিদেশ হতে খুঁজে এনে তাকে সে প্রাণের ভয় দেখিয়ে দুর্জয় সিংহ বলে দাঁড় করাল। এতে করে সে অনায়াসেই নিজের কাজ হাসিল করতে পারবে ভেবেছিল। কিন্তু সিংহবাহনের আসল পরিচয় সে জানত না ; সিংহবাহনকে সে সুন্দরলাল বলেই জানত এবং নিজে সে লোক তত খারাপও নয় ; দুর্জয় সিংহ সেজে রাজ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু তার মনে জাগল দারুণ অনুশোচনা।

সে দিবারাত্র মনের মাঝে বিবেকের দংশনে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল। নকল দুর্জয় সিংহ সকলের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও ভার্গবের চোখে ধুলো দিতে পারেনি। কিন্তু ভার্গব জানতে পেরেও সকল কিছুই গোপন করে রাখল নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে। এমন সময় সিংহবাহন দেখল, সকল কথা জানতে হলে একেবারে লুকিয়ে থাকলে হবে না ; তাই সে সাপুড়ের ছদ্মবেশে গিয়ে নগরে প্রবেশ করল। তার মনে আরো একটা মতলব ছিল—বোধ হয় নকল দুর্জয় সিংহকে নিয়ে প্রজা বা দেশবাসীর মনের মধ্যে কোন সংশয় বা গোলমাল জেগেছে কিনা সেটাও পরীক্ষা করে দেখা। এমন সময় সিংহবাহন যখন একদিন সাপুড়ের বেশে খেলা দেখাচ্ছে দৈবক্রমে নকল দুর্জয় সিংহ ও শৈবালকুমার গিয়ে উপস্থিত। সিংহবাহনের চোখের দৃষ্টি শৈবালকুমারের মনে কেমন যেন সন্দেহ জাগাল। কেননা, সিংহবাহনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার শৈবালের যথেষ্টই সুযোগ হয়েছিল ; ধূর্ত সিংহবাহন প্রথমদিকে শৈবালকুমারকেও হাত করার চেষ্টায় ছিল কিন্তু সফল হতে পারেনি। জগতে সকলেই সিংহবাহন বা ভার্গবের মত নিমকহারাম বা অকৃতজ্ঞ নয়। যাহোক শৈবালকুমারের হাবভাব ও কথাবার্তার ধরন দেখে সিংহবাহন তটস্থ ও যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে উঠল এবং সেই রাত্রে শৈবালকুমার যখন তাকে দেখা করবার কথা বলে তখন সে গোপনে ও মনে মনে শৈবালকুমারকে হত্যা করবার জন্য এক প্রকার স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েই যায়। লোকমুখে সংবাদ পেয়ে আমি যখন গিয়ে সেখানে পৌঁছলাম, তখন হতভাগ্য শৈবালের শেষ মুহূর্তটা ঘনিয়ে এসেছে।

এরপর সিংহবাহন দেখল আর দেরী করা মানে নিজের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার

করা ; এবং সেটা হবে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চন্দন সিংহকে হত্যা করে দুর্জয়কে সিংহাসনে বসাতে হবে। তারপর দুর্জয়কে সিংহাসনে বসিয়ে তাকে হাতের পুতুল করে নিজের ইচ্ছামত চালাতে কোন বেগ পেতেই হবে না এবং পরে ঝোপ বুঝে কোপ মারলেই চলবে অর্থাৎ দুর্জয়কে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করা এমন কিছুই কষ্টকর হবে না।

পরের দিনই রাত্রে সিংহবাহন গোপনে নকল দুর্জয়ের সাথে গিয়ে দেখা করল কিন্তু সে রাত্রে নকল দুর্জয়ের সাথে কথাবার্তা বলে সে তার মনের ভাব টের পেয়ে হতাশায় ও আশঙ্কায় একেবারে চমকে উঠল এবং বুঝলো, নকল দুর্জয়কে দিয়ে সে যে আশার স্বপ্ন সফল করবার মনস্থ করেছে সেটা দুরাশা মাত্র।

এদিকে যে রাত্রে ভার্গব নকল দুর্জয়কে ধরিয়ে দেবার জন্য ফন্দি আঁটে আমি নিজেও সে রাত্রে প্রাসাদে নকল দুর্জয়ের সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করবার জন্য যাই, কেন না সে রাত্রে যে দুর্জয় সিংহও বাইরে গেছে তা জানতাম না, জানতে পারলাম প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে। সে রাত্রের পরের ব্যাপার আপনি সবই জানেন। আমার কথা শুনে ভার্গব ঘাবড়ে গেল, সে স্পষ্টই বুঝল সে রাত্রের ঘটনার পর আর লুকোচুরি চলবে না। সে বোধ হয় জানত, বাবাকে কোথায় আপনি বন্দী করে রেখেছেন, তা না হলে বাবা মুক্তি পেলেন কি করে ? এবং সম্ভবতঃ বাবাকে মুক্ত করে এনে তার প্রতি আপনার অত্যাচারের কথা বলে তাকে উত্তেজিত করে আপনাকে হত্যা করবার জন্য। অবিশ্যি এ ব্যাপারটা সবই আমার কল্পনা !...এবং বাবাকে কক্ষে ছোরা হাতে আপনাকে হত্যা করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে নিজে কক্ষের বাইরে সুযোগের প্রতীক্ষা করে। কিন্তু আমি ভার্গবের কূটনীতি ধরতে পারি না। আমি মনে মনে ভেবেছিলাম, সে নিজেই আপনাকে হত্যা করতে আসবে এবং সেইরূপ ভেবে সে রাত্রে আপনার কক্ষের পাশে উপস্থিত থাকি এবং ভার্গব ভেবেই আমি বাবার মুখের ঢাকনি তুলে ধরি ; কিন্তু ভার্গবের বদলে বাবাকে দেখে দুঃখে, লজ্জায়, অনুশোচনায় আমি একেবারে হতবাক হয়ে যাই এবং বুঝতে পারি বাবাও চক্রান্তকারীদের মধ্যে একজন ! এরপর আর আমার এখানে থাকা অসম্ভব। কেননা বাবার অপরাধ ক্ষমা করলেও আপনি সে অপরাধের কথা কোন দিন ভুলতে পারবেন না ; আর আমিও ভুলতে পারব না, আমার জন্যই বাবা আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন ! ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, বাবা যখন আমার জন্যই নিজের ভাইয়ের ছেলের প্রাণ নিতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত নন এবং দেশের যিনি রাজা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যে কতবড় অন্যায় বা পাপ সে কথা তিনি পুত্রের প্রতি বাপের অন্ধ স্নেহের বসে ভুলে গেলেও আমি ভুলতে পারছি না। তাই স্বেচ্ছায় আমি রাজ্য হতে চিরবিদায় নিয়ে যাচ্ছি !

আপনাদের সকলকেই নীল দুর্গে আসবার জন্য সংবাদ পাঠালাম এবং কৌশলে সিংহবাহনকেও সংবাদ দিয়েছি। সে যদি সত্যিকারের বুদ্ধিমান হয় ত আসবে না, এ ফাঁদে পা দেবে না ; আর যদি একান্তই না আসে তার সাথে এ

রাজ্য চিরদিনের জন্য ছেড়ে যাবার পূর্বে শেষ দেখা একবার হবেই সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। কেন না আমার চোখকে ফাঁকি দেবার মত চালাক সে নয়।···

আর একটা কথা, আপনার কক্ষ হতে সিংহবাহনই বোধ হয় ত দাসীর মারফত পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে সেই কাটা হাতখানা চুরি করিয়েছিল!···এবং সভায় রাজ উদ্যানের সেই অচেনা লোকটার হত্যাকারী বলে যে আপনাকে ঘোষণা করে সে আর কেউ নয় আমি। আমি নিজে ছদ্মবেশে সভায় উপস্থিত ছিলাম; আমার সেদিনকার ধৃষ্টতা মাপ করবেন!···আমি ছদ্মবেশে থাকবার সময় মেয়েলী কণ্ঠে কথা বলতাম ও হাসতাম!···তাই সহজে আমায় কেউ চিনতে পারত না!

আমি আপনাদের নকল দুর্জয়ের ও সিংহবাহনের অপেক্ষা করছি।

বিদায়!···ছোট ভাই বলে তার দোষ, ত্রুটি, অপরাধ সকল ক্ষমা করবেন দাদা।

ইতি হতভাগ্য দুর্জয় সিংহ
(তীরন্দাজ)

চিঠি পড়তে পড়তে মহারাজের দু' চোখের কোল বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু নেমে এল। ধীরে ধীরে তখন নকল দুর্জয় সিংহের শেষের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। এই পৃথিবীর আলো-বাতাস ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল: বড় পিপাসা···একটু জল···জল!···

মহারাজ নিজেই লৌহ শিরস্ত্রাণে করে জল নিয়ে এলেন।

ভার্গব তখনও জানে না, মহারাজ তীরন্দাজের চিঠিতে কী পড়েছেন!

নকল দুর্জয় সিংহ জলপান করে যেন কতকটা সোয়াস্তি পেল। অতি কষ্টে তখন বলতে লাগল: মহারাজ, সংসারে আমি একাকী, কেউ আমার নেই। এই হতভাগ্যের জন্য দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলবে এ দুনিয়ায় কেউ এমন নেই। তবু আজ এই মরণের মুখে দাঁড়িয়ে ভুলতে পারছি না আপনার অসীম করুণার কথা···এই চির হতভাগ্যের প্রতি আপনার অকৃপণ স্নেহ। মরণাপন্ন আবার হাঁপাতে লাগল: আর একটু জল। মহারাজ আবার তাকে জল পান করালেন।···মহারাজ জীবনে যে ভালবাসার আস্বাদন পাইনি···সেই ভালবাসাই আপনার কাছে পেয়েছি। সেই ভালবাসাতেই এই চির দুঃখীর বুকখানা ভরে আছে। আমি! আমি আপনার ভাই, দুর্জয় সিংহ নই মহারাজ! আমি··· ছদ্মবেশী নন্দলাল, সিংহাসনের লোভে···ক্ষমা!···শেষের কথাগুলি জড়িয়ে অস্পষ্ট হয়ে গলার মধ্যে এক প্রকার ঘড়ঘড় শব্দ জেগে তাতেই আটকে গেল। রাত্রির আঁধার কেটে গিয়ে তখন সূর্যের প্রথম সোনালী আলোর খানিকটা নীল দুর্গের পাষাণ প্রাচীরের উপর দিয়ে দুর্গ চত্বরে এসে লুটিয়ে পড়ল। হ্রদের ওপরে শাল-মহুয়ার বনে প্রভাতী পাখীর কলকাকলী শোনা যায়। নন্দলালের আত্মা শেষ নিঃশ্বাস নিল।

হতভাগ্যের দুরাশাই হলো অপমৃত্যুর কারণ!

মহারাজ নিজদেহের বহুমূল্য রেশমী গাত্রাবাসখানি খুলে মৃত্যু শীতল দেহখানি সযতনে ঢেকে দিলেন। দু' ফোঁটা অশ্রুজল তাঁর চোখের কোল বেয়ে হতভাগ্য নন্দলালের দেহে ঝরে পড়ল।

নীল দুর্গের দ্বার চিরদিনের মত রুদ্ধ করে স্বহস্তে চাবি নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

চন্দন সিংহ প্রকাশ্যে রাজসভায় বিচার করে ভার্গবকে জীবনের বাকী কয়দিনের জন্য অন্ধকার কারাগৃহে শৃঙ্খলিত করে রাখবার আদেশ দিলেন। তিল তিল করে সে তার কৃতকর্মের অনুতাপানলে জ্বলে মরুক।

চন্দন সিংহের খুল্লতাত বিক্রম সিংহকে পরদিন হতে কেউ আর সে রাজ্যের ত্রিসীমানায় দেখতে পেল না।

দেশে দেশে, নগরে নগরে মহারাজ দুর্জয় সিংহের খোঁজে চর প্রেরণ করলেন পুরস্কার ঘোষণা করে; কিন্তু কেউ তাঁর সন্ধান এনে দিতে পারল না।

দিন যায়, রাত্রি আসে, এমনি করেই সময়ের পাখায় ভর করে দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর কেটে যায়। কিন্তু অভিমানী দুর্জয় সিংহ আর ফিরে এল না।

সে রাজাও নেই—আর সে রাজ্যও নেই। কালের বুকে লীন হয়ে গেছে।

এখন সেখানে গড়ে উঠেছে, ছোটখাটো একটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। সেখানকার লোকেরা বলে, এখনও নাকি গভীর রাতে চারদিক যখন নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে আসে, দূরে—বহু দূর হতে রাতের বাতাসে যেন ভেসে আসে অস্পষ্ট একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ খট্-খট্, খটা-খট্। লোকেরা কান পেতে শোনে সেই অভিমানী ঘরছাড়া বিবাগী রাজকুমারের প্রিয় অশ্ব মুকুটের পায়ের আওয়াজ।

রাত্রি হলো!···গভীর কালো রাত্রি কালো ডানা ছড়িয়ে পৃথিবীর উপর ঘনিয়ে আসছে···আমিও বিদায় নিয়ে যাই!

অশরীরী আতঙ্ক

বাচ্চু (শ্রীমান সিদ্ধার্থবিকাশ সেন)
একদিন তুমি বড় হবেই আজ যতই ছোট থাক এবং সেদিন আমার বই পড়তে যে তোমার ভাল লাগবেই তা জানি বলেই আমার এই বইটার সঙ্গে তোমার নাম জুড়ে রেখে দিলাম।

মামু

'উল্কা'
২৬/এ গড়িয়াহাট রোড,
কলকাতা-১৯

॥ ১ ॥

ব্যাপারটা যদি বলি ভৌতিক তাহলে যেমন মিথ্যা বলা হবে না, তেমনি যদি বলি, না, তাহলেও হয়তো ঠিক সত্য বলা হবে না।

ভৌতিক কথাটা শুনে অনেকে যেমন হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবে তেমনি ঐ কথাটার সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় হয়েছে বা হবার সৌভাগ্য হয়েছে এমন মানুষও খুঁজলে যে পাওয়া যাবে না, সেও তো নয়। ভৌতিক কথাটা এমনি একটা কথা সেটা যেমন দুর্বোধ্য তেমনি বিচিত্রও। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কুয়াশায় ঘেরা যেন।

যুক্তি দিয়ে হয়তো বিশ্বাস করা যায় না অথচ কল্পনা করতে আনন্দ লাগে—রোমাঞ্চ জাগে। কেউ বলবে দেখেছি—কেউ বলবে দেখিনি—

যারা বলে, দেখেছি—তারাও যেমন মিথ্যা বলছে না, তেমনি যারা বলে দেখিনি, তারাও মিথ্যা বলছে না। মিথ্যা কেউ-ই বলছে না।

শেষ মীমাংসায় পৌঁছোনো যায় নি আজ পর্যন্ত।

হয়তো জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে—কিম্বা জীবিত ও পরলোকগতের মাঝখানে এমন কিছু একটা সত্য অস্তিত্ব আছে যার হদিস আজো আমরা পাইনি—এবং সে কারণে ব্যাপারটা আমাদের সহজ বিচার বুদ্ধির অগোচরে আজো থেকে গিয়েছে।

ব্যাপারটাকে আমরা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারিনি—

কিন্তু তর্ক-বিচার-বুদ্ধির কথা যাক। একটা কথা আমার স্থির বিশ্বাস—জন্মের পর যেমন মৃত্যু আছে—তেমনি মৃত্যুর পরও আবার জন্ম আছে—আর এই জন্ম-মৃত্যুর মধ্যেও আমাদের বিচার, যুক্তি ও বুদ্ধির অগোচরে একটা সত্য কিছু আছে—সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর কোনো একটা বন্ধন যে বন্ধন বেঁধে রেখেছে আমাদের প্রত্যেককে জন্ম ও মৃত্যু, আবার জন্মের মাঝখানে।

তর্কটাও হচ্ছিলো সেদিন বিরূপাক্ষের বাড়িতে বসে। আমার বন্ধু বিরূপাক্ষ সেন।

বিরূপাক্ষের মুখে যথারীতি একটা কটুগন্ধী চার্মিনার। কটুগন্ধে ঘরের বাতাস ভারি।

বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করে, তাহলে তুই বিশ্বাস করিস না ব্যাপারটা, শিশির—

বিশ্বাসের কথা তো আমি ঠিক বলিনি—

তবে—

বলেছি, অবিসংবাদী ভাবে ব্যাপারটাকে এক কথায় গ্রহণ করতে আমি রাজি নই।

যেহেতু—

যেহেতু আজ পর্যন্ত তোমার ও প্রেত বা ভৌতিক ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোনো প্রকার মোলাকাত ঘটেনি বলে।

জীবনে তো অনেক কিছুর সঙ্গেই তোর মোলাকাত ঘটেনি বা চোখে দেখতে পাসনি—যেমন ধর হাওয়া বস্তুটা—কিন্তু সেটাকে তুই অস্বীকার করতে পারিস ? বলতে পারিস, হাওয়া নেই—ওটা কল্পনা মাত্র।

না—

তবে—

তোর ঐ প্রেত আর হাওয়া ব্যাপার দুটো এক হলো নাকি ?

আমাদের কথাটা শেষ হলো না—

সিঁড়িতে ভারি একটা জুতোর শব্দ শোনা গেলো।

কে যেন ভারি পায়ে থপ্ থপ্ করে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে—

কে যেন আসছে তোর কাছে বিরু—

হ্যাঁ—বাগীশ্বরবাবু—

বাগীশ্বর !

হ্যাঁ—বাগীশ্বর ঝাঁ মশাই—

লোকটা কে ?

এখুনি দেখতে পাবি—ওর কথাইতো তোকে বলছিলাম—

কথাটা শেষ হলো না—জুতোর ভারি শব্দটা এসে—দরজার বাইরে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে থামলো।

দরজায় ভারি পর্দা ঝুলছে—তারই নিম্নাংশ দিয়ে এক জোড়া বুট পরিহিত পদযুগল দেখা গেলো।

আসুন—আসুন—মিঃ ঝাঁ—বিরূপাক্ষ সাদর আহ্বান জানালো।

আগন্তুক এসে বিরূপাক্ষর বসার ঘরে প্রবেশ করলেন।

সময়টা শীতকাল। মাঘ মাসের মাঝামাঝি—আর সেবার কলকাতা শহরে শীতও যেন পড়েছিলো তেমনি। মাঘ মাসের প্রথম হপ্তা থেকে প্রচণ্ড। কলকাতা শহরে ঐরকম শীত বড়ো একটা গত কয়েক বছর পড়তে দেখিনি।

বেঁটেখাটো কিছু বেশ সবল গাট্টা-গোট্টা চেহারা ভদ্রলোকের। সাহেবী পোশাক পরনে। প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় লোকটা বাঙালি বা বাংলা মুলুকের নয়—এখনো বেশ কর্মঠ—

বাগীশ্বর ঘরে ঢুকেই প্রথমে আমাদের উভয়ের দিকে তাকালেন। তারপর সন্তর্পণে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে সোজা খোলা জানলাটার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। জানলাপথে সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে বাইরে যেন কি দেখতে লাগলেন। কি যেন খুঁজছেন, মনে হলো।

আমরা দুজনেই নির্বাক। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

এক সময় বাগীশ্বর জানলার কাছ থেকে ফিরে এলেন—

কি ব্যাপার, মিঃ ঝাঁ ? কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে নাকি ? বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করে।

সর্বক্ষণই তো করছে—কথাটা হিন্দিতে বললেন বাগীশ্বর।

সর্বক্ষণ ?

হ্যাঁ—ছায়ার মতোই যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষণ রয়েছে ও—

বসুন—

বিরূপাক্ষ বসতে বলায় বাগীশ্বর না বসে পুনরায় আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমার বন্ধু শিশির গুপ্ত—ফিল্ম ডাইরেকটর, বিরূপাক্ষ বলে।

তবু যেন বাগীশ্বরের দু' চোখের দৃষ্টি থেকে সন্দেহটা যায় না।

ওকে আপনার সন্দেহের কোনো কারণ নেই—যা বলবার ওর সামনেই আপনি বলতে পারেন।

কিন্তু বাগীশ্বরের দিক থেকে কোনো উৎসাহ দেখা গেলো না তেমন।

বিরূপাক্ষ বলে এবারে, আর তাছাড়া ও আমার সঙ্গেই যাবে—

উনিও যাবেন ?

হ্যাঁ—কিন্তু আপনার আসবার কথাতো ছিলো আগামী শনিবার—

হুঁ—

তবে—

চলে এলাম। কারণ ব্যাপারটা আমি সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখতে চাই। আর সে তো আপনাকে পূর্বেই আমার চিঠিতে জানিয়েছি—

তা জানিয়েছেন অবিশ্যি—বিরূপাক্ষ মৃদু কণ্ঠে বলে।

আমার চিঠিটা আপনি ভালো করে পড়েছেন ?

হ্যাঁ—

ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন ?

কিছু যে একেবারে বুঝিনি তা নয়।

তবে—

অকুস্থানে একবার সরেজমিন তদন্ত করবার জন্য যাওয়া প্রয়োজন—

আমিও তো তাই চিঠিতে জানিয়েছি।

তা অবিশ্যি জানিয়েছেন—

কবে যাচ্ছেন তাহলে, বলুন—

কবে ?

হ্যাঁ—যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব—

ভাবছি—সামনের শনিবারের রাত্রের এক্সপ্রেসে যাবো—

বেশ-বেশ। তাহলে আমি উঠি—

উঠছেন ?

হ্যাঁ—উঠি—তাহলে সেই কথাই পাকা তো ?

হ্যাঁ—

সঙ্গে সঙ্গে বাগীশ্বর উঠে দাঁড়ালেন।

নমস্কার। চলি—

নমস্কার। বাগীশ্বর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা যেমনই আকস্মিক তেমনি যেন দুর্বোধ্য।

কি ব্যাপার ?

বিরূপাক্ষ আমার প্রশ্নে আমার মুখের দিকে তাকালো।

কে ঐ বাগীশ্বর ঝাঁ—

বিরূপাক্ষ আমার সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললো, তোর প্রেতের মীমাংসা এবারে হয়ে যাবে শিশির—

তার মানে—

তার মানে—সত্যি প্রেত বলে কিছু আছে বা নেই—

কি বলছিস।

শুনলি তো—আগামী শনিবার যাচ্ছি।

কিন্তু কোথায় ?

নিঝুমপুর—

নিঝুমপুর !

হুঁ—

সে কোথায় ?

আসল নাম অবশ্য জায়গাটার তা নয়—

তবে—

স্থানীয় লোকেরা নাম দিয়েছে জায়গাটার—নিঝুমপুর।

॥ ২ ॥

উঃ কি শীত রে বাবা। হাড়ের মধ্যে যেন ছুঁচ বিঁধোচ্ছিলো—প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ন ছুঁচ।

বিরূপাক্ষ রাজি হয়নি কিন্তু আমি তার কথায় কর্ণপাতও করিনি, কামরার সমস্ত জানলা এঁটে দিয়েছিলাম।

তবু কি ঠাণ্ডা যায় ! কম্বল জড়িয়ে বসে ঝিমোচ্ছিলাম। কিন্তু বিরূপাক্ষ নির্বিকার। সে দিব্যি আরাম করে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্তে নাক ডাকাচ্ছিলো।

ঝিমুনির মধ্যে কখন যে গাড়িটা থেমেছে, টের পাইনি। হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে গেলো। নিঝুমপুর, নি ঝু ম পু র। মনে হলো, কর্কশ ভাঙা ভাঙা গলায় কে যেন কথা বলতে বলতে আমাদের ঠিক কামরার পাশ দিয়ে চলে গেলো !

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই জানলার শার্সি তুলে বাইরে তাকালাম। বিরূপাক্ষ আগেই বলেছিলো, রাত দুটো নাগাদ গাড়ি আমাদের নিঝুমপুর পৌঁছোবে।

ঝিমুনি এলেও তার সেই সতর্কবাণী আমাকে সর্বক্ষণ প্রায় সজাগই রেখেছিলো।

সামনের বার্থটাতেই একটা ভারি মোটা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিলো বিরূপাক্ষ। আর কাল বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি বিরূপাক্ষকে ঠেলে তুললাম, এই ওঠ, ওঠ—তোর নিঝুমপুর এসে গিয়েছে। আর ঘুমোসনি।

বিরূপাক্ষ আমার ডাকে উঠে বসে! একটা আরামসূচক হাই তুলে, মাথার রবারের বালিশটার হাওয়া বের করে, কম্বলটা গুটিয়ে, নীচু হয়ে বার্থের তলা থেকে সুটকেসটা টেনে এনে, কম্বল ও বালিশটা সেই সুটকেসের সঙ্গে একটা চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে উঠে দাঁড়ালো।

আমিও প্রস্তুত হয়ে নিই।

ইতিমধ্যে হুইসেল বেজে ওঠে এবং ঘণ্টা পড়ে। আমরা গাড়ি থেকে নামবার আগেই গাড়ি চলতে শুরু করে। চলন্ত ট্রেন থেকেই বলতে গেলে আমরা নামলাম।

সত্যিই নিঝুমপুর। কে যে জায়গাটার নাম নিঝুমপুর রেখেছিলো, জানি না। তবে তার নামটা রাখা সার্থক হয়েছে নিঃসন্দেহে। ছোট্ট অখ্যাত একটা স্টেশন।

শীতের মধ্যরাত্রের অন্ধকারে ট্রেনের পিছন দিককার লাল আলোটা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেলো এক সময়।

এবড়ো-খেবড়ো পাথর ও লাল মাটির ঢেলা বিছোনো প্ল্যাটফর্মটা জনহীন। নিঝুম। টিমটিম করে গোটা তিনেক কেরোসিনের বাতি দূরে দূরে জ্বলছে। সামান্য সেই টিমটিমে আলো মধ্যরাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মেশামেশি হয়ে যেন অদ্ভুত রহস্যময় একটা আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে। জনমানবহীন স্টেশনটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে।

আর কী শীত রে বাবা। হাড় পর্যন্ত যেন একেবারে কাঁপিয়ে তুলছিলো।

বিরূপাক্ষ তখনো দাঁড়িয়ে। যেন তার ঘুমের ঘোর কাটেনি।

মনে মনে যেন একটু বেশ বিরক্ত হয়েই বলি—কিরে, বাকি রাতটুকু এখানে এই একপায়ে দাঁড়িয়েই কাটবে নাকি?

বিরূপাক্ষ ততক্ষণে তার হাতের সুটকেসটা পাশে প্ল্যাটফর্মের ওপরেই নামিয়ে রেখে পকেট থেকে চার্মিনারের প্যাকেটটা বের করে, একটা চার্মিনারে অগ্নি সংযোগ করতে ব্যস্ত হলো। আমার কথার কোনো উত্তর দিলো না। ওষ্ঠধৃত সিগ্রেটটায় আগুন দিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা দু' আঙুলের সাহায্যে দূরে অন্ধকারে নিক্ষেপ করলো।

তারপর যেন কোনো উদ্বেগ বা বিরক্তিই নেই এমনি ভাবে শান্ত কণ্ঠে বললো, বাগীশ্বরবাবু কি আমাদের কথা স্রেফ একদম ভুলে গিয়ে নিদ্রা দিচ্ছেন নাকি!

তোর মতো তো সবাই পাগল নয় যে, হাড় কাঁপানো এই শীতের মাঝরাত্রে চার মাইল পথ ঠেঙিয়ে, তোকে জামাই আদরে রিসিভ করতে আসবেন ভদ্রলোক।

কটুগন্ধী চার্মিনারে একটা লম্বা সুখ-টান দিয়ে বিরূপাক্ষ বললো, কিন্তু সেই রকমই তো কথা ছিলো। যাকগে মরুকগে—এগিয়েই না হয় একটু দেখা যাক—

কথাটা বলে সত্যি সত্যিই সুটকেসটা তুলে নিয়ে বিরূপাক্ষ সামনের দিকে এগোলো মন্থর পদক্ষেপে।

ভদ্রলোক তো আসেননি, দেখতে পাচ্ছি। তা চিনিস তো তার বাড়ি?

না।

না মানে?

মানে আবার কি, চিনি না—তবে নাইবা চিনলাম, লোকটা যখন একটা হেঁজি-পেঁজি নয় তখন খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁকে এবং তাঁর গৃহ নিশ্চয়ই, চল—

কিন্তু বিরূপাক্ষের কথাটা শেষ হলো না এবং সত্যি সত্যি দু'পা এগোবার আগেই হঠাৎ সেই মাঝরাত্রির সামান্য কেরোসিনের বাতির আলোর আবছায়ে নজরে পড়লো, শ্বেত বস্ত্রাবৃত দীর্ঘকায় এক মূর্তি হনহন করে আমাদের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে। হাতে একটা লণ্ঠন দুলছে, তালে তালে।

বলা বাহুল্য, অদূরবর্তী সেই দীর্ঘকায় বস্ত্রাবৃত মূর্তি বিরূপাক্ষেরও নজরে পড়েছিলো। তাই বোধহয় সে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। লম্বা লম্বা পা ফেলে সেই মূর্তি ততক্ষণে একেবারে আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, বলতে গেলে।

আগন্তুকই প্রথম কথা বললো, নমস্কার, আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন?

জবাব দেয় বিরূপাক্ষই—বলে, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি! আপনি কি বাগীশ্বর-বাবুর লোক?

তাই। তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন, আপনাদের রিসিভ করে স্টেশন থেকে তাঁর গৃহে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতে। আগন্তুক বললো।

যাবার কি ব্যবস্থা হয়েছে?

টমটম অপেক্ষা করছে স্টেশনের বাইরে—চলুন।

বিরূপাক্ষ বিনা বাক্যব্যয়ে নীচু হয়ে পুনরায় সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে পা বাড়ালো।

ইতিমধ্যে আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখা দিয়েছিলো বটে তবে হঠাৎ কোথা থেকে যেন সেই চাঁদের আলোকে গ্রাস করবার জন্য একটু একটু করে কুয়াশা নামতে শুরু করেছিল। কুয়াশার সঙ্গে সেই চাঁদের ম্লান আলো কেমন যেন একটা থমথমে রহস্য ছড়িয়ে দিয়েছে আশেপাশে।

সর্বপ্রথমে সেই আগন্তুক, তার পিছনে বিরূপাক্ষ ও সকলের পরে আমি, আমরা অগ্রসর হলাম সেই আবছা আলো-আঁধারের মধ্যে।

স্টেশনের গেট দিয়ে বের হয়ে এলাম। কেউ আমাদের টিকিটও চাইলো না। গেট পার হতেই একটা ঢালু পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো কাঁচা সরু পথ। পথটা অতিক্রম করে প্রশস্ত একটা পথে এসে আমরা পেঁছিলাম।

সেই সময় আমাদের নজরে পড়লো অনতিদূরে একটা বিরাট ঝাঁকড়া পাকুড় গাছের নীচে একটা টমটম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওই যে আপনাদের টমটম দাঁড়িয়ে রয়েছে, যান। ঐ টমটমেই আপনারা যাবেন।

হঠাৎ সেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়ে কথাগুলো বললো।

আপনি! আপনি যাবেন না? প্রশ্ন করে বিরূপাক্ষ।

না। মৃদু হেসে আগন্তুক বললো—আচ্ছা নমস্কার—

কথাটা বলেই সেই আগন্তুক লণ্ঠনটা হাতেই বাঁ দিকে যে ঘন আগাছা ছিলো, সেই দিকে পা বাড়ালো। এবং মনে হলো, যেন চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই সেই আগন্তুক ও তার হাতের লণ্ঠনের আলোটা আবছা আলো-অন্ধকারে ও ঘনায়মান কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে—অর্থাৎ ঠিক যে মুহূর্তে আগন্তুক ঐ কথাগুলো বলে আমার একেবারে পাশ ঘেঁষে বাঁ দিককার ঘন আগাছার দিকে এগিয়ে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে লোকটার মুখের প্রতি চকিতের জন্যই বুঝি আমার দৃষ্টি পড়েছিলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন বিশ্রী ভয়ের একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে শিরশির করে ওঠে।

একটা মুখ আর দুটো চোখ আমার নজরে পড়েছিলো। মাথার ওপরে অর্ধেক ঘোমটার মতোই চাদরটা ঢাকা ছিলো। সেই ঘোমটার ভিতর থেকে চকিতে যে মুখটা আমার দৃষ্টিতে পড়েছিলো, সে বুঝি সত্যিই কোনো জীবন্ত মানুষের স্বাভাবিক মুখ নয়। লম্বাটে মুখটা। থুতনিতে একটুখানি ছাগল দাড়ি। আর চোখ দুটো? দৃষ্টিমাত্রেই মনে হয়েছিলো কোনো জীবন্ত মানুষের চোখের সে দৃষ্টি বুঝি নয়। অদ্ভুত সে চোখের দৃষ্টি। আয়নার মতো যেন সমস্ত কিছু তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

শিরশির করে উঠেছিলো সমস্ত দেহটা আমার একটা অজানিত আশঙ্কায় যেন। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

কি হলো, আয়—দাঁড়ালি কেন আবার?

য়্যাঁ! চমকে উঠি যেন। ওই লোকটা—বলতে গেলাম কথাটা—

কে? কার কথা বলছিস? বিরূপাক্ষ ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে।

ঐ যে এইমাত্র চলে গেলো—

কী হয়েছে তার?

কিছু না। চল—

কুয়াশা তখন ক্রমশঃ নিবিড় হচ্ছে। বিরূপাক্ষ আগে আগে, আমি তার পিছনে টমটমটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

॥ ৩ ॥

ঝাঁকড়া সেই পাকুড় গাছের নীচে টমটমটার সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। গাড়ির আশেপাশে কাউকে নজরে পড়লো না। কোচোয়ানের বসবার জায়গাটাও শূন্য। কেউ নেই। কি করবো, ভাবছি আমরা।

বিরূপাক্ষই ডাকলো, কোচোয়ান—এই কোচোয়ান—

কোচোয়ানটা সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে বোধহয় ঘুমোচ্ছিলো পরম আরামে টমটমের ভেতর। বিরূপাক্ষের ডাকাডাকিতে উঠে বসলো। চোখ রগড়াতে রগড়াতে নেমে এলো গাড়ির ভেতর থেকে, কৌন হো—

এটা কি বাগীশ্বর ঝাঁর গাড়ি?

হাঁ। কেয়া আপ লোগন কলকত্তাসে আতা হ্যায়? কোচোয়ান শুধায়।

হ্যাঁ—

আইয়ে—উঠিয়ে—

দু'জনে আমরা উঠে বসলাম টমটমের ওপরে।

কোচোয়ান গাড়ির দু'পাশের আলো দুটো অতঃপর জ্বালিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলো।

উঁচু-নীচু এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে রাস্তা। সেই পাথুরে রাস্তায় ধাবমান অশ্বখুরের আঘাতে আঘাতে কেমন যেন একটা ধাতব খট্‌খট্‌ শব্দ হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে বাজছে ঘোড়ার গলার ঘণ্টাটা টুং টুং শব্দে।

ইতিমধ্যে কুয়াশা আরো নিবিড় হয়ে এসেছিলো। ঘন কুয়াশায় আশে-পাশের কিছুই নজরে পড়ে না। চাঁদের আলোর চিহ্নমাত্রও আর নেই তখন কোথায়ও, সব অস্পষ্ট, ঝাপসা।

সামনে বসে কোচোয়ান গাড়ি চালাচ্ছে, পিছনে আমরা দু'জনে বসে আছি। বিরূপাক্ষ এক মনে চার্মিনার টানছিলো। কথা বলছিলো না।

আমার সমস্ত মনটা তখনো জুড়ে আছে ক্ষণিকের দেখা সেই আগন্তুকের বিচিত্র মুখ ও অন্তর্ভেদী দুই চোখের সেই দৃষ্টি।

কুয়াশার জন্য বোঝবারও উপায় নেই কোন দিকে কোথায় চলেছি। শুধু চলেছি, এইটুকুই বুঝতে পারি। হঠাৎ ঐ সময় যেন চমকে উঠি কোচোয়ানের সুস্পষ্ট বাংলা উচ্চারণে—বিরূপাক্ষবাবু—

শুধু আমি নয়, বিরূপাক্ষবাবুও চমকে উঠেছিলো।

হ্যাঁ—

নমস্কার।

নমস্কার।

আ-আপনি—

আমি বাগীশ্বর—

বাগীশ্বরবাবু?

হ্যাঁ—

কিন্তু—

বাধ্য হয়েই আমাকে কোচোয়ানের ছদ্মবেশে আসতে হয়েছে। বসে থাকতে থাকতে কেমন ঘুম এসে গিয়েছিলো, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাগীশ্বর বললেন।

মৃদুকণ্ঠে বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করে, কিন্তু এভাবে ছদ্মবেশে কেন?

—সে তো আপনাকে আগেই বলেছি। আমি চাই না, আপনারা আসছেন এখানে কেউ জানুক কথাটা। আর সেই জন্যই অন্য কাউকে না পাঠিয়ে নিজেই

আমি আপনাদের স্টেশনে রিসিভ করতে এসেছি এবং প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত যাইনি। অবশ্য জানতাম আমি, আমাকে স্টেশনে না দেখতে পেলে আপনি এদিকেই আসবেন—

কী বলছেন আপনি, মিস্টার ঝাঁ? একটু আগেই যে ওই লোকটা বললো, স্টেশনে আমাদের রিসিভ করবার জন্য তাকে আপনি পাঠিয়েছিলেন।

বিরূপাক্ষের কথায় বাগীশ্বর পরম বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, আমি স্টেশনে লোক পাঠিয়েছিলাম! কি বলছেন, মিস্টার সেন!

হ্যাঁ, সেই তো দূর থেকে আমাদের এই টমটমটা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলো।

টমটম দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলো?

হ্যাঁ—

কী রকম দেখতে বলুন তো লোকটা!

বিরূপাক্ষ একেবারে হুবহু লোকটার বর্ণনা দিয়ে গেলো, এমন কি তার মুখ-চোখের খুঁটিনাটি পর্যন্ত।

বুঝলাম, আমার মতো বিরূপাক্ষও তাকে নজর করেছে।

ওঃ তাহলে, তাহলে সে জানতে পেরেছে।

—কার কথা বললেন, মিস্টার ঝাঁ? বিরূপাক্ষই আবার প্রশ্ন করে।

সে।

কে?

সেই যে, যার কথা আপনাকে আমি চিঠির মধ্যে সব লিখেছি এবং যে ছায়ার মতোই আমাকে সর্বত্র অনুসরণ করছে।

মানে—আপনার সেই প্রেত?

প্রেত কিনা, জানিনা। তাছাড়া আজ তো স্বচক্ষেই আপনি একটু আগে তাকে দেখেছেন।

আপনি। মানে—

হ্যাঁ, ঐ ছায়ামূর্তির কথাই আপনাকে আমি আমার চিঠির মধ্যে জানিয়েছিলাম। এবং এও আমি জানি, আমার কথাটা আপনি বিশ্বাস করেননি। কিন্তু আজ নিজের চোখেই তো দেখলেন!

হ্যাঁ, কিন্তু—

কি?

এবারে আমিই কথা বললাম। বললাম, কিন্তু সত্যিই কি আপনি বিশ্বাস করেন, বাগীশ্বরবাবু, প্রেত বলে কিছু আছে? বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পরে প্রেত মানুষের আকার নিয়ে মানুষের মাঝখানে আবার সত্যিই কোনোদিন ফিরে আসতে পারে?

মৃদু কণ্ঠে বাগীশ্বর জবাব দেয়, বিশ্বাস কোনোদিনই করতাম না আর করিওনি মিস্টার গুপ্ত! কিন্তু আমি যা দেখেছি, আপনারা দু'জনেই একটু আগে নিজের চোখে আজ যা দেখলেন—তারপর আমার কথা না হয় বাদই দিন, আপনারাও কি জোর গলায় বলতে পারবেন, প্রেত বলে সত্যিই কিছু নেই?

প্রেত মানুষের আকার নিতে পারে না—

ঐ কথার পর দেখলাম, আমি তো নই-ই বিরূপাক্ষও আর বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য করলো না।

কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন নানা চিন্তা আনাগোনা করছিলো, তাহলে ক্ষণপূর্বের সেই আগন্তুক কে? সত্যি সত্যিই কি মর জগতের কেউ নয়? বায়বীয় প্রেত? মানুষের আকার নিয়ে মানুষের মতো যে কথা বলে গেলো আমাদের সঙ্গে সে তো মিথ্যা বা চোখের ভুল হতে পারে না!

কিন্তু ঐ সঙ্গে মনে পড়ে লোকটার চেহারা। বিশেষ করে তার মুখ ও দুটো চোখের সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। এখনো যেন গায়ের মধ্যে শিরশির করছে।

বাগীশ্বর ঝাঁ চুপচাপ বসে টমটম হাঁকাচ্ছিলো। আর বিরূপাক্ষ একমনে চার্মিনার টানছিলো। ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ আর ঘোড়ার গলার ঘণ্টার টুং টুং শব্দ বিচিত্র একটা ছন্দে কুয়াশাচ্ছন্ন স্তব্ধ মধ্যরাত্রির নির্জনতায় যেন কানে এসে বাজছিলো।

নিঝুমপুরে বিরূপাক্ষের আকস্মিক আগমনের হেতুটা তখনো সবটা আমি জানতে পারিনি, যদিও তার সঙ্গী হয়েছিলাম। সামান্য যেটুকু জেনেছিলাম, বা বিরূপাক্ষ এখানে আসবার আগে আমায় ছাড়া ছাড়া ভাবে বলেছিলো, সেদিন বাগীশ্বর ঝাঁ চলে যাবার পর—তাতে করে এইটুকুই বুঝেছিলাম যে বাগীশ্বর ঝাঁ একজন বিরাট ধনী ব্যক্তি। অনেকগুলো কয়লাখনির মালিক। এবং বাগীশ্বর কী একটা বিপদে পড়ে বিরূপাক্ষের শরণাপন্ন হয়েছে। বিপদটা যে কি তাও স্পষ্ট করে কিছু বলেনি সে আমাকে। বিরূপাক্ষ আমাকে কেবল বলেছিলো, চল, কে বলতে পারে হয়তো তোর পরবর্তী ছবির একটা ভালো গল্পের মালমসলা ওখানে পেয়ে যাবি। রীতিমতো রোমাঞ্চকর, যাকে বলে রীতিমতো একেবারে থ্রিলিং।

তথাপি আমি কিন্তু সেজন্য ওর সঙ্গ নিইনি। ওর সঙ্গ নিয়েছিলাম এই-জন্য যে ইদানীং ওর ডিটেকশনের ব্যাপারগুলো সত্যিই আমাকে আনন্দ দিতো। বেশ একটা উত্তেজনা যেন অনুভব করতাম। এবং প্রেত-ট্রেত আমি আদৌ বিশ্বাস করতাম না। তাছাড়া নিঝুমপুর নামটাও যেন একটা কিসের ইঙ্গিত দিয়েছিলো আমাকে।

তবে সত্যি কথা বলতে কি, নিঝুমপুরে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বিচিত্র এক আগন্তুককে কেন্দ্র করে যে ব্যাপারটা ঘটে গেলো, তাতে করে পূর্বের উত্তেজনাটা যেন বৃদ্ধিই পায়। প্রেত ট্রেত আমিও কখনো বিশ্বাস করিনি আর করিও না সত্য, কিন্তু ক্ষণপূর্বে যা নিজের চোখে দেখলাম তা যদি সত্য হয়, তবে এতদিনকার ধারণাটা বদলাতে হবে নিশ্চয়ই। তাই সাগ্রহে পরবর্তী ঘটনার জন্য কেমন যেন একটা ঔৎসুক্য মনের মধ্যে জাগে। তাছাড়া কেন যেন আমার মনই বলছিলো, কিছু যেন একটা ঘটবে। কিছু একটা শীঘ্রই ঘটতে চলেছে। সত্যিই মানুষের মন এক এক সময় কিসের যেন বিচিত্র সাড়া পায় ভেতর থেকে।

কুয়াশা চারদিকে ইতিমধ্যে আরো নিবিড় হয়ে উঠেছিলো। আশেপাশের কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো না। কিন্তু তবু তারই মধ্যে বাগীশ্বর যেন আশ্চর্য এক দক্ষতায়ই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলো। প্রায় ঘণ্টা দুই একটানা চলার পর বহুদূরে সেই ঘন কুয়াশার মধ্যেই কতকগুলো ঘোলাটে আলোর রক্তাভ ইশারা দেখতে পাওয়া গেল।

কতকগুলো বললে ভুল হবে, আলোর একটা মালা যেন অন্ধকারের বুকে দুলছে!

কথা বললে বিরূপাক্ষই, আমরা বোধহয় এসে পড়লাম, মিস্টার ঝাঁ, তাই না?

হ্যাঁ। ঐ যে আমার মাইন এরিয়ার আলো দেখা যাচ্ছে। বাগীশ্বর ঝাঁ জবাব দেন।

সত্যি, ক্রমশঃ আলোগুলো স্পষ্ট হতে থাকে। এবং আরো আধঘণ্টা চলবার পর একটা বাংলো বাড়ির গেট দিয়ে আমাদের টমটম প্রবেশ করলো কম্পাউণ্ডের মধ্যে। টমটমের আলোতেই নজরে পড়লো, সামনেই একটা টানা নির্জন বারান্দা।

বাগীশ্বর গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় উঠে আবছা আলো অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো, এক্ষুনি আসছি বলে।

আমরা টমটমেই বসে রইলাম বাগীশ্বরের অপেক্ষায়।

প্রায় মিনিট পনেরো বাদে একটা টর্চ হাতে বাগীশ্বর ফিরে এলো। আসুন মিস্টার সেন, মিস্টার গুপ্ত আসুন, নামুন।

আমরা অতঃপর টমটম থেকে নেমে বাগীশ্বরকে অনুসরণ করলাম।

॥ ৪ ॥

টানা বারান্দার সামনে আসতেই লম্বা, আপাদমস্তক কালো পোষাকে আবৃত ঠিক যেন একটা জীবন্ত প্রেত মূর্তি এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো নিঃশব্দে। হঠাৎ লোকটার আবির্ভাবে চমকে উঠেছিলাম। বাগীশ্বরই তাকে বললো, ঠিক আছে, দরজাটা খুলে দিয়ে তুই যা। আর লক্ষ্য রাখবি, কেউ যেন না এদিকে আসে।

লোকটা সামনের একটা দরজা চাবি দিয়ে খুলে দিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো তেমনি নিঃশব্দে চলে গেলো।

অতঃপর আমরা ভেজানো দরজা ঠেলে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে বাগীশ্বরের পিছনে পিছনে গিয়ে প্রবেশ করলাম। এবং আমরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বাগীশ্বর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলো।

হঠাৎ ঐভাবে ঘরে ঢোকার পরই ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করায় সত্যিই একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। এবং নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম, আর ঠিক সেই সময়েই খুট করে অন্ধকারে একটা সুইচ টেপার শব্দ হল।

ঘরের আলো জ্বলে উঠলো।

বাধ্য হয়েই আমাকে সাবধানতা একটু নিতে হচ্ছে, মিস্টার সেন, মনে কিছু করবেন না। বাগীশ্বর বললো।

সাবধানতা! প্রশ্নটা করে বাগীশ্বরের মুখের দিকে আমি তাকালাম।

হ্যাঁ, মিঃ গুপ্ত। আমি তো আগেই বলেছি, আমি চাই না, আপনাদের আমি এখানে এনেছি, এখানকার কেউ জানুক। মানে বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা আমি গোপন রাখতে চাই।

বিরূপাক্ষ একেবারে চুপচাপ, কোনো কথা বলছে না।

বাগীশ্বরই আবার বললো, কতকটা যেন আপনমনেই, হ্যাঁ, জানাজানি হয়ে গেলে আপনারা যে জন্যে এসেছেন সে কাজে হয়তো বিঘ্ন ঘটতে পারে।

আগেই বলেছি, সেদিন কয়েক মিনিটের জন্য ভালো করে কলকাতায় বাগীশ্বর ঝাঁকে দেখিনি। আজ কিন্তু খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। বেঁটেখাটো মানুষটা। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। পরিধানে ঐ সময় বাগীশ্বরের কোচোয়ানের পোশাক ছিলো। এবং বাগীশ্বর ঝাঁর সত্যিকারের পরিচয় ইতিপূর্বে না পেলে কোচোয়ানের ঐ বেশে তাকে কোনো ভদ্রলোকে বলে ভাবা সত্যিই দুঃসাধ্য ছিলো। লোকটার চেহারার মধ্যে কোনো রকম আভিজাত্যের ছাপটুকু পর্যন্ত যেন কোথাও ছিলো না। এমনি রুক্ষ, এমনি চোয়াড়ে চেহারা।

বিরূপাক্ষ আবার বলে, কিন্তু ব্যাপারটা গোপন করেও শেষ পর্যন্ত গোপন রাখতে পেরেছেন কি, বাগীশ্বরবাবু? আমার তো মনে হয় পারেননি।

কেন, একথা বলছেন কেন?

বাগীশ্বর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় বিরূপাক্ষের মুখের দিকে।

স্টেশনের সেই লোকটার কথা কি এর মধ্যেই ভুলে গেলেন!

না, না—ভুলবো কেন! ভুলিনি। কিন্তু যাক ওসব কথা। এখনো কয়েক ঘণ্টা রাত বাকি আছে। আপনারা এবারে বিশ্রাম নিন। পাশের ঘরে আপনাদের শয্যা তৈরিই আছে। আমি এবারে বিদায় নেবো। অনেকটা পথ আবার আমাকে যেতে হবে। আর একটা কথা। আপনাদের খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য সব ব্যবস্থা এখানেই আমি করেছি। আমারই লোক, স্বরূপ থাকবে—

স্বরূপ! কে সে?

একটু আগে যাকে দেখলেন। দরজা খুলে দিয়ে গেলো। আমার অনেক দিনকার জানাশোনা লোকটা। বিশ্বাসী—একটু অপেক্ষা করুন, তাকে আমি এখুনি ডেকে নিয়ে আসছি।

বাগীশ্বর ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। এবং একটু পরেই সেই লোকটাকে নিয়ে ফিরে এলো।

ঘরের আলোয় এতক্ষণে লোকটার চেহারা ও বিশেষ করে চোখের দিকে তাকাতেই যেন আমি চমকে উঠি। লম্বা রোগা লোকটা। মাথা ভর্তি রুক্ষ

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। দু' চোখের মধ্যে একটা চোখে আবার ঠুলি পরা। পরিধানে একটা ঝলঝলে প্যাণ্ট ও ঝলঝলে একটা পুরোনো কালো গরম কোট।

বাগীশ্বর আমাদের দেখিয়ে স্বরূপকে বললেন, বাবুরা রইলো স্বরূপ, এঁদের তুমি দেখা-শোনা করবে। দেখো, যেন কোনো কষ্ট না হয় এঁদের।

স্বরূপ হ্যাঁ বা না কিছুই বললো না। কেবল নিঃশব্দে তার এক চোখ দিয়ে একবার তার মনিবের দিকে ও একবার আমাদের দিকে তাকালো।

সেই তাকাবার সময়ই লোকটার সঙ্গে আবার আমার চোখাচোখি হলো। সে দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল বলতে পারবো না, কিন্তু গায়ের মধ্যে যেন কেমন শিরশির করে উঠলো।

ইতিমধ্যে বাগীশ্বর প্রস্থান করেছিল।

বিরূপাক্ষ স্বরূপের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার নাম স্বরূপ?

লোকটা এবারেও কোনো কথা না বলে কেবল নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো।

বেশ, বেশ, তা একটু চা খাওয়াতে পারো, স্বরূপ।

এবারেও স্বরূপ হাঁ বা না কিছুই না বলে কেবল ঘর থেকে বের হয়ে গেলো এবং তার যাবার সময় লক্ষ্য করলাম, লোকটা ডান পা-টা যেন একটু টেনে-টেনে চলে।

এবারে আমি কথা না বলে সত্যিই পারি না। বললাম, তোর এখানে আগমনের হেঁয়ালিটা এবারে আরো একটু পরিষ্কার করবি বিরূপাক্ষ! হঠাৎ এখানে তুই এলিই বা কেন, আর ঐ লোকটার সত্যিকারের পরিচয়ই বা কি—কে ও—?

বিরূপাক্ষ একটা সোফার ওপরে ততক্ষণে টান টান হয়ে গা ঢেলে বসেছে। বললো, কিছু কিছু তো সেদিন তোকে বলেছি ওর সম্পর্কে—ওই বাগীশ্বর হচ্ছে, যাকে তোরা বলিস একজন ক্রোড়পতি। পাঁচ পাঁচটা কয়লা খনির মালিক। যদিও লোকটার চেহারায় তার বিপরীতই মনে হয়। কিন্তু তার জন্যে আক্ষেপ করে আর লাভ কি? নাটুকে বিধাতা পুরুষটি এই পৃথিবীর রঙ্গভূমিতে যাকে যেমন করে সাজিয়েছেন তিনি সেইভাবেই প্রকট। এই দেখ না বাগীশ্বরই কি কেবল, তোর কথাটাই ধর না, তোর হওয়া উচিত ছিল কোনো আদালতের ক্রিমিন্যাল ল' ইয়ার। তা না হয়ে তুই হলি কিনা শেষ পর্যন্ত এক ফলপ্‌ মাস্টার জেনারেল ফিল্ম ডাইরেক্টার। তেমনি আবার ঐ স্বরূপেরও যা হওয়া উচিত ছিল তা না হয়ে হয়েছে বাগীশ্বরের বিশেষ অনুগত—আজ্ঞাবাহী ভৃত্য—

থামলি কেন, বল! বেশ ব্যঙ্গভরা কণ্ঠেই বলে উঠি।

না থামিনি। ভেবে দেখ স্বরূপের যা লম্বা চওড়া চেহারা, ওকে কি বাগীশ্বরের ভৃত্যের বেশে মানাচ্ছে, তাই বলছিলাম—

কথাটা শেষ হলো না বিরূপাক্ষর, স্বরূপ ঐ সময় ট্রেতে চা নিয়ে এসে ডান পা-টা টেনে টেনে ঘরে প্রবেশ করলো। এবং চায়ের ট্রে-টা আমাদের সামনে

নামিয়ে রেখে আবার পূর্ববৎ ডান পা-টা টেনে টেনে নিঃশব্দে ঘর থেকে প্রস্থান করলো।

॥ ৫ ॥

ধূমায়িত চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে—কাপে আরাম করে চুমুক দিতে দিতে বিরূপাক্ষ একটা আরামসূচক শব্দ করে—আঃ।

আমিও একটা কাপ তুলে নিই।

তবে, কি মনে হয় শুনি ? পূর্ব প্রশ্নের জেরটাই এবার আমি টানলাম আবার বিরূপাক্ষর দিকে তাকিয়ে চা পান করতে করতে।

আর যাই মনে হোক লোকটা যে বোবাও নয় এবং বোকাও নয় সেটা কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি।

বলিস কি !

তাই—তবে কি জানিস শিশির—

কি !

দেখ, যারা সত্যিকারের বোকা তাদের চিনতে কষ্ট হয় না কিন্তু যারা বোকা সেজে থাকে তাদের চেনা কষ্টসাধ্য। বিশ্বাস করিস তো কথাটা ?

করি—কিন্তু—

বাগীশ্বরের সব কথা শুনলে তোর কিন্তু সবটা বিশ্বাস হবে না—

তার মানে !

ব্যাপার হচ্ছে, সেদিন যা নিয়ে তোর সঙ্গে আমার তর্ক হচ্ছিলো—

কি ভূত প্রেত—

হ্যাঁ—

তুই কি বলতে চাস—

সেইরকমই একটা ব্যাপার এখানে বাগীশ্বরের ঘটছে বলে—এবং সে ব্যাপারটা পুলিশ বিশ্বাস করবে না বলে বেচারি আমার শরণাপন্ন হয়েছে শেষ পর্যন্ত—বলতে বলতে আবার চায়ের কাপে বিরূপাক্ষ চুমুক দিয়ে বললো, কিন্তু তুই যাই বলিস লোকটা যেমনই হোক স্বরূপের চায়ের হাতটা কিন্তু খাসা! তাই না—শিশির।

হুঁ। মন্দ নয়।

কিন্তু তোর কথা এখনো শেষ হয়নি ? তারপরই আবার প্রশ্ন করি।

আমার কথার প্রত্যুত্তরে হঠাৎ বিরূপাক্ষ কবিতায় বলে ওঠে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে—তারপরই দরজার দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন কণ্ঠে ডাকে—স্বরূপ—বাছা স্বরূপ !

কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না তার।

আবার ডাকলো বিরূপাক্ষ, লজ্জার কিছু নেই বাছা স্বরূপ, চলে এসো, আমি জানি দরজার আড়ালে তুমি দাঁড়িয়ে আছো।

এসো বাছা হনুমান, এসো—নির্ভয়ে আগচ্ছ—ভিতরমে আও—

নিঃশব্দে স্বরূপ এসে ঘরে ঢুকলো তেমনি ডান পা টেনে টেনে।

দোরগোড়ায় বাছা হনুমানটির মতো বিনয়াবনতভাবে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন, বৎস ? অশোক বনে সীতাকে পাহারা দিচ্ছিলে বুঝি ?

স্বরূপ বিরূপাক্ষের কথার কোনো জবাব দেয় না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

বুঝলাম। পাহারাই দিচ্ছিলে। তা শোনো বৎস, আমাদের আর পাহারা দিতে হবে না তোমাকে বসে। স্বচ্ছন্দে তুমি এবার তোমার ঘরে গিয়ে নিদ্রা যেতে পারো। যাও—

নির্বিকার দৃষ্টিতে স্বরূপ একবার বিরূপাক্ষের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো নিঃশব্দে।

বিরূপাক্ষের হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার মানেটা এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

কিন্তু ততক্ষণে বিরূপাক্ষ উঠে পড়েছে। এবং নীচু হয়ে চেয়ারের পাশে রাখা ব্যাগ ও তৎসহ বেডিংটা তুলে নিয়ে হাত বাড়িয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বলে, কিন্তু আজ আর নয় শিশির—সত্যি রাত বোধহয় শেষ হয়ে এলো—চল, শুতে যাওয়া যাক।

বিরূপাক্ষকে অনুসরণ করে পাশের নির্দিষ্ট ঘরে এসে দু'জনে প্রবেশ করলাম।

পাশের ঘর। মাঝারি আকারের ঘরটা। ঘরের মধ্যে দু'দিকে দুটো ক্যামবিসের খাটে শয্যা বিছানো ছিলো আর একধারে একটা আলমারি ও ছোটো সাইজের একটা ড্রেসিং টেবিল দেখা গেলো। ঘরের মেঝেতে দামী পুরু কার্পেট পাতা।

ঘরটায় ঢুকতেই বেশ একটা উষ্ণতার আরাম পেলাম। চেয়ে দেখি, ফায়ার প্লেসে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। বুঝলাম ঘরের মধ্যে উষ্ণতার কারণ।

গোটা চারেক জানলা ঘরে। জানলায় ভারি পর্দা ঝুলছে, গাঢ় মেরুন রঙের। সমস্ত ঘরটা একেবারে পরিচ্ছন্ন—ঝকঝকে তকতকে।

ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হাতের সুটকেশসহ বেডিংটা বিরূপাক্ষ এগিয়ে গিয়ে ঘরের এককোণে নামিয়ে রাখলো। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললো, ঘরে অন্তত খান দুই আরামচেয়ার রাখা বাগীশ্বরের উচিত ছিলো। যাকগে রাখেনি যখন কী আর করা যাবে। যস্মিন দেশে যদাচার। খট্টাঙ্গকেই সময় বিশেষে চেয়ারে পরিণত করা যাবে—

কথাটা বলে আর অপেক্ষা করলো না বিরূপাক্ষ, সোজা গিয়ে শয্যার উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। জুতো জোড়া পা থেকে খুলে, যে জামাকাপড় গায়ে ছিলো সেই জামাকাপড় সমেতই !

প্রশ্ন করলাম, কি রে, কাপড় ছাড়বি না ?

না। তুই বরং শোবার আগে আলোটা নিবিয়ে দিস, জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দিয়ে।

আমারও শয়নের প্রয়োজন ছিলো তাই তাড়াতাড়ি কোনোমতে জামা-

কাপড়টা ছেড়ে আলোটা নিবিয়ে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। শয্যায় পায়ের কাছে যে দামী কম্বলটা ভাঁজ করা ছিলো সেটাই টেনে নিলাম। এতোক্ষণে আরাম শয্যায় গা ঢেকে কম্বলের তলায় আশ্রয় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহটা যেন শিথিল হয়ে এলো।

আলোটা নিভিয়ে দেওয়ার পর ফায়ার প্লেসের আগুনের রঙ আভাটা ঘরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিচিত্র একটা আলোছায়ার রহস্য যেন ঘরের মধ্যে।

এখন পর্যন্ত বিরূপাক্ষ কিছুই স্পষ্ট করে আমায় বলেনি—বিনা উদ্দেশ্যে বিরূপাক্ষ এখানে আসেনি ঠিকই। বাগীশ্বর এখান থেকে একটা চিঠিতেই নাকি সব কথা জানিয়েছিলো তাকে—তারপর নিজেও একদিন গিয়েছিলো—কিন্তু সেদিনও কোনো কথাই হয়নি।

॥ ৬ ॥

চোখে ঘুম আসে না।

শেষরাত্রে বোধহয় কুয়াশা ভেদ করেই সামান্য চাঁদের আলো প্রকাশ পেয়েছিলো। জানালার কাচের সার্সিপথে তারই মৃদু আলোর আভাসটা ঘরের ভেতর থেকেও বাইরে নজর পড়ে ঝাপসা ঝাপসা। সেই অদ্ভুত আলোছায়ার রহস্যের দিকে তাকিয়ে থাকি অন্যমনস্কভাবে। এবং তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বোধহয় চোখের পাতায় একসময় ঘুমের একটা আমেজ এসে গিয়েছিলো।

হঠাৎ বিরূপাক্ষের কণ্ঠস্বরে সে আমেজটা ভেঙে গেলো।

ঘুমোলি নাকি শিশির ?

না।

তুই জিগ্যেস করছিলি না, কেন এই নিঝুমপুরে এলাম!

হ্যাঁ।

বাগীশ্বরের মুস্কিল আসান করতে।

কি রকম ?

বাগীশ্বরের কথা জানতে হলে পূর্ব ভূমিকার প্রয়োজন—লোকটা ক্রোড়পতি, তোকে তো আগেই বলেছি। কিন্তু যে অর্থ ও সম্পত্তির সে আজ বর্তমান মালিক সে তার স্বোপার্জিত তো নয়ই, পিতৃ-সূত্রেরও পাওয়া নয়।

তবে ?

সবকিছু পেয়েছে সে তার মৃত অকৃতদার এক মহানুভব মাতুল হরদয়াল চৌধুরীর একমাত্র ওয়ারিশন হিসাবে।

বলিস কী ?

মৃদু হাসে বিরূপাক্ষ।

মাতুল সম্পত্তি—আবার প্রশ্ন করি আমি।

তাই। বাগীশ্বরের সেই মাতুল মহোদয়ই ছিলেন এসব কিছুর মালিক। বছর দুয়েক আগে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় বাগীশ্বরের সেই মাতুল হরদয়াল চৌধুরীর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়, কি রকম ?

বাগীশ্বর আমাকে যা তার চিঠিতে লিখেছিল—হরদয়াল চৌধুরীর অর্থাৎ বাগীশ্বরের মাতুলের বিশেষ একটা হবি ছিল ঘোড়ায় চড়া। গোটা সাতেক ভাল ভাল ঘোড়া ছিল তাঁর। সারাদিনের কাজকর্মের পর হরদয়াল চৌধুরী ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরোতেন। এবং ঠিক অবিশ্যি তাকে বেড়ান বলা চলে না, ঝড়ের মত ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি প্রত্যহ আট-দশ মাইল ঘুরে আসতেন। কোন কারণেই ঝড় জল বৃষ্টি যাই হোক না কেন একদিনের জন্যেও তাঁর সে-অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণের ব্যতিক্রম হ'ত না।

তারপর—

তারপর আর কি—অবশেষে সেই অশ্বারূঢ় হয়ে ভ্রমণই হ'ল একদিন তাঁর কাল।

কি রকম ?

শেষপর্যন্ত একদিন ছুটন্ত ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েই নাকি তাঁর মৃত্যু হয়। এবং সে এক মর্মন্তুদ ব্যাপার।

মর্মন্তুদ ব্যাপার—

হ্যাঁ—বাগীশ্বরের চিঠির ভাষায় তাই !

অনেক টাকা দিয়ে হরদয়াল মৃত্যুর কিছুদিন আগে নতুন একটা ঘোড়া কিনেছিলেন। এবং ঘোড়াটা তখনো ভাল করে পোষ মানেনি। প্রত্যহ বিকেলের দিকে অফিস থেকে ফিরে ব্রিচেস পরে যেমন বেড়াতে যান হরদয়াল চৌধুরী তেমনি দুর্ঘটনার দিনও প্রস্তুত হয়েছেন ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরোবেন বলে, সহিস ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে ঘোড়া নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

বল, থামলি কেন—

না—থামিনি, বলছি—সেদিন হরদয়াল দেখলেন লছমনের বদলি যে সহিসটা কিছুদিন ধরে কাজ করছিল, লছমন ছুটি নিয়ে বাড়ি যাওয়ায় সেই নতুন ঘোড়াটায় জিন চাপিয়ে নিয়ে এসেছে।

হরদয়াল সহিসের দিকে তাকিয়ে শুধালেন, কিরে, নতুন ঘোড়াটা কেন ?

আজ্ঞে, এ ঘোড়াটায় তো আপনি কখন চাপেননি তাই লছমন ভেইয়া আজ এই ঘোড়াটাতেই জিন চাপাতে বলে গেছে আমায়, হুজুর—

এটায় চাপব, বলছিস ?

দেখুন না, ঘোড়াটা খুব তেজী।

তেজী—না ! দেখা যাক, কেমন ছোটে—

জি—হ্যাঁ—বহুত তেজী, দেখিয়ে না—

এগিয়ে এসে হরদয়াল নতুন ঘোড়াটার ওপরই সওয়ার হলেন এবং নিমেষে

ঘোড়া ছুটিয়ে চোখের বাইরে চলে গেলেন।

এদিকে সন্ধ্যা সাতটা-সাড়ে সাতটায় সাধারণতঃ হরদয়াল ফিরে আসতেন কিন্তু সেদিন রাত নটা বেজে যেতেও হরদয়াল ফিরলেন না দেখে সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

অবশেষে ম্যানেজার ব্রিজপ্রসাদের কানে কথাটা উঠল। চিন্তিত ব্রিজপ্রসাদ সংবাদটা শুনে তখুনি চারদিকে লোক পাঠালেন, প্রভুর সংবাদের জন্য। কিন্তু তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আবার সকালে খোঁজা শুরু হ'ল এবং প্রায় ঘণ্টা চার-পাঁচ খোঁজবার পর মাইল পাঁচেক দূরে প্রায় পাহাড়ের ধার দিয়ে যে রাস্তাটা, সেই রাস্তায় হরদয়ালের ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত বীভৎস মৃত দেহটা পাওয়া গেল। আর তারই হাত দশ-বার দূরে পাওয়া গেল সেই ঘোড়াটার রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ মৃতদেহটা।

ঘোড়াটার গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ? আমি প্রশ্ন করি।

হ্যাঁ! সকলের এবং পুলিশেরও ধারণা—হরদয়াল ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে রাগের মাথায় শেষপর্যন্ত সেই ঘোড়াটাকে গুলি করে শেষ করেছিলেন হয়তো নিজে মরবার আগে।

ঐরকম ধারণা হ'ল কেন? আমি শুধাই—

কারণ মৃত হরদয়ালের হাতের মুঠোর মধ্যে নাকি তখনো পিস্তলটা মুষ্টিবদ্ধ ছিল।

হরদয়াল পিস্তল নিয়েই বেড়াতে যেতেন নাকি?

হ্যাঁ। প্রতিদিন ঘোড়ায় চেপে বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরোবার সময় তিনি নাকি পিস্তল নিয়েই বের হতেন। সে যাই হোক, হরদয়ালের মৃতদেহ ব্রিজপ্রসাদ নিয়ে এল। সংবাদ পেয়ে থানা পুলিশের সমাগম হ'ল এবং তারাও রিপোর্ট দিল যে ছুটন্ত ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েই হরদয়াল চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে।

তারপর?

কিন্তু বাগীশ্বর ঝাঁ কথাটা বিশ্বাস করতে পারেননি—

কেন?

তিনি বলেন—অর্থাৎ তাঁর ধারণা ব্যাপারটার মধ্যে কোন foul play রয়েছে কারো সুনিশ্চিত—

হঠাৎ ঐ ধারণা হ'ল কেন তাঁর?

কারণ একটা বিশেষ ব্যাপার আর কারো মনে না হলেও—তিনি এসে সব শোনার পর তাঁর মনে হয়েছিল।

কি ব্যাপার?

পরের দিন সকাল থেকেই সেই বদলি নতুন সাহিসটার নাকি কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

তারপর ?

তারপর আর কি ! এদিকে লোকটা অকৃতদার ছিল তাই কে তার ঐ বিশাল সম্পত্তির মালিক হবে, হরদয়ালের মৃত্যুর পর সেই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন জটলা চলল। এমন সময় মাস দু' পরে হরদয়ালের সলি-সিটর খোঁজ খবর করে জানতে পারলেন, মৃত হরদয়ালের বড় বোনের একমাত্র ছেলে বাগীশ্বর ঝাঁই নাকি হচ্ছে তাঁর সম্পত্তির একমাত্র জীবিত ওয়ারিশন। সি পি-র একটা গণ্ডগ্রামে থাকত বাগীশ্বর—ছোটখাটো কি একটা ব্যবসা ছিল লোকটার। যাহোক তাকে সংবাদ পাঠান হ'ল। বাগীশ্বর এত ব্যাপার কিছুই জানত না—ধারণাও নাকি করতে পারেনি—সংবাদ পেয়ে সে এসে সলিসিটর মিঃ মিশ্রের সঙ্গে দেখা করে সব শোনবার পর তো থ ! শেষপর্যন্ত অবিশ্যি সে-ই এসে আইনের বলে এখানে জাঁকিয়ে বসল। এই হ'ল বাগী-শ্বরের পূর্ব ইতিহাস। এবারে বর্তমান ইতিহাসে আসা যাক !

বর্তমান ইতিহাসও একটা আছে নাকি ?

॥ ৭ ॥

রাত শেষ হয়ে এসেছিল—কাঁচের জানলা-পথে ভোরের ঝাপসা আলোর ইঙ্গিত ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে তখন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে অতঃপর বিরূপাক্ষ তার অর্ধসমাপ্ত কাহিনী পুনরায় শুরু করল। বললে, আছে বৈকি—আর সেই কারণেই তো বিশেষ করে আমাদের এখানে আগমন।

কী রকম ? প্রশ্নটা করে আমি বিরূপাক্ষের মুখের দিকে তাকালাম।

এখানে এসে সব কিছু দখল করে বসবার পর মাস দুই প্রায় নির্বিবাদেই কেটে গেল বাগীশ্বরের, তারপর তার জীবনে আবির্ভূত হ'ল এক অশরীরী আতঙ্ক !

অশরীরী আতঙ্ক !

হ্যাঁ।

কী রকম ?

অর্থাৎ যে জন্য আমাদের তার আমন্ত্রণে আগমন—সেই বিচিত্র অশরীরী রহস্য—বিচিত্র সব ব্যাপার—

বিচিত্র ব্যাপার—কি রকম—

যেমন, হয়ত রাত্রে শয্যায় ভদ্রলোক শুয়ে আছে—বন্ধ ঘরে হঠাৎ দুম্ করে মশারির চালের ওপর কি যেন এসে পড়ল। কিম্বা হয়ত ঘরের মধ্যে রাত্রে দপ করে আলো নিভে গেল, তারপরই শুরু হ'ল বিচিত্র সব শব্দ। বাগীশ্বর লোকটা বেশ সাহসী। ভূত-প্রেতে কোনদিনই তার নাকি পূর্বে

বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন এমন ঘটনা ঘটতে লাগল যাতে করে শেষ পর্যন্ত তার ভূত প্রেতেও বিশ্বাস এসে গেছে। প্রথম প্রথম বাগীশ্বর ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করেছে সমস্ত বিচার-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেচনা দিয়ে—কিন্তু কোনো মীমাংসাতেই পেঁছোতে পারেনি—পুলিশের সাহায্য, হাস্যস্কর হবার ভয়ে নিতে পারেনি। বেচারি যে কাউকে বিশ্বাস করে কথাটা বলবে তাও পারে না। হয়ত বলতও না, কিন্তু—

কী ?

ইদানীং মাসখানেক ধরে এমন একটা ব্যাপার ঘটতে শুরু হয়েছে যে বাধ্য হয়েই তাকে আমার শরণাপন্ন হতে হয়।

কী ব্যাপার ?

এখানকার অফিস থেকে তার বাড়িটার দূরত্ব পাহাড়ের গা দিয়ে শর্টকাট করলে মাইল দেড়েক হবে। কাজকর্মের পর সে ঐ পথটুকু এখানে আসা অবধি বরাবর হেঁটেই ফিরে আসত। খানিকটা রিল্যাকসেশনও হ'ত আবার খানিকটা একসারসাইজও হতো। তাছাড়া অন্য যে প্রশস্ত সড়কটা রয়েছে সেটা অনেকটা ঘুরে এবং দূরত্ব মাইল পাঁচেক হবে প্রায়, তাই ঐ পথটা বাগীশ্বর বড় একটা ব্যবহার করত না।

কেন, দূরত্বে কি এসে যায় ? অতো বড়োলোক, টমটমও তো আছে নিজের একটা দেখলাম। তবে হাঁটা পথেই বা তার যাবার কী দরকার ? প্রশ্ন করলাম আমি।

কথাটা যে আমারও মনে হয়নি শিশির, তা নয় তবে চিরকাল গাঁয়ে মানুষ, গরীব নিম্নমধ্যবিত্ত লোক, গাড়িতে যাতায়াতও তেমন অভ্যাস নেই, তাই হেঁটেই যাতায়াত করতে নাকি তার ভাল লাগত।

তারপর ?

ঐ রকম অফিস থেকে সন্ধ্যায় ফেরবার পথে প্রথম হঠাৎ একদিন ব্যাপারটা ঘটে।

কি ?

সেদিনও কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যার দিকে অফিস থেকে ফিরছে—হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ যেন বাগীশ্বরের মনে হ'ল, কেউ তাকে অনুসরণ করছে।

অনুসরণ করছে ?

হ্যাঁ—

মানে follow করছে ?

হ্যাঁ—সরু পাহাড়ি আঁকা-বাঁকা উঁচু-নীচু রাস্তা—রাস্তাটা সাধারণতঃ গেঁয়ো দেহাতি লোকেদের যাতায়াতের। তাহলেও প্রথম দিকে বাগীশ্বর তেমন খেয়াল করেনি। তাছাড়া তখন সন্ধ্যাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রথমটায় খেয়াল না করলেও শেষপর্যন্ত বাগীশ্বরকে কিন্তু ব্যাপারটায় মনোযোগ দিতেই হ'ল একদিন। দ্বিতীয় দিন বাড়ি ফেরার পথে পাহাড়ি রাস্তায় আবার

খটখট সেই শব্দটা একটানা পেছনের অন্ধকার থেকে কানে আসছে। মনো-যোগ না দিয়ে উপায় কি! বাগীশ্বর এক সময় দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলেন অন্যান্য দিনের মত, কিন্তু আশ্চর্য—দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ থেমে যায়। হয়তো শোনবারই ভুল—কিম্বা পাহাড়ি রাস্তায় নিজের পায়েরই জুতোর শব্দের প্রতিধ্বনি—ভেবে আবার চলতে শুরু করেন বাগীশ্বর। কিন্তু চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই শব্দ শোনা যায়। যাই হোক, শব্দটা শেষপর্যন্ত যেখানে সেই পাহাড়ি রাস্তা এসে বড় সড়কের সঙ্গে মিশেছে—সেই পর্যন্ত এসে হঠাৎ থেমে গেল। সে-রাত্রে বাড়ি ফিরে এল বাগীশ্বর, নানাভাবে চিন্তা করে ব্যাপারটা কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারেনি—শব্দটা তার শোনবারই ভুল না অন্য কিছু। কিন্তু পরের দিন বাড়ি ফেরার পথে আবার সেই শব্দ এবং শব্দটা সেদিনের মত ঠিক একই জায়গায় এসে থেমে গেল।

তার পরদিন এবং তার পরের দিনও।

এবারে কিন্তু বাগীশ্বরের মনের মধ্যে সত্যিই কেমন একটু খট্‌কা লাগে। ব্যাপারটা সঠিক কি জানবার জন্যে সে বদ্ধপরিকর হয় এবং পরের দিন সেই পথের মাঝামাঝি এসে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় বাগীশ্বর। তারপর পিছন দিকে পূর্বের অতিক্রান্ত পথ ধরে এগিয়ে যায়। কিছুই প্রথমটায় দেখতে পায় না। আগেই বলেছি, বাগীশ্বর চিরদিনই দুঃসাহসী প্রকৃতির। সে আরো এগিয়ে যায়। বলতে ভুলে গিয়েছি, ঐ ধরনের ব্যাপার ঘটতে শুরু হওয়ার পর থেকেই বাগীশ্বর সঙ্গে একটা পিস্তল রাখত। পিস্তলটা মুঠোর মধ্যে ধরেই বাগীশ্বর এগোতে থাকে, রাত হয়েছে ইতিমধ্যে এবং কিছুক্ষণ আগে চাঁদ উঠেছে আকাশে।

তারই আলোয় চারদিককার পাহাড় ও তার গায়ে গায়ে আঁকা-বাঁকা উঁচু-নীচু সরু পথটা কেমন যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। সেই আলোয় এগোতে এগোতে পথের একটা বাঁকে এসে দাঁড়ায় বাগীশ্বর।

তারপর—

একপাশে খাড়া উঁচু পাহাড় উঠে গিয়েছে, অন্যদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় যেন ঢেউ তুলে তুলে ক্রমশঃ বহু নীচে অন্ধকার খাদে মিলিয়ে গিয়েছে। হঠাৎ ঢেউ তোলা পাহাড়ের একটা চূড়ায় নজর পড়ল বাগীশ্বরের। দীর্ঘকায় একটা শ্বেতবস্ত্র আবৃত মূর্তি সেই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে। মূর্তিটাকে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায় বাগীশ্বর। দীর্ঘকায় সেই মূর্তির সর্বদেহ একটা সাদা চাদর জড়ান যেন, এমন কি মাথাও সেই চাদরে অর্ধেকটা ঘোমটার মতো ঢাকা। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সেই মূর্তির মুখটা স্পষ্ট দেখতে পায় বাগীশ্বর। লম্বাটে ধরনের মুখখানা আর থুতনিতে ছাগলের মত একটু দাড়ি। দু'জনার মধ্যে ব্যবধান খুব বেশি নয়। হাত পাঁচ-ছয়, কি বড় জোর হাত সাতেকের ব্যবধান হবে দু'জনের মধ্যে!

কে! কে তুমি? কথা বল—না হলে গুলি করব, বাগীশ্বর চিৎকার করে ওঠে।

অদূরবর্তী মূর্তি বাগীশ্বরের সে ডাকে কিন্তু কোন সাড়া দেয় না। স্থিরদৃষ্টিতে কেবল চেয়ে থাকে।

এখনও বল, কে তুমি? বাগীশ্বর আবার প্রশ্ন করে। তবু সাড়া নেই।

বাগীশ্বর তখন গুলি চালায়। পরপর দুবার ফায়ার করে। কিন্তু আশ্চর্য। মূর্তিটা বার দুই যেন একটু হেলল মাত্র আর কিছুই হ'ল না। তারপরই তর তর করে দ্রুত পায়ে বাগীশ্বরের চোখের সামনেই পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচের দিকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই মূর্তি।

বলিস কি! পিস্তলের গুলিতে মরল না?

না।

তুই বিশ্বাস করিস একথা?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা থাক। যা ঘটেছিল অর্থাৎ বাগীশ্বর যা আমাকে চিঠিতে লিখেছিল তাই শুধু বললাম।

বিরূপাক্ষ জবাব দিল।

তারপর?

তারপর আরও কয়েকবার ঐ মূর্তির সঙ্গে দেখা হয়েছে বাগীশ্বরের। শেষবার দেখা হয় বাগীশ্বরেরই শয়নকক্ষে এবং তারপরই সে সত্যি সত্যিই রীতিমত চিন্তিত হয়ে ওঠে।

তা ঐ মূর্তি সম্পর্কে বাগীশ্বরের কি ধারণা? শুধালাম আমি।

সে বলতে চায় প্রেত-ট্রেতই কিছু একটা। যাই হোক পুলিশকে সে বিশ্বাস করে কিছু বলেনি। হয়তো তারা শুনে সবটাই একটা উদ্ভট কল্পনা বলে উড়িয়ে দেবে। অবশেষে বেচারি অনন্যোপায় হয়েই আমার শরণাপন্ন হয়েছে।

তোর কি ধারণা—তুই কি মনে করিস, ব্যাপারটা প্রেত-ট্রেত কিছু সত্যি সত্যিই?

সঠিক এখনো কিছু বলতে পারি না। তবে—

তবে?

ব্যাপারটা আগাগোড়াই কেমন যেন একটু রহস্যজনক মনে হওয়ায় আমার কৌতূহল হয়েছে।

আর তাই তুই এসেছিস?

হ্যাঁ।

কথা বলতে বলতে কখন একসময় ভোরের আলো আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল, বুঝতে ওরা পারেনি। স্বরূপ এসে দরজায় ধাক্কা দেয়।

দেখতো শিশির, বাছা হনুমান বোধহয় দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখি চায়ের ট্রে হাতে দরজার গোড়ায়

দাঁড়িয়ে সত্যিই স্বরূপ। স্বরূপ এসে ঘরে ঢুকল চায়ের ট্রে হাতে।

বাথরুমে গরম পানি লাগাও, বিরূপাক্ষ বলে।

পানি দিয়া, হুজুর—

ঠিক হ্যায়—বিরূপাক্ষ উঠে পড়ল।

॥ ৮ ॥

সেদিন তো নয়ই পরদিনও নয়। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার আগে পর্যন্তও বাগীশ্বরের কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। সে আমাদের একটা খোঁজ পর্যন্ত নিল না। অবিশ্যি সেজন্য বিরূপাক্ষের বিশেষ কোন দুঃখ ছিল না। দিব্যি—তোফা-আরামে আছি। রাজকীয় খাদ্য জুটছে। বিরূপাক্ষ সর্বক্ষণ শুয়ে শুয়ে চার্মিনারের প্যাকেটের পর প্যাকেট শেষ করে যাচ্ছে। কিন্তু তৃতীয় দিনেও যখন সন্ধ্যা হয়ে এলো তবু বাগীশ্বরের দেখা নেই, তখন আমি প্রশ্ন না করে আর পারি না।

বিরূপাক্ষ কিন্তু নির্বিকার। একগাদা গোয়েন্দা উপন্যাস বিরূপাক্ষ সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, চার্মিনারের সংগে সর্বক্ষণ হয় চেয়ারে শুয়ে বা শয্যায় গা ঢেলে দিয়ে পরম আরামে ও নিশ্চিন্তে একটার পর একটা গোয়েন্দা কাহিনী শেষ করে চলেছে সে।

কি ব্যাপার বলতো বিরূপাক্ষ ?

বিরূপাক্ষ যথারীতি একটা উপন্যাসের মধ্যে ডুবে ছিল। মুখে চার্মিনার। শুধাল, কিসের ব্যাপার ? আমার দিকে না তাকিয়েই কথাটা বললে।

আমাদের গৃহস্বামীর যে আজ পর্যন্ত কোন আর পাত্তাই নেই—

হয়ত ব্যস্ত আছেন ভদ্রলোক—

ব্যস্ত আছেন মানে ?

নচেৎ আসছেন না কেন ? কিম্বা হয়ত এখানে নেই কোথাও গিয়েছেন।

যেখানে খুশি তার যাক। গোল্লায় যাক—কিন্তু আমাদের দু'জনকে এনে এভাবে একটা বাড়ির মধ্যে বন্দী করে রেখে দেবার মানেটা কি ?

বন্দী !

তাছাড়া কী ? এ ঘরের বাইরে গিয়েছি কি ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে একজোড়া চোখ।

চোখ ! কার রে ? এতক্ষণে বিরূপাক্ষ তাকাল আমার দিকে।

কেন ঐ স্বরূপের—তোর বাছা হনুমানের।

হুঁ—তা, চেয়ে থাকা ছাড়া ওর আর উপায় কি, বল ?

তার মানে ?

কথা বললে যদি বিপদ ঘটে তাই হয়ত কেবল নিঃশব্দে চেয়েই থাকে।

চেয়েই থাকে ?

হুঁ—কথায় বলে বোবার শত্রু নেই—

অর্থাৎ—

অর্থাৎ হয়তো মিস্টার ছাগল দাড়ির তাই নির্দেশ।

ছাগল দাড়ি ?

বাঃ এর মধ্যেই ভুলে গেলি। স্টেশনে এসে যেচে মোলাকাত করে গেলেন ভদ্রলোক।

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র আমার যেন জ্বলে ওঠে। বলি, তোর মতলবটা কি বলতে পারিস, বিরূপাক্ষ ?

মতলব আবার কি ? দিব্যি খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, যাকে বলে রাজার হালে আছি।

রাজার হালে থাকতে সাধ তোর, তুই-ই থাক। আমি আর একমুহূর্ত থাকছি না।

তা থাকবি কেন। কথায় বলে না, সুখে থাকতে ভূতে কিলনো—তোরও হয়েছে যে তাই।

হ্যাঁ, তাই যাব।

যাস। এই রাত্রিতে তো আর যেতে পারবি না। তাছাড়া পথটার কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাসনি। কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ বিরূপাক্ষ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বললে, ঘরের বাইরে যাসনি—আমি আসছি—

তড়িৎ বেগে ঘরের দরজাটা খুলে পরক্ষণেই বিরূপাক্ষ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমি তো হতভম্ব। ব্যাপারটা যে সঠিক কি হ'ল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। বোকার মত ঘরের মধ্যে একাকী বসে রইলাম।

মিনিট কুড়ি বাদে বিরূপাক্ষ ফিরে এলো কী একটা হাতে নিয়ে।

আমি কোনরূপ প্রশ্ন করার আগেই বললে, ধরতে পারলাম না বটে মানুষটাকে, কিন্তু ধরতে না পারলেও এবং তার পরিচয় বা নামটা না জানতে পারলেও তার বিনামাটা পেয়েছি—

বিনামা !

হ্যাঁ, এই দেখ না—বলে আমার সামনে হাতের জিনিসটা ছুঁড়ে দিতেই দেখলাম, এক পার্টি জুতো।

এ যে দেখছি জুতো।

হ্যাঁ, বিনামা, শুদ্ধ বাংলায় জুতোকে তাই বলে।

কার জুতো ?

যে আমাদের সঙ্গে সম্ভবতঃ আলাপ করতে এসেও আলাপ না করেই পলায়মান—

পলায়মান ?

হ্যাঁ—পালিয়েছে। কিন্তু চুপ—আসছে—

কে আসছে ?

ঐ যে—

সত্যিই বাইরে যেন কার ঐ সময় জুতোর শব্দ পেলাম। কেউ আমাদের ঘরের দিকেই আসছে, বুঝতে পারি। জুতোর শব্দটা দরজার সামনে এসে থেমে গেল। তারপরেই গলার স্বর শোনা গেল, আসতে পারি ?

আসুন, আসুন মিঃ ঝাঁ—সাদর আহ্বান জানায় বিরূপাক্ষ।

বাগীশ্বর ঝাঁ এসে ঘরে প্রবেশ করল। আজ বাগীশ্বর ঝাঁ তার স্বাভাবিক বেশেই এসেছিল। পরিধানে দামী নেভি ব্লু সার্জের লংস্ ও প্রায় হাঁটু অবধি ঝুলা গলাবন্ধ কোট। মাথায় একটা উলের মাঙ্কি ক্যাপ এবং চোখে কালো গগল্স। ঘরে ঢুকে বাগীশ্বর মাথার ক্যাপটা টেনে খুলে ফেলল এবং চশমাটাও চোখ থেকে খুলে পকেটে রেখে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসল।

ইতিমধ্যে গতকালই স্বরূপকে দিয়ে আরো খান দুই চেয়ার এনে রাখা হয়েছিল ঘরে।

দুটো দিন অফিসের কতকগুলো জরুরী ব্যাপারে আসতে পারিনি, ব্যস্ত ছিলাম—তা কোনরকম অসুবিধা হয়নি তো মিস্টার সেন ? বাগীশ্বর বললেন।

না, না আপনি যে রাজকীয় ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু যাক সে কথা, বলছিলাম কি, আজ একবার চেষ্টা করলে হ'ত না ?

কিসের চেষ্টা বলুন তো ? বাগীশ্বর প্রশ্নটা করে মুখের দিকে তাকালেন।

বলছিলাম আপনার সেই প্রেত ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া যায় কিনা ? এইতো তার আবির্ভাবের সময়।

কিন্তু—

চেষ্টা করতে দোষ কি ? চলুন না একবার দেখাই যাক না।

যাবেন ?

হুঁ, চলুন—

বেশ তাহলে প্রস্তুত হয়ে নিন।

আমি প্রস্তুত হয়েই আছি। চলুন—

বিরূপাক্ষ কথাগুলো বলতে বলতে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

চল শিশির—

বাইরে যখন বের হয়ে এলাম চন্দ্রালোকে বাইরের জগৎটা যেন স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

অফিস থেকে এখনো বাড়ি ফিরিনি মিস্টার সেন, বাগীশ্বর বললে, সোজা এখানেই চলে এসেছি।

ভালই করেছেন। চলুন আর একবার অফিসের দিকে যাওয়া যাক।

বিস্মিত বাগীশ্বর প্রশ্ন করে, আবার অফিসের দিকে যাব ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন ?

তা নাহলে আপনার সেই প্রেত বন্ধুটি আপনাকে follow করবার সুযোগ পাবেন কি করে ?

কিন্তু অনেকটা পথ যে ?

তা হোক চলুন।

॥ ৯ ॥

আমরা আবার বাগীশ্বরবাবুর অফিসের দিকেই হাঁটতে শুরু করলাম। সোজা সড়ক ধরে যে পথটা, সেই পথে। বেশ ঘুরে যেতে হয়।

শীতের রাত্রি হলেও সে রাত্রে আকাশটা বেশ পরিষ্কার ছিল। পাহাড়-শীর্ষ ছুঁয়ে অল্প কিছুক্ষণ হবে বোধহয় চন্দ্রোদয় হয়েছে। তারই মৃদু আলোয় আমরা আবার তিনজন হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম নিঃশব্দে।

কিন্তু পথে কোন কিছুই নজরে পড়ল না—দুর্ভাগ্য আমাদের। অবশেষে একসময় অফিসের কাছাকাছি গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বিরূপাক্ষ, বললে—চলুন, মিস্টার ঝাঁ, এবার ফেরা যাক।

বিরূপাক্ষ সখেদে বললে, আজ বোধহয় তাহলে এলেন না তিনি—

তাই ত দেখছি। বাগীশ্বর বললে।

ভয় পেলেন নাকি ভদ্রলোক—

কেন—

তিনজন আমরা—তিনি একা—তবে তিনি ত—

কি—

শক্তিধর হওয়া উচিত।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় পৌনে আটটা বাজে। হিসেব করে দেখলাম প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগেছে।

অসমতল পাহাড়ি পথে যথেষ্ট উৎরাই আর চড়াই।

আবার ফিরে চলেছি নিঃশব্দে তিনজন আমরা। ফেরার পথে সেই একই উৎরাই আর চড়াইয়ে বেশ পরিশ্রম বোধ হয়। এবং গুরু পরিশ্রমে, প্রচণ্ড ঐ শীতেও গা ঘামতে শুরু করেছে। ঐ চড়াই আর উৎরাই রীতিমত এক কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার। এবং মনে মনে সত্যি কথা বলতে কি, বিরূপাক্ষর ওপরে বিরক্তই হয়ে উঠছিলাম ক্রমশ। কিন্তু সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি থাকায় বলবার উপায় নেই।

নিঃশব্দেই বলা বাহুল্য, তিনজনেই পথ অতিক্রম করছিলাম। আমি পশ্চাতে এবং সামনে পাশাপাশি হাঁটছিল বিরূপাক্ষ আর বাগীশ্বর ঝাঁ।

ফিরতি পথে আধাআধি পথও বোধহয় তখনো আসিনি হঠাৎ আমার

সামনে ওরা দু'জনে থেমে যেতে আমাকেও থামতে হয়েছিল একপ্রকার বাধ্য হয়েই। ব্যাপার তখনো বুঝতে পারিনি। জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম বিরূপাক্ষকে, হঠাৎ থামল কেন আবার।

ওই—ওই দেখুন মিস্টার সেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও সামনের দিকে তাকাই। চন্দ্রালোকে সামনে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টিপথে পড়ে। ডান দিকে পাহাড়ের গায়ে সরু রাস্তা। বাঁ দিকে পাহাড়ের পর পাহাড় যেন ঢেউ তুলে তুলে দৃষ্টি সীমার বাইরে ছড়িয়ে গিয়েছে। এবং ঢেউ তোলা একটা পাহাড়ের শীর্ষে—হাত পনের কুড়ি ব্যবধানে স্পষ্ট চোখে পড়ল, আগাগোড়া শ্বেতবস্ত্র আবৃত দীর্ঘ এক ছায়ামূর্তি।

তার মুখের ওপরে কোন আবরণ না থাকায় নজরে পড়ল ঐ হাত পনের-কুড়ি ব্যবধানেও লোকটার থুতনিতে ছাগল দাড়ি।

তিনজনেই আমরা যেন হতবাক হয়ে সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ সেই ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল না। হঠাৎ যেমন পাহাড়ের চূড়ায় দেখা গিয়েছিল তেমনি হঠাৎ যেন আবার ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল আমাদের দৃষ্টির সামনে থেকে। মূর্তিটা যেন মনে হ'ল, ডান দিকে গভীর অতলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হ'ল চকিতে।

কয়েক মুহূর্ত কারোর মুখেই কোন কথা নেই। ঘটনার আকস্মিকতায় যেন সকলেই বোবা হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য।

বাগীশ্বর ঝাঁই প্রথমে কথা বললে, দেখলেন, দেখলেন মিস্টার সেন।

হুঁ! দেখলাম। বিরূপাক্ষ মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়। সে যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক, মনে হ'ল।

এবার বাগীশ্বর ঝাঁ আমার মুখের দিকে ফিরে একটু যেন ব্যঙ্গ স্বরেই প্রশ্নটা করল। এখন বিশ্বাস করলেন তো, মিঃ গুপ্ত।

হুঁ। মৃদুকণ্ঠে আমি জবাব দিই।

চলুন ফেরা যাক, বিরূপাক্ষ বলে।

আমরা তিনজনে আবার পাহাড়ি পথ ধরে চলতে শুরু করলাম। নিঃশব্দে তিনজনেই ফিরে চলেছি। কারোর মুখেই কোন কথা নেই।

মনের মধ্যে একটা চিন্তা আবর্ত রচনা করে ফিরছিল, যা একটু আগে দেখলাম পাহাড়ের চূড়ায় সেটা কি?

এ যে সেই মূর্তি—তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং একে যে-রাত্রে এখানে প্রথম পা দিই সেই রাত্রেই স্টেশনে দেখেছিলাম। হুবহু এক। কথা পর্যন্ত বলেছিল ও আমাদের সঙ্গে। বাগীশ্বর বলতে চান, ওটা প্রেত—তা নাহলে অমন করে ঐ দুরারোহ পর্বতচূড়ায় কেমন করে আবির্ভূত হয়, আবার অদৃশ্য হয়।

প্রেতের সঙ্গে জীবনে ইতিপূর্বে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, যদিও প্রেতের

অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকের মুখেই অনেক কথা শুনেছি। অনেকে হলফ করে বলেছেন, প্রেত আছে। এমনকি অনেকের নাকি প্রেতের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচও ঘটেছে এবং যাদের অবিশ্বাস করাও যায় না। আবার এও অনেক বলেছেন, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কল্পনা—একটা রোমান্স।

কিন্তু তবু মন যেন প্রেতের ব্যাপারে কখন সায় দিতে চায়নি। কিন্তু যা দেখলাম, পর পর দু'দিন—তাকেও তো একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

ইতিমধ্যে আমাদের আবাসস্থলের অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঐ সময় বাগীশ্বর বললে, মিষ্টার সেন, আমি তাহলে আজকের রাতের মত আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব।

যাবেন ?

হ্যাঁ—কাল সকালে আসব।

বেশ। মৃদুকণ্ঠে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় বিরূপাক্ষ।

বুঝতে পারলাম। কেবল আমিই নই, বিরূপাক্ষও ক্ষণপূর্বে দেখা ব্যাপারটাই চিন্তা করছে। বাগীশ্বর বিদায় নিয়ে বাঁদিকে চলে গেল। আমরা সোজাই এগোতে লাগলাম।

॥ ১০ ॥

বাগীশ্বর ঝাঁ চলে গেল। আমরা তখনো সেই হেঁটে চলেছি—মন্থর-গতিতে।

বিরূপাক্ষ, যার ক্ষণে ক্ষণে চার্মিনার না হলে চলে না, সে যেন আজ ভুলেই গেছে তার চার্মিনারের কথা। কেমন যেন অন্যমনস্ক।

ইতিমধ্যে যে কখন চারদিকে ধূসর পর্দার মত একটা কুয়াশা নামতে শুরু করেছে, টের পাইনি। পথ যদিও আর বেশি ছিল না—তবু ঐ নিবিড় কুয়াশার মধ্যে পথ চিনে হাঁটতে প্রতি পদেই যেন থমকে সতর্ক হয়ে এগোতে হচ্ছিল।

বিশ্রী লাগছিল যেন নিস্তব্ধতা। আমিই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললাম, সঙ্গে একটা টর্চ আনলে হ'ত—

মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় পাশে চলতে চলতে বিরূপাক্ষ, কিছু হত না। তাতে করে আরো গোলকধাঁধায় পড়তে হ'ত। এ তবু বাড়িতে একসময় পৌঁছব, সে আশাই করছি। কিন্তু টর্চ থাকলে সোজা হয়তো পথ ভুলে ছাগল-দাড়ির আড্ডায় গিয়ে উঠতে হ'ত।

প্রশ্নটা না করে পারি না, বলি, তোর কি বিশ্বাস বিরু, সত্যিই ওটা একটা প্রেত—

বিশ্বাস না করে উপায় কি—যুক্তির কথা বাদ দিলেও।

কিন্তু—

কি—

প্রেত না হলেই বা অমন করে মিলিয়ে যাবে কি করে—

বিরূপাক্ষ আমার সে প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

যাক্, শেষ পর্যন্ত ফিরে এলাম সে-রাত্রে।

দেখতে দেখতে কুয়াশা ঘন হয়ে উঠতে থাকে। আমাদের নির্দিষ্ট গৃহে যখন এসে পৌঁছালাম, চারদিকে ঘন কুয়াশা যেন আকাশে চাঁদের আলো থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টির সামনে থেকে সবকিছু মুছে দিয়েছে।

দরজায় বার দুই ধাক্কা দিতেই, স্বরূপ এসে দরজা খুলে দিলে। আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম।

বেশ পরিশ্রম হ'ল খানিকটা, কি বলিস? বিরূপাক্ষ চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিতে দিতে বললে।

বেশ নয়, যাকে বলে রীতিমতই পরিশ্রান্ত বোধ করছিলাম ভাই, বলতে বলতে আমিও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ততক্ষণে বসেছি।

এক কাপ করে বেশ গরম চা হলে মন্দ হ'ত না, কি বলিস শিশির? ওহে স্বরূপ ; বাছা হনুমান।—চেয়ারের ওপরে বসে বসেই কথার শেষে হাঁক দিল বিরূপাক্ষ।

কিন্তু অন্যপক্ষের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

বিরূপাক্ষ আবার ডাকল, স্বরূপ! ওহে স্বরূপচন্দ্র!

এবার স্বরূপ এসে ঘরে ঢুকল।

এই যে স্বরূপ! বেশ ভাল করে দু'কাপ চা নিয়ে এস তো।

স্বরূপ চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই চা নিয়ে এসে কাপ দুটো আমাদের সামনে টিপয়ের ওপরে নামিয়ে রাখল।

চা পান করতে করতেই বিরূপাক্ষ পকেট থেকে চার্মিনারের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ঘরের মধ্যে কটুগন্ধী ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করে।

আমার মাথার মধ্যে তখন কিছুক্ষণ পূর্বে পাহাড়ের শীর্ষে যে মূর্তি দেখেছিলাম সেই মূর্তির ব্যাপারটাই আনাগোনা করছে। সত্যি সত্যি ব্যাপারটা কি দেখলাম। বাগীশ্বর ঝাঁ যা বলেছে তাই কি? সত্যিই কি প্রেত ওটা! অশরীরী কোন ব্যাপার।

কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে সহজ বিচার ও বুদ্ধি দিয়ে কেমন করেই বা প্রেতের অস্তিত্ব মেনে নিই।

কি ভাবছিস, শিশির।

বিরূপাক্ষর ডাকে চমকে ওর মুখের দিকে তাকালাম, কিছু বলছিলি?

কি ভাবছিস তখন থেকে এত তন্ময় হয়ে।

আচ্ছা বিরূ!

কি?

সত্যিই তুই মনে করিস, এর মধ্যে প্রেত-ট্রেতের ব্যাপার কিছু আছে?

তুই কি তখন থেকে ঐ কথাটাই ভাবছিলি নাকি? বিরূপাক্ষ মৃদু হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কতকটা কৌতুকের সঙ্গেই কথাটা বলে!

হ্যাঁ, কারণ বাগীশ্বরের ব্যাপারটা তোর মুখ থেকে ও তার মুখ থেকে যতটা শুনেছি, সে রাত্রে স্টেশনে যে ব্যাপার ঘটল, তারপর আজ কিছুক্ষণ আগে পাহাড়ের চূড়ায় যা দেখলাম, সবকিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা প্রেত বলে মেনে না নিয়েও পারছি না—

দেখ—শিশির—

কি?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপারটাই হচ্ছে আগাগোড়া একজনের মনের ব্যাপার, কিন্তু সে কথাটা ছেড়ে দিলেও—

অর্থাৎ।

অর্থাৎ ঐ প্রেতের ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেও মোটামুটি যা দাঁড়াচ্ছে, ভেবে দেখ, সেটার মধ্যেও অনেকগুলো গোঁজামিল নেই কি?

কি রকম?

প্রথমতঃ, ধর হরদয়াল চৌধুরীর মৃত্যুটা—

তার মৃত্যু তো সবাই বলেছেই—

একটা দুর্ঘটনা, তাই না?

হ্যাঁ—

কিন্তু আমার মনে হয়, তা নয়। বাগীশ্বর ঝাঁ ঠিক—

কি—দুর্ঘটনা নয়, বলতে চাস—

হ্যাঁ, কারণ প্রথমতঃ হরদয়ালের মত একজন শিক্ষিত ও পাকা ঘোড়-সওয়ারের ঘোড়া থেকে পড়ে ঐ ধরনের দুর্ঘটনাটা ঘটা যেমন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, তেমনি দুর্ঘটনা যদি ঘটেই থাকে সত্যি, তাহলে ঘোড়াটার গুলিবিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা যেন আরো দুর্বোধ্য হয়ে যায়।

কেন?

কেন কি—ঐভাবে কেউ আহত হয়ে পরে অমন নির্ভুল ভাবে গুলি চালিয়ে ঘোড়াটাকে মারতে পারা কি সম্ভব—

মনে হ'ল, বিরূপাক্ষর কথাটা মিথ্যা নয়।

তবে?

আমার মনে হয়, ঐখানেই কোথাও একটা জটিল ব্যাপার রয়েছে। আজকের এই অশরীরী রহস্যের ঐখানেই জট পাকিয়ে রয়েছে।

জট?

হ্যাঁ, তাছাড়া বাগীশ্বরের পূর্বকথা অর্থাৎ এখানে এসে হরদয়ালের

মসনদে বসবার আগের কথাটা যদি সত্যিই হয় তাহলেও একটা 'কিন্তু' থেকে যায়।

কিন্তু ?

নিশ্চয়ই, অত বড় ক্রোড়পতি ধনী মাতুল যার বর্তমান, তাকে সি. পি-র এক গন্ডগ্রামে একমাত্র বোনের ছেলে হয়ে অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকতেই বা হয়েছিল কেন ? বিশেষ করে মাতুল যখন তার অকৃতদার ছিল এবং তার কোন ওয়ারিশনই ছিল না।

মানে ?

মানে, হরদয়ালের জীবিত অবস্থায় কোনদিন-ই তার ঐ ভাগ্নের কোন কথা শোনা যায়নি, কেউ চিঠি-পত্র দিয়ে কারো কোন খোঁজ বা সংবাদও নেয়নি এবং কারো সঙ্গে কারোর দেখাও হয়নি কেন !

হয়তো ধনী দরিদ্রের বৈষম্যটা বাধা হয়েছিল—বললাম আমি।

হতে পারে, বা অন্য কোন ব্যাপারও থাকতে পারে—তাই স্বাভাবিক ব্যাপার যা মনে হতে পারে এক্ষেত্রে—

কি ?

হয়তো সেখানেও একটা জট পাকিয়ে রয়েছে। কিম্বা এমনও হতে পারে যে হয়তো হরদয়াল চৌধুরীর জীবনযাত্রার পেছনে হয় কোন একটা রহস্য ছিল কিম্বা মাতুল ও একমাত্র ভাগ্নের সম্পর্কটা বা ভাই বোনের অর্থাৎ হরদয়াল ও তাঁর ভগ্নির মধ্যে কোন জট কোথাও পাকিয়ে ছিল, যে কারণে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা খুব প্রীতির ছিল না।

অসম্ভব কি ?

সর্বাগ্রে আমাদের তাই সেটা যেমন করে হোক জানতে হবে। তাই ভাবছি—

কি ?

স্বরূপকে দিয়ে কাল একবার সন্ধ্যের সময় বাগীশ্বরকে এখানে ডেকে পাঠাব একটা চিঠি দিয়ে।

কিন্তু বাগীশ্বর ঝাঁ তো বললেনই, কাল আসছেন। বললাম আমি।

তা বলেছেন বটে তবে—

কি ?

যা করবার আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে। কারণ আমার যেন মনে হচ্ছে—

কি মনে হচ্ছে তোর—

শীঘ্রই একটা কিছু ঘটবে।

কিছু ঘটবে !

হ্যাঁ—তাই ভাবছি—কাল সকালেই স্বরূপের হাত দিয়ে তাকে একটা আসবার জন্য চিঠি পাঠিয়ে দিই, সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা না করে। বলতে বলতে বিরূপাক্ষ আর একটা নতুন চার্মিনারে অগ্নি সংযোগ করল।

পরের দিন সকালেই বিরূপাক্ষ স্বরূপের হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিল বাগীশ্বর ঝাঁকে। চিঠিতে কি লিখেছিল সে আমি অবিশ্যি দেখিনি এবং জিগ্যেসও করিনি। সেও বলেনি।

ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই ফিরে এল স্বরূপ। বাগীশ্বরের জবাব নিয়েই ফিরে এল।

বাগীশ্বর চিঠিতে শুধু একটা কথাই ইংরাজিতে লিখেছে—চিঠি পেয়েছি, ঝাঁ। আর কিছু চিঠিতে লেখা নেই।

এদিকে আহারাদির পর দ্বিপ্রহরে আমি যখন সবে কম্বল মুড়ি দিয়ে একটু আরামের ব্যবস্থা করছি, দেখি, বিরূপাক্ষ গায়ে জামা চড়িয়ে বাইরে বেরোবার উদ্যোগ করছে।

কিরে—কোথায়ও বেরোচ্ছিস নাকি ?

হ্যাঁ—বসে বসে গেঁটে বাত ধরে গেল ঠাণ্ডায়। তাই একটু হাঁটাহাঁটি করে রক্ত চলাচল করে আসি—যাবি নাকি ?

যা বাবা, রক্ত চলাচল করিয়ে আয়—আমি পাদমেকং না গচ্ছামি। বেশ ঠাণ্ডা—একটা ঘুম দেব কম্বল মুড়ি দিয়ে।

শাস্ত্রের পুরুষ সিংহের মত ঐ উদ্‌যোগটুকু তোর নেই বলেই তো একটার পর একটা অকৃতকার্যতা তোর জীবনে। বলেই অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলতে থাকে—ডুববে, মুরাদ তুমি ডুববে। ধাপে ধাপে তুমি নেমে যাচ্ছ—ও কম্বলের তলা নয় আলস্যের মৃত্যুশয্যা। এখনো নিজের মঙ্গল চাও তো অবিলম্বে গাত্রোত্থান কর—নাটকীয় ভঙ্গীতে বিরূপাক্ষ কথাটা শেষ করল।

যদি মরি তো Let me die peacefully, বন্ধু ! তোমার যেখানে খুশি, তুমি যাও। কথাটা বলে, আমি আর ওর দিকে তাকালাম না পর্যন্ত, কম্বলটা টেনে আরাম করে পাশ ফিরলাম। গরম গরম কাটারিভোগ চালের সঙ্গে মুর্গির মাংস—ভোজনটা একটু গুরুতরই হয়েছিল—অচিরেই ভরা পেটে নিদ্রাভিভূত হলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, মনে নেই। ঘুম ভাঙল যখন, তখন চেয়ে দেখি সন্ধ্যে প্রায় ঘনিয়ে এসেছে।

আর বিরূপাক্ষরই পরিত্যক্ত চেয়ারটায় চুপচাপ একাকী বসে বাগীশ্বর ঝাঁ।

তাড়াতাড়ি ধড়ফড় করে উঠে বসলাম, একি, মিঃ ঝাঁ, কতক্ষণ ?

তা বেশ কিছুক্ষণ হবে। কিন্তু মিঃ সেনকে দেখছি না।

কেন ! বিরু কোথায় ?

তাইতো জিগ্যেস করছি।

সে কি তবে ফেরেনি ?

কোথাও গিয়েছেন নাকি তিনি ?

হ্যাঁ, দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বললে, একটু ঘুরে আসি।

আশ্চর্য এখনও ফেরেনি তাহলে?

তাইতো মনে হচ্ছে—

বলেন কি। বেশ যেন শঙ্কিত হয়ে ওঠে বাগীশ্বর, বলে, সেই দুপুরে বের হয়েছেন, এখনো ফেরেননি!

নিশ্চয়ই তাই। স্বরূপকে জিগ্যেস করেছিলেন?

স্বরূপ নেই।

সে নেই! নেই তো গেল কোথায়?

বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

মানে!

মানে আর কি! ভাবছি, এখানে আপনাদের আর না রেখে আমার বাড়িতেই নিয়ে যাব। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের—

বিন্দুমাত্রও না।

হঠাৎ বিরূপাক্ষর গলা শুনে দু'জনেই চমকে দরজার দিকে ফিরে তাকালাম যুগপৎ।

বিরূপাক্ষ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, কোন কষ্টই এখানে আমাদের হচ্ছে না, মিঃ ঝাঁ। বরং বলতে পারি, আপনার এই সলিটারি কর্ণারে পরম নিশ্চিন্ত ও আরামেই আছি। খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি—নভেল পড়ছি। যাকে বলে একেবারে রাজকীয় হালে—তারপর আপনি কতক্ষণ?

এই কিছুক্ষণ!

চিঠিটা পড়েছিলেন, মিঃ ঝাঁ?

হ্যাঁ। আপনি আমার কাছে একটা ফটো চেয়েছিলেন, সঙ্গে করে এনেছি। তবে সিংগল ফটো তো নেই তাঁর। একটা গ্রুপ ফটো ছিল সেটাই এনেছি—

কই দেখি।

বিরূপাক্ষ ইতিমধ্যে চেয়ারে বসেছিল। হাতটা বাড়িয়ে দিল বাগীশ্বরের দিকে এবং ফটোটা নিতে গিয়ে বললে, শিশির আলোটা জেবলে দে তো—

আমি উঠে ঘরের বিজলি বাতিটা জেবলে দিলাম সুইচ টিপে।

বিরূপাক্ষ ঘরের আলোয় হাতের ফটোটা ধরে দেখছিল।

আমি পাশে এসে দাঁড়ালাম।

মাঝারি সাইজের ফটোটা, তবে পুরোনো! লালচে একটা ছোপ ধরেছে ফটোটায়—ঝাপসা—অস্পষ্ট কিছুটা ফটোর চেহারাগুলো।

ফটোর মধ্যে চারজন রয়েছে। তিনটি পুরুষ ও একটি মহিলা। কিন্তু মাঝখানের পুরুষটির দিকে তাকিয়েই যেন চমকে উঠি।

দেখেছি—কোথায় যেন ঐ চেহারা দেখেছি—কোথায়—হঠাৎ মনে পড়ল—আশ্চর্য—অনেকটা ছাগল-দাড়ির মুখের মত—কোন পার্থক্যই নেই যেন

ছাগল-দাড়ির সঙ্গে।

এই ফটোর মধ্যে কে কে আছে, মিঃ ঝাঁ? বিরূপাক্ষ মৃদুকণ্ঠে শুধায়।

প্রথমেই ছাগল-দাড়িকে দেখিয়ে বাগীশ্বর বললে, এই হচ্ছে হরদয়াল চৌধুরী।

তার পাশে?

ওরই আর এক ভাই—প্রভুদয়াল।

হরদয়ালের আর এক ভাই ছিল তাহলে?

ছিল, কিন্তু অনেক দিন আগেই সে মারা গিয়েছে।

ও, আর ঐ মহিলাটি?

ঐ আমার মা রুক্মিণী দেবী।

আর তৃতীয় পুরুষটি? এই বৃদ্ধ।

ওদের বাপ শিবদয়াল চৌধুরী।

ফটোটা অতঃপর বিরূপাক্ষ বাগীশ্বরকে ফিরিয়ে দিল। এবং একটা চার্মিনার ধরিয়ে গোটা দুই টান দিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করল, মিঃ ঝাঁ।

বলুন।

আপনি আপনার চিঠিতে লিখেছিলেন, হরদয়ালের মৃত্যুর সময় পুরানো সহিস লছমন ছুটিতে ছিল এবং একজন নতুন সহিস তার বদলি কাজ করছিল ক'টা দিনের জন্য, তাই না?

হ্যাঁ, শুনেছি লোকটার নাম ছিল সুলতান।

মুসলমান?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, হরদয়াল ব্যাপারটা জানতেন না।

তা বলতে পারি না—তবে এত সামান্য একটা ব্যাপার—তিনি তেমন নজর করেছেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া—

কি?

ছোটখাটো ব্যাপারে শুনেছি হরদয়াল নাকি আদৌ মাথা ঘামাতেন না। ব্রিজপ্রসাদই ঐসব দেখাশোনা করতেন!

আচ্ছা, মিঃ ঝাঁ—দুর্ঘটনার পর ঐ সুলতানের আর কোন খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল কি?

তা তো বলতে পারি না। কিন্তু আর দেরি করবেন না—চলুন এবারে ওঠা যাক।

উঠব! কেন বলুন তো।

আমার বাড়িতেই আপনারা থাকবেন।

না, না—এখানেই আমরা বেশ আছি আর ঝামেলা বাড়াবেন না।

না, না—ঝামেলা কি? এখানে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে—

কিছু না, কিছু না—

কিন্তু এখানে থাকবেন কি করে, স্বরূপকে তো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি—

তাতে আর কি হয়েছে, ফিরে আবার তাকে এখানে পাঠিয়ে দিন গিয়ে।

কিন্তু—

হ্যাঁ, তাই দিন গিয়ে—

বেশ।

বাগীশ্বর অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বাগীশ্বরের জুতোর শব্দ বাইরে বারান্দায় মিলিয়ে গেল।

॥ ১২ ॥

বিরূপাক্ষ ততক্ষণে একটা চার্মিনারে অগ্নি সংযোগ করে চেয়ারটার ওপর আরাম করে গা ঢেলে দিয়েছে।

এখানে পড়ে থাকাটা আদৌ আমার ভাল লাগেনি। ওর সঙ্গে গেলেই তো হ'ত! তাই বললাম আমি।

বিরূপাক্ষ চোখ বুজে চার্মিনার টানছিল, বললে, কেন?

কেন মানে কি! কোথায় এক নির্জন বাড়িতে পড়ে আছি।

নির্জনতাই তো ভাল—

ভাল—

হুঁ—প্রেতেরা যদি সত্যিই থাকে তাহলে তারা সেই সব জায়গায়ইতো বেশি আনাগোনা করে, যেখানে নির্জনতা— তা ছাড়া—

কি?

একটা প্রবাদ আছে, আমাদের দেশে বিশেষ প্রচলিত, জানিস!

প্রবাদ!

হ্যাঁ—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। কেন মিথ্যে ভূতের কিল খাবি! বেশ আছিস, এখানেই থাক। কিন্তু এক কাপ চা হ'লে ভাল হ'ত—

স্বরূপ নেই।

জানি, দেখি—নিজেই তৈরী করে নেওয়া যায় কিনা!

বিরূপাক্ষ সত্যি সত্যিই উঠে পড়ল!

সেই রাত্রেই। বাগীশ্বর ফিরে যাওয়ার ঘণ্টা দুই বাদেই স্বরূপ এসে হাজির হ'ল আবার।

স্বরূপ এসে সামনে দাঁড়াতেই বিরূপাক্ষ বললে, এসেছেন প্রভু! আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি প্রভুর নির্দেশে অগস্ত্যযাত্রায়ই গেলেন।

স্বরূপ বরাবরের মত চুপ-চাপ।

যান—যা হোক কিছু খাবার ব্যবস্থা করুন, ক্ষুধায় নাড়ি পাক দিচ্ছে— আর ঐ সঙ্গে একটু চা।

স্বরূপ ভেতরে চলে গেল।

রাত তখন বোধ করি সাড়ে বারোটা! আহারাদির পর আমি টান-টান হয়ে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছি, কিন্তু বিরূপাক্ষ ইজিচেয়ারটার ওপর একটা চার্মিনার ধরিয়ে বসে নিঃশব্দে ধূমপান করছিল। সেই সন্ধ্যারাত থেকেই বিরূপাক্ষ যেন কেমন গম্ভীর হয়েছিল। দু'-একবার কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ওর দিক থেকে তেমন কোন সাড়া না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই একপ্রকার আমাকে চুপ করে যেতে হয়েছিল।

শয্যায় শুয়ে থাকতে থাকতেই বোধহয় এক সময় একটু তন্দ্রা মত এসে গিয়েছিল। হঠাৎ বিরূপাক্ষের চাপা কণ্ঠস্বরে তন্দ্রাটা ছুটে গেল। শিশির—এই শিশির।

কে ? কি ব্যাপার—বিরু—

চল ওঠ, একটু বেরোব।

বেরোবি ! কোথায় ?

চল।

এই শীতের রাত্রে—তাছাড়া বাইরে যা কুয়াশা নেমেছে—

কুয়াশাটা একটু কেটেছে। চল—

বুঝলাম, বিশেষ কোন কারণে ও বেরোতে চাচ্ছে ঐ রাত্রে। আমি আর দ্বিরুক্তি না করে অতঃপর উঠে দাঁড়াই। তাড়াতাড়ি গায়ে গরম জামা চাপিয়ে নিই। দু'জনে অতঃপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরোলাম।

বাইরে অন্ধকার। চাপা গলায় ফিস-ফিস করে বললাম, স্বরূপ কোথায় ?

সে ঘুমোচ্ছে। তার ঘরে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছি। চল—

বাইরে বের হয়ে দেখি—বিরূপাক্ষের কথাই ঠিক। কুয়াশা তখন অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে বটে কিন্তু একেবারে কাটেনি।

রাস্তায় এসে পূবমুখো যে পথটা পাহাড়ের দিকে চলে গিয়েছে সেই দিকে হাঁটতে শুরু করে বিরূপাক্ষ। ওই রাস্তা ধরেই আমরা আগের দিন সন্ধ্যার সময় গিয়েছিলাম। ক্রমশঃ একটু একটু করে কুয়াশা কেটে যাচ্ছিল, চাঁদের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল অল্পে অল্পে। হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে এসে একটা সরু গিরিবর্ত্মের মধ্যে উপস্থিত হলাম। দু'পাশে খাড়া উঁচু পাহাড়, মাঝখান দিয়ে অপ্রশস্ত গিরিবর্ত্ম।

এতক্ষণ নিঃশব্দেই বিরূপাক্ষকে অনুসরণ করে এসেছি, এবার কিন্তু কথা না বলে আর পারলাম না। শুধালাম, কোথায় চলেছি আমরা বিরু ?

ভেবেছিলাম, বিরূপাক্ষ আমার প্রশ্নের কোন জবাবই দেবে না, কিন্তু বিরূপাক্ষ জবাব দিল। বললে, বাঁ দিকে যে সোজা পথটা উৎরাই-এর দিকে ফেলে এলাম—সেটাই বাগীশ্বরের অফিসের দিকে চলে গিয়েছে—হয়ত তুই লক্ষ্য করিসনি শিশির, সেই রাস্তার শেষ প্রান্তে একটা গিরিবর্ত্ম আছে।

তা করিনি হয়ত কিন্তু এই গিরিবর্ত্মের কথাটা তুই জানলি কি করে ?

আজ দুপুরে এই পথটার একটা সরেজমিন করে গিয়েছি। বিরূপাক্ষ বললে।

সেটা কোথায় গিয়েছে, মানে শেষ হয়েছে, জানিস না নিশ্চয়ই ?

না, জানা হয়নি। কারণ মুখ পর্যন্তই গিয়েছিলাম।

কিন্তু—

ভয় করছে নাকি ?

না।

ইতিমধ্যে আমরা গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করেছিলাম।

সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম। হাঁটতে হাঁটতে উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ চলছিল এবং আকাশে চাঁদের আলো থাকলেও গিরিবর্ত্মের দু'পাশে উঁচু পাহাড় থাকায় পথটায় সর্বত্র তেমন আলো ছিল না।

বিরূপাক্ষ প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। টর্চ ছিল তার হাতে ; তারই আলোয় পথ দেখতে দেখতে চলেছিলাম আমরা সেই সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে।

আবার আমার পূর্ব প্রশ্নটা করলাম। এখানে এলি কেন বলত, এই রাত্রে ?

বিরূপাক্ষ বললে, কেন আবার। দেখতে এলাম পথটা কোথায় গিয়েছে—

শুধু কি তাই ?

তা নয় তো কি ! তাছাড়া—

॥ ১৩ ॥

বিরূপাক্ষের কথা শেষ হয় না। হঠাৎ সেই অন্ধকারে দূরে গিরিবর্ত্মের মধ্যে একটা আলোর মৃদু আভাস আমাদের দু'জনারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিরূপাক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই হাতের টর্চটা নিভিয়ে দিয়েছিল এবং দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দু'জনেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি অদূরে সেই আলোর দিকে। কারও মুখে কোন কথা নেই। তারপর একসময় চাপাকণ্ঠে বিরূপাক্ষ বললে, খুব আস্তে পা টিপে টিপে আয় আমার সঙ্গে। কোনরকম শব্দ যেন না হয়।

বিরূপাক্ষের কথামত পা টিপে-টিপেই এগোই। আলোর আভাসটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে দৃষ্টির সামনে। স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর।

একটা অন্ধ আকর্ষণে যেন সেই আলোটার দিকে এগোচ্ছিলাম দু'জনে আমরা। হঠাৎ একসময় চলতে চলতে আমার সামনে বিরূপাক্ষ থেমে গিয়ে পিছনের দিকে হাত দিয়ে আমাকে ইঙ্গিতে নিঃশব্দে বাধা দিল।

বলা বাহুল্য আমি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম।

বিরূপাক্ষের পিছনে পিছনে এগোচ্ছিলাম বলে এতক্ষণ দৃশ্যটা আমার চোখে পড়েনি। এবারে বিরূপাক্ষের পাশ দিয়ে উঁকি দিতেই সামনের দিকে

পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে নজর পড়ল, একটা ধুনি জ্বলছে। অনেকক্ষণ ধরে বোধহয় জ্বলে জ্বলে এখন ধুনিটা ম্লান হয়ে এসেছে এবং সেই ম্লান ধুনিটার সামনে একটা মনুষ্যমূর্তি বসে, চোখে পড়ল। দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে লোকটা বসে আছে। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া তৈলহীন রুক্ষ চুল। গায়ে একটা কালো রঙের গরম কোট এবং পরিধানে সাধারণ একটা অনুরূপ ট্রাউজার। পাশে একটা এলুমিনিয়মের মগ এবং তার পাশে একটা বন্দুক।

মৃদু ধুনির আলোয় গুহাটা ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছিল।

বিরূপাক্ষ কিন্তু আর এগোয় না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে। প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। লোকটা যেমন হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল নিঃশব্দে তেমনিই বসে থাকে। ঘুমোচ্ছে কিনা লোকটা, কে জানে। হঠাৎ একসময় লোকটা মাথা তুলল।

ম্লান ধুনির আলোয় বেশ স্পষ্টই মুখটা দেখা গেল লোকটার। সারাটা মুখময় দাড়ি। প্রশস্ত কপালের নীচে দুটো চোখ যেন দু'খণ্ড অঙ্গারের মত ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে। খাঁড়ার মত নাকটা। চেহারাটা লোকটার রোগাটে এবং ঢ্যাঙা। বসে থাকলেও বুঝতে কষ্ট হয় না বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই হবে।

ধুনির পাশেই একটা লোহার শিকের মত পড়েছিল, সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে ধুনিটা একটু খুঁচিয়ে দিল লোকটা। কিন্তু খোঁচান সত্ত্বেও ধুনির আগুনটা যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল।

নিজে তো বুঝতেই পারছিলাম না—অতঃপর বিরূপাক্ষ কি করবে এবং বিরূপাক্ষের মুখের দিকে তাকিয়েও বুঝতে পারি না তার মতলবটাই বা কি। এবং আমরা ভাববারও সময় পেলাম না—তার আগেই হঠাৎ যেন ব্যাপারটা ঘটে গেল চোখের পলকে—

গুহার মধ্যের সেই লোকটার আমাদের ওপর নজর পড়ে গেল। আর আমাদের ওপর নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা উঠে দাঁড়াল এবং তার পাশেই যে বড় পাথরটা পড়েছিল সেটাকে দু'হাতে সজোরে আমাদের দিকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল। বিরাট আকারের পাথরটা। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঢালু পথে আমাদের দিকে, গুহার মুখের দিকে গড় গড় করে গড়িয়ে আসতে শুরু করে।

চকিতে বিরূপাক্ষ আমার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। কিন্তু সরে দাঁড়াবার দরকার ছিল না—পাথরটা গুহার বাইরে এলো না—সশব্দে এসে গুহার মুখটা একেবারে বন্ধ করে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে গুহার ভেতর থেকে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন চোখের পলকে ঘটে গেল। হতভম্ব হয়ে দু'জনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছি। গুহা-মুখটা সামনে পাথরের দ্বারা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ।

কয়েকটা মুহূর্ত বিরূপাক্ষ দাঁড়িয়ে রইল—তারপরই এগিয়ে গিয়ে সেই পাথরটাকে ঠেলতে লাগল—গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণপণে ঠেলতে লাগল। কিন্তু পাথরটা অচল-অটল। এক ইঞ্চি সর'ল না। গুহা-মুখ যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ থেকে গেল!

জিগ্যেস করি, কি হ'ল।

বিরূপাক্ষ বললে, সরছে না—

আমি বিরূপাক্ষের সঙ্গে হাত লাগাই। দু'জনে অতঃপর ঠেলতে লাগলাম পাথরটাকে ভেতরের দিকে, কিন্তু দু'জনে প্রাণপণে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলেও পাথরটাকে এতটুকু নড়াতে পারলাম না। গুহামুখে যেন একেবারে অনড়ভাবে আটকে গিয়েছে।

ঐ শীতের রাত্রেও দু'জনার কপালে গুরু পরিশ্রমে ঘাম জমে ওঠে। বোঝা গেল, পাথরটাকে গুহামুখ থেকে নড়ান যাবে না এক চুল।

বিরূপাক্ষ তখন সরে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল—কিন্তু আর দ্বিতীয় কোন পথ আমাদের চোখে পড়ল না। অপ্রশস্ত গিরিবর্ত্ম। দু'দিকে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলাম গড় গড় একটা শব্দে।

ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সর্বনাশ—বিরাট একটা পাথর গড় গড় করে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে আসছে—আসছে আমাদের দিকেই—

দ্বিতীয়বার এক লাফে বিরূপাক্ষ আমাকে টেনে সরিয়ে নিজেও সরে গেল। তারপরই যে-পথে এসেছিলাম সে-পথেই আমরা ছুটতে লাগলাম।

পাথরটা গড়াতে গড়াতে এসে যেখানে আমরা ক্ষণপূর্বে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই পড়ল। বুঝলাম, আর একটু দেরি হ'লেই দু'জনে আমরা গুঁড়িয়ে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যেতাম।

কিন্তু সেটাই একমাত্র নয়—আরো একটা পাথর ওপর থেকে তখন গড় গড় করে গড়াতে গড়াতে নীচে নামছে—

ছুট্—ছুট্—দু'জনে প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে দু'জনে এক সময় আবার পথের ওপরে এসে পড়লাম।

॥ ১৪ ॥

পথের ওপর দাঁড়িয়ে দু'জনে হাঁপাচ্ছি—হঠাৎ ঐ সময় আবার নজরে পড়ল ম্লান চাঁদের আলোয় অদূরবর্তী পাহাড়ের চূড়োয়। গুহা-মধ্যের সেই লোকটা, হাতে তার বন্দুক—আমাদের দিকে তাক করছে—

দু'জনেই থমকে আমরা দাঁড়িয়ে গিয়েছি। নিরস্ত্র আমরা দু'জনেই—

এই বুঝি অব্যর্থ গুলি এসে আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনের কারো বুকে লাগে—কিন্তু সেই মুহূর্তেই ঘটে গেল আশ্চর্য একটা ঘটনা।

সেই ছাগল-দাড়িওয়ালা মূর্তিটার কোথা হ'তে যেন আবির্ভাব ঘটল—

ঠিক বন্দুকধারীর পশ্চাতে—এবং ছাগল-দাড়ি মূর্তিটা, নিশানকারী লোকটার হাতের বন্দুকটা যেন একটা প্রচণ্ড থাবা দিয়ে ফেলে দিল।

হাতের বন্দুকটা পড়ে যেতেই লোকটা ভয়ার্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠে সোজা এক লাফে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। ছাগল-দাড়ি মূর্তিও সেই মুহূর্তে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

দু'জনে তখনো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি চলে কোথাও আর কাউকে দেখা গেল না। না সেই বন্দুকধারী—না সেই ছাগল-দাড়ি।

বিরূপাক্ষ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললে, ছাগল-দাড়ি আমাদের এ-যাত্রা বোধহয় বাঁচিয়ে দিল শিশির—আর একটু দেরি হ'লেই হয়ত হয়ে গিয়েছিল।

সমস্ত ব্যাপারটা তখনো আমার বোধগম্যের মধ্যে আসছে না। যেমন দুর্বোধ্য—তেমনি অবিশ্বাস্য। আমি কোন কথাই বলি না।

চল, ফেরা যাক—

এবারও আমি কোন কথা বললাম না—

বিরূপাক্ষ এগিয়ে চলল, আমি তার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে হেঁটে চলি।

আবার ফিরে এলাম গৃহে। গৃহের সামনে আসতেই নজরে পড়ল কে যেন দ্রুত পায়ে বাড়ির পেছনের দিকে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই বিরূপাক্ষ তাকে অনুসরণ করে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরে বিরূপাক্ষ ফিরে এলো—

দেখতে পেলি—

না। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় বিরূপাক্ষ।

দরজা ভেজানোই ছিল—তখনো। ভেজানো দরজা ঠেলে দু'জনে ভেতরে প্রবেশ করলাম। প্রথমেই ভেতরে ঢুকে আমরা স্বরূপের ঘরের দিকে গেলাম। স্বরূপের ঘরের দরজা বন্ধ। বিরূপাক্ষ যেন এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে তারপরই বন্ধ দরজায় ধাক্কা দেয়—স্বরূপ—স্বরূপ—

কোন সাড়া নেই। দরজাও খোলে না।

বিরূপাক্ষ এবারে জোরে জোরে ধাক্কা দেয় দরজায়—স্বরূপ—স্বরূপ—

এবার দরজাটা খুলে গেল। সামনে নজর পড়ল—চোখ রগড়াতে রগড়াতে স্বরূপ দরজাটা খুলে সামনে দাঁড়ায় আমাদের।

স্বরূপ—

স্বরূপ তাকাল।

একটু চা করে দিতে পার—

মুহূর্তকাল মনে হ'ল যেন স্বরূপ তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে, আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল নিঃশব্দে।

আমরা ফিরে এলাম আমাদের ঘরের মধ্যে আবার।

ফায়ার প্লেসের আগুনটা নিভে গিয়েছে। তাহলেও ঘরের হাওয়ায় একটা আরামপ্রদ উষ্ণতা ছিল।

আমি খাটে বসলাম—বিরূপাক্ষ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

বিরূপাক্ষ যেন একেবারে চুপ-চাপ। মনে হয়, কোন কিছু সে গভীর-ভাবে চিন্তা করছে। এতক্ষণে পকেট থেকে চার্মিনারের প্যাকেটটা বের করে একটা চার্মিনার ধরাল।

ঘরের বাতাসে কটুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। চুপ-চাপ আপনমনে বিরূপাক্ষ চার্মিনার টানছে।

শিশির—

কি ? মুখ তুলে তাকালাম।

ভাবছি, সকাল হলেই এবার ঝাঁর বাড়িতে যাব—

আমি কোন কথা বলবার আগেই বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। স্বরূপ আসছে, বুঝলাম। স্বরূপই—চায়ের ট্রে হাতে সে এসে ঘরে ঢুকল।

তখনো ভাল করে ফর্সা হয়নি। ঝাপসা আলো-আঁধারি চারদিকে একটা পর্দার মত যেন থির থির করে কাঁপছে।

দু'জনে আমরা হন হন করে বাগীশ্বরের গৃহের দিকে এগিয়ে চলি।

গৃহের নাম 'চৌধুরী প্যালেস'। আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে। দূর থেকেই 'চৌধুরী প্যালেস' আমাদের চোখে পড়ল। একটা ছোটখাট পাহাড়ের ওপর বাড়িটা। সাদা রঙের, অনেকটা বেশ দুর্গের আকারের বাড়ি। লোহার একটা বিরাট গেট দেখা যায়। কোন ধাপ নেই—ক্রমশঃ ঢালু হয়ে ধীরে ধীরে চওড়া একটা পাথুরে রাস্তা নীচে প্রধান সড়কে এসে মিশে গিয়েছে।

পথের দু'পাশে বড় বড় দেওদার গাছ।

দু'জনে আমরা লোহার গেটটার দিকে এগিয়ে চলি—চড়াই ঠেলে।

কিন্তু দু'জনে আধা-আধি উঠেছি—দেখি, কে একজন গেটটা খুলে বের হয়ে এলো। গায়ে একটা চাদর—মাথায় উলের মাঙ্কি ক্যাপ্। হাতে একটা মোটা লাঠি।

লোকটা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে—আমরাও ইতিমধ্যে প্রায় মধ্য-পথ পর্যন্ত পেঁৗছে গিয়েছি।

মুখোমুখি হতেই লোকটা দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে ভোরের আলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দেখলাম, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ।

লোকটাই হিন্দিতে আমাদের প্রথম প্রশ্ন করল, কৌন হ্যায় আপ লোগ্—

এটাই কি বাগীশ্বর ঝাঁর বাড়ি—

হ্যাঁ—চৌধুরী প্যালেস—লোকটা জবাব দিল। তারপরেই আবার প্রশ্ন,

কাকে চান।

মিঃ ঝাঁর সঙ্গেই দেখা করব বলে—

ভদ্রলোক হাসল। ইস ওকৎ তো মুলাকাত নেহি হোগা, বাবুজি।

কিঁউ—

তিনি তো এখনো ওঠেনইনি—উঠতে সেই বেলা আটটা।

ওঃ, তা আপনি—

আমি—ব্রিজপ্রসাদ পাণ্ডে—

ওঃ আপনিই এখানকার ম্যানেজার? নমস্তে—বিরূপাক্ষ নমস্কার জানায়।

নমস্তে বাবুজি! আপলোকই সায়েদ কলকাত্তা সে আয়া—

হ্যাঁ।

বুঝতে পেরেছিলাম। তা, বাবুজি কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা জিগ্যেস করতাম!

বলুন!

বুঝতে পারছি অবিশ্যি, আপনারা বাগীশ্বর ঝাঁর গেষ্ট হয়ে এসেছেন—কিন্তু—

কি?

কেন এসেছেন, সেটা যদি আপত্তি না থাকে বাবুজি—বলেন—

ভেবেছিলাম, বিরূপাক্ষ হয়ত মুখ খুলবে না।

ব্রিজপ্রসাদের সঙ্গে ঐ সম্পর্কে কোন কথাই বলবে না, কিন্তু আশ্চর্য, বিরূপাক্ষ বললে, আপত্তি থাকবে কেন— আমরা এসেছি তাঁর গেষ্ট হয়েই—

এখানে নিশ্চয়ই বেড়াতে নয়, বাবুজি—

বিরূপাক্ষ এবারে চুপ করে থাকে।

ব্রিজপ্রসাদ বলে, শুনুন বাবুজি—যে জন্য আপনারা এসেছেন, তার কোন কিনারাই আপনারা করতে পারবেন না—

কি জন্য এসেছি, তাহলে আপনি জানেন? এবারে বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করে পাল্টা।

জানি বললে মিথ্যা বলা হবে—অনুমান করেছি—

কি অনুমান করেছেন?

এখানে কিছুদিন ধরে বাগীশ্বরবাবুকে কেন্দ্র করে একটা ভৌতিক ব্যাপার ঘটছে—সেই সম্পর্কেই এসেছেন, তাই নয় কি?

বিরূপাক্ষ কোন কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

ব্রিজপ্রসাদ আবার বলে, ও কোন সাধারণ ভূত-প্রেত নয়, বাবুজি—

কথাটা বলতে বলতে সহসা যেন মনে হ'ল ব্রিজপ্রসাদের গলাটা ধরে এল। পথের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমরা কথা বলছিলাম।

হঠাৎ বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করে, দেখুন—আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—

আমার সঙ্গে ?

হ্যাঁ—

বেশ তো, চলুন—বেড়াতে বেড়াতে কথা হতে পারে না ? আমি এসময় একটু বেড়াতে বের হই—

কেন হবে না, চলুন—

আমরা তিনজনে পাশাপাশি চলতে শুরু করি। ব্রিজপ্রসাদও বিরূপাক্ষ আগে, আমি তাদের সামান্য পিছনে।

সূর্যোদয় এখনো হয়নি—তবে—পাহাড়ের চূড়ায় আকাশটা ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠছে। প্রচণ্ড শীত হলেও ঐ সময় নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে কিন্তু ভালই লাগছিল।

চলতে চলতেই কথা হয়—আপনি তো অনেক কাল এখানে আছেন পাণ্ডেজি—

তা আছি—কম করেও ত্রিশ বছর তো হবেই—

আচ্ছা, আপনার মনিব হরদয়ালের মৃত্যুর ব্যাপারটা আপনার কি বলে মনে হয়—

লোকে বলে, অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর—

আমি আপনার কথা জিগ্যেস করছি—

আমি এঁদের চাকর—

বুঝলাম, ব্রিজপ্রসাদ মুখ খুলতে চায় না।

আচ্ছা, হরদয়াল চৌধুরীর আর কোন নিকট আত্মীয় ছিল না ?

ছিল—এক ছোট ভাই—প্রভুদয়াল—কিন্তু—

কি ?

অপঘাতে—মানে একটা গাড়ির এ্যাকসিডেণ্টে অনেকদিন আগেই তার মৃত্যু হয়েছে—

গাড়ির এ্যাকসিডেণ্ট্ মানে ?

চলন্ত ট্রেনের নীচে কাটা পড়েছিল—সংবাদ পেয়ে আমার মনিব যান সাহারানপুরে—

এ্যাকসিডেণ্ট্ ?

হ্যাঁ, মৃতদেহ থেঁতলে একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছিল।

হুঁ—আচ্ছা পাণ্ডেজি—

বলুন—

যে প্রেতের ব্যাপারটা এখানে ঘটেছে—সে প্রেত আপনি কোনদিন দেখেছেন ?

দেখেছি—দু'বার—

কবে প্রথম দেখেন—

বাগীশ্বর এখানে আসার দিন দুই পরেই প্রথম—

তারপর ?

তারপর—গত পরশু—

আপনার সঙ্গে সেই প্রেতের কোন কথা হয়েছে ?

না—

॥ ১৫ ॥

তারপরই হঠাৎ ব্রিজপ্রসাদ পাণ্ডে বলে, দেখুন, বাবুজি, আমি আজ সকালে বের হয়েছিলাম আপনার সঙ্গে গিয়ে একবার পরিচয় করবো বলেই।

বিরূপাক্ষ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, বেশ ত চলুন না—

পাণ্ডেজি যেন হঠাৎ কেমন বদলে গেল, গলার স্বরে এবং ব্যবহারে এবং এতক্ষণ তার যে অমায়িক ভাবটা ছিল সেটুকু যেন হঠাৎ পাল্টে গেল। বললে, যাবো—এখন আপনারা ফিরে যান। কথাটা বলে পাণ্ডে আর দাঁড়াল না। হন হন করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

আমরা যেন একটু হতভম্ব। একটু যেন বিব্রত।

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বিরূপাক্ষের দিকে তাকাতেই সে নিঃশব্দে আমায় ইশারা করলো ! যেন বললো, না—চুপ।

বলাই বাহুল্য আমিও আর কোন কথা বলি না।

বিরূপাক্ষ ইতিমধ্যে হাঁটতে শুরু করেছিল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। হাঁটতে হাঁটতে দুজনে গেস্ট হাউসে ফিরে এলাম।

ঘরের মধ্যে ঢুকে ইজিচেয়ারটায় গা ঢেলে দিতে দিতে বিরূপাক্ষ বললে, লোকটা রীতিমত সতর্ক—

পাণ্ডেজি বোধহয় ?

হ্যাঁ—চারদিকে চোখ মেলে রয়েছে দেখলাম—

তুই কি কিছু দেখতে পেয়েছিলি বিরু—প্রশ্নটা না করে পারি না।

বিরূপাক্ষ বললে, হ্যাঁ—তুইও ঐ সময় একটাবার পেছন ফিরে তাকালে ভাল করে দেখতে পেতিস—

তাকিয়ে ছিলাম তো একবার—

কিছু দেখতে পাসনি ?

না—

চৌধুরী লজের দোতলার একটা জানালায়—

কি—

একটা দূরবীন—

দূরবীন !

হ্যাঁ—কে যেন দূরবীনের সাহায্যে আমাদের লক্ষ্য করছিল।

বলিস কি !

তাই—কিন্তু ভাবছি—কে হতে পারে।

বিরূপাক্ষ ?

কি ?

বাগীশ্বর নয় তো—

মনে হলো, না—তবে হতেও পারে—

কিন্তু—

কি—

বাগীশ্বর ঝাঁ-ই যদি হয়, সে বের হয়ে এলো না কেন ? আর তুই বা গিয়ে দেখা করলি না কেন ?

দেখা করলেই কি সে স্বীকার করত যে দূরবীন দিয়ে সে আমাদের লক্ষ্য করছিল—যাক, দেখ তো স্বরূপের নিদ্রাভঙ্গ হলো কিনা।

আমাকে আর উঠতে হ'ল না। ঘরের বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেল। বুঝলাম স্বরূপই আসছে—

অনুমান মিথ্যা নয়। স্বরূপই চায়ের ট্রে হাতে ঘরে প্রবেশ করল।

আপাততঃ আমাদের আলোচনাটা ঐখানেই থেমে গেল।

কিন্তু বিরূপাক্ষের কথাটা ভুলতে পারি না। চৌধুরী প্যালেসের দোতলার জানালা পথে কে আমাদের দূরবীনের সাহায্যে দেখছিল—কে হতে পারে লোকটা—সেইটে মাথার মধ্যে আনা-গোনা করতে লাগল। কে—কে—লোকটা।

বিরূপাক্ষ কেন যেন আর ঐ সম্পর্কে কোন আলোচনাই করল না। ঐ ব্যাপারে যেন একেবারে চুপ করে গেল।

ব্রিজপ্রসাদ এলো। ঐদিন রাত প্রায় দশটা নাগাদ। সেদিন আর আমরা বের হইনি—বাগীশ্বরও আসেনি—বাইরে শীতও পড়েছিল প্রচণ্ড। ঘরের মধ্যে জানালা দরজা এঁটে ফায়ার প্লেস জ্বালিয়ে আমি শয্যায় শুয়ে সর্বাঙ্গে একটা কম্বল টেনে বই পড়ছিলাম।

বিরূপাক্ষও তার চেয়ারটার ওপর বসে একটা বই পড়ছিল।

শুয়ে পড়বো পড়বো ভাবছি এমন সময় জানালার কপাটে মৃদু টোকা পড়ল। টুক—টুক—টুক—তিনবার।

আমি ঠিক ভাল শুনতে পাইনি কিন্তু বিরূপাক্ষ পেয়েছিল ঠিকই—সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়ায় এবং জানালার কাছে এগিয়ে যায়। জানালার কবাটটা খুলে ফেলে—

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক বরফের মত তীক্ষ্ণ হাওয়ার ঝাপটা যেন ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। শির শির করে ওঠে সর্বাঙ্গ।

আমিও উঠে পড়েছিলাম।

বিরূপাক্ষ জানালা পথে অন্ধকারে মুখ বের করে দেয়— তারপরই হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে—ধরুন আমার হাতটা—

কাকে কথাটা বললে ভাবছি—দেখি, একজন কাকে হাত ধরে বাইরে থেকে

টেনে ঘরের মধ্যে আনল।

লোকটার গায়ে একটা ভারি কালো রংয়ের কোট ও মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। লোকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে, ধন্যবাদ—

কথাটা বলে সে-ই জানালাটা বন্ধ করে দিল। ঘুরে দাঁড়াল অতঃপর এবং এতক্ষণে লোকটার ওপর আমার নজর পড়ল। চমকে উঠলাম। আগন্তুক ব্রিজপ্রসাদ পাণ্ডে—

বসুন—বসুন মিঃ পাণ্ডে—বিরূপাক্ষ সাদর আহ্বান জানায়।

ব্রিজপ্রসাদ পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছিল। বসতে বসতে আবার বললে, ধন্যবাদ—

বিরূপাক্ষ এবারে বলে, আমি জানতাম—গোপনেই আপনাকে আসতে হবে—

জানতেন ? ব্রিজপ্রসাদ বিরূপাক্ষর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

॥ ১৬ ॥

মৃদুকণ্ঠে বিরূপাক্ষ জবাব দেয়—হ্যাঁ—জানতাম।

কি করে জানলেন !

তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন, পাণ্ডেজি—

বলুন।

চৌধুরী প্যালেসে দূরবীন আছে ?

দূরবীন।

হ্যাঁ—

কার—একটা ছিল জানি আমি—

আমার মনিব হরদয়াল চৌধুরীর—

এখনো বোধহয় সেটা বাগীশ্বর ঝাঁর হাতে।

বলতে পারি না, হতে পারে—কিন্তু ওকথা জিগ্যেস করছেন কেন, বলুন তো।

ঐ দূরবীনের সাহায্যেই সম্ভবতঃ আজ তিনি আপনাকে লক্ষ্য করছিলেন—

না—তা সম্ভব নয় বিরূপাক্ষবাবু—

সম্ভব নয় ?

না—

কেন—

আমার মনিবের যাবতীয় শখের ও ব্যবহারের জিনিস তার শোবার ঘরেই একটা আলমারির মধ্যে বন্ধ আছে—আর তার চাবি—আমার কাছে থাকে—

চাবি আপনার কাছে থাকে কেন ? বাগীশ্বর ঝাঁ চাননি ?

চেয়েছেন—

তবে—

দিইনি—

দেননি!

না—

কিন্তু—

বলেছি, চাবি হারিয়ে গিয়েছে—

তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন?

হননি—অনেক চেষ্টা করেছিলেন তালাটা খুলবার কিন্তু—

কি?

পারেননি—

সে কি করে সম্ভব!

কারণ আমি চাবি করাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তালা বদলে ফেলেছি—

তালা বদলে ফেলেছেন?

হ্যাঁ—

ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, পাণ্ডেজি—

আমার মনিব হরদয়াল চৌধুরী একবার জার্মানি থেকে কতকগুলো দামী স্পেশাল তালা আনান—তালাগুলো একইরকম দেখতে—তবে—

তবে—

প্রত্যেকটার চাবি আলাদা—

আলাদা—

হ্যাঁ—একটার চাবি অন্যটায় লাগে না। বাগীশ্বর তিনবার তালার চাবি করিয়েছিলেন কিন্তু তিনবারই আমি তালা বদলে দিই—শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই বোধহয় ঐ ঘরের তালাটা খোলা থেকে বিরত হয়েছেন তিনি—

আপনি তাহলে চান না উনি ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করেন—

হ্যাঁ—

কেন?

সেই কথাটা বলবার জন্যই আজ সকালে আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে আসছিলাম। কিন্তু—

কি থামলেন কেন?

শেষ পর্যন্ত মনে হলো দিনের বেলায় আসা ঠিক হবে না—বাগীশ্বরের চর চারদিকে—কে কোথায় দেখে ফেলবে সেও একটা কারণ—আর দ্বিতীয় কারণ—

কি!

জানালায় আমি বাগীশ্বরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেয়েছিলাম। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চলে যাই।

কিন্তু এখনো যে তিনি আপনাকে অনুসরণ করেননি, জানলেন কি করে?

দেখতে পারবেন না—কারণ—প্যালেসের পেছন দিক দিয়ে একটা ছোট দরজা আছে—সেই দরজা দিয়ে বের হয়ে অন্য ঘোরা পথে এখানে এসেছি আমি। শুনুন—যে কথা সকালে আজ আপনাকে আমি বলছিলাম—একটু থেমে যেন দম নিয়ে নিল ব্রিজপ্রসাদ। তারপর বললে, আমার যেন ধারণা—হরদয়ালের ছোট ভাই প্রভুদয়াল—আজো বেঁচে আছে—

কিন্তু আপনি তো সকালবেলা বললেন—তাঁর এ্যাকসিডেণ্টে মৃত্যু হয়েছে, তাই না—

হ্যাঁ—এবং হরদয়াল নিজে গিয়েও সনাক্ত করেছিলেন তাঁর ভায়ের মৃত-দেহ কিন্তু—

কি—

তখন সেটা একটা মাংসপিণ্ড মাত্র—চেনবার কোন উপায়ই ছিল না। তাই আমার ধারণা—

সেইখানেই কোন গোলমাল আছে—

হ্যাঁ—শুধু তাই নয়—মিঃ সেন—

আর কি—

আমার প্রভুর মৃত্যুর ব্যাপারটাও রহস্যজনক—mysterious—ব্রিজপ্রসাদ আবার থামল।

থামলেন কেন, বলুন—

আমার অনুরোধে সে ব্যাপারও আপনি অনুগ্রহ করে একটু অনুসন্ধান করুন—আমি আপনাকে যেভাবে সাহায্য চান করব—

বিরূপাক্ষ যেন মুহূর্তকাল কি ভাবল—তারপর বললে, আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি পাণ্ডেজি—তবে একটা কথা আছে—

কি, বলুন।

আমি একবার চৌধুরী প্যালেসটা সকলের অজ্ঞাতে দেখতে চাই—

বেশ—কবে দেখতে চান, বলুন।

যেদিন আপনার সুবিধা হবে—

আজ যাবেন ?

আজ—

হ্যাঁ—শুভস্য শীঘ্রম্—আমার মনে হয়, আর দেরি করা উচিত হবে না—

বেশ—রাজি আছি—চলুন—

বিরূপাক্ষ উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

কি রে শিশির—যাবি নাকি ?

নিশ্চয়ই—আমিও ততক্ষণে উৎসাহে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি।

বলা বাহুল্য, সেই রাত্রেই আমরা তিনজনে বের হয়ে পড়লাম। পথে যেতে যেতে ব্রিজপ্রসাদবাবুকে জিগ্যেস করে বিরূপাক্ষ, মিঃ ঝাঁ বাড়িতেই

আছেন বোধহয়—

না—

নেই—

না, সন্ধ্যার ট্রেনে মাইনার্স বোর্ডের মিটিং আছে ধানবাদে সেটা এ্যাটেন্ড করতে গিয়েছেন—পরশু সকালে ফিরবেন বোধহয়—

তবে ত ভালই হ'ল—

হ্যাঁ—তাই ত আজই নিয়ে এলাম আপনাদের—

পেছনের সেই ছোট দরজা দিয়ে চৌধুরী প্যালেসে আমরা প্রবেশ করলাম—তিনজনে। নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে অন্ধকারে একটা টর্চের সাহায্যে আমরা সব দেখতে লাগলাম।

নীচেকার হলঘরে এসে হঠাৎ দেওয়ালের গায়ে টাঙানো—একটা গ্রুপ ফটোর ওপরে হাতের টর্চের আলো পড়তেই বিরূপাক্ষ থমকে দাঁড়াল। কে—কে, ও—

কোথায়? কার কথা বলছেন—ব্রিজপ্রসাদ শুধায়—

ঐ যে, ঐ ফটো—ঐ মাঝখানে—যিনি দাঁড়িয়ে আছেন—

ঐতো আমার মনিব হরদয়াল চৌধুরী—

আশ্চর্য। এ যে ঠিক—

তাইতো আপনাকে সকালে বলেছিলাম——বাগীশ্বরের নিষ্কৃতি নেই—

কিন্তু—

আপনি—আপনি বিশ্বাস করেন পাণ্ডেজি— বিরূপাক্ষ শুধায়।

করি বৈকি—

করেন?

হ্যাঁ—

বিরূপাক্ষ যেন কেমন অন্যমনস্ক। সে যেন কি ভাবছে—

হঠাৎ একসময় বিরূপাক্ষ বললে, চলুন পাণ্ডেজি এবারে ফেরা যাক—

ফিরবেন—

হ্যাঁ—

এখনো সব দেখেননি—

দরকার নেই, চলুন!

॥ ১৭ ॥

দিন তিনেক পরের কথা। সেদিনও বাগীশ্বর আসেননি—আজো আসেননি। চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন—বিশেষ কি একটা কাজে ব্যস্ত—একটু অবসর পেলেই আসবেন।

বিরূপাক্ষ একেবারে যেন চুপচাপ। সর্বক্ষণ হয় বসে, না হয় শুয়ে—চামিনার টানছে আর নভেল পড়ছে। কোথাও বেরোবার কোন লক্ষণই নেই—

চার দিনের দিন রাত্রে—রাত তখন প্রায় দশটা হবে— আমি কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি, আর বিরূপাক্ষ চেয়ারে গা এলিয়ে একটা নভেল পড়ছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

শিশির—

কি—

চল—

কোথায় !

বেরোব।

এই রাত্রে !

হ্যাঁ—চল—দেরি করিস না—

কোথায় !

চল না, দেখবি—

বের হয়ে পড়লাম দু'জনে—

সেই রাত্রের সেই পথ—সেই গিরিবর্ত্ম— তারপর—হঠাৎ দূর থেকে দেখা গেল সেদিনকার মত একটা আলোর শিখা। সেই গুহা মুখ !

পাথরটা আর গুহামুখে নেই—

বিরূপাক্ষের ইঙ্গিতে পা টিপে টিপে আমরা অগ্রসর হই—দেখি—গুহা-মধ্যে আগুন জ্বলছে—আর সেদিনকার সেই বিচিত্র লোকটা আগুনের সামনে মাথা নীচু করে বসে আছে। পাশে বন্দুকটা।

আমরা একেবারে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ি।

আর সেই শব্দে বোধহয় লোকটা চট করে মুখ তুলে তাকায়—এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা তুলে নেয়। এবং আমরা কিছু বুঝবার আগেই চক্ষের পলকে বন্দুকটা আমাদের দিকে তুলে ধরে স্পষ্ট হিন্দিতে বললে, যেই তোমরা হও, যেমন দাঁড়িয়ে আছ তেমনি দাঁড়িয়ে থাক, নচেৎ দু'জনকেই সাবাড় করব।

বলতে বলতে চকিতে লোকটা বন্দুক হাতেই উঠে দাঁড়ায়।

বলাই বাহুল্য, ধরা পড়ে আমাদের অবস্থা তখন যাকে বলে একেবারে ন যযৌ ন তস্থৌ।

গম্ভীর কণ্ঠে লোকটা আবার বললে, এগিয়ে এস—এস এগিয়ে এদিকে।

তার নির্দেশমত আমরা এগিয়ে যাই পায়ে পায়ে।

একেবারে ধুনির সামনে গিয়েই দাঁড়াই।

কে তোমরা ?

আমার প্রাণপাখি তখন খাঁচা ছাড়বার উপক্রম। কিন্তু আশ্চর্য নার্ভ বিরূপাক্ষের। সে শান্ত গলায় বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো কিছু আর কথা-

বার্তা হতে পারে না। ঐ পাথরটায় বসব? সামনেই গুহার মধ্যে গোটা তিন-চার বড় বড় পাথর পড়েছিল এদিকে ওদিকে, সেগুলো দেখিয়ে কথাটা বললে বিরূপাক্ষ।

লোকটা বিরূপাক্ষের কথায় তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে একবার ওর মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, বস।

বিরূপাক্ষ আর বাক্যব্যয় না করে নিজে একটা পাথরের ওপর বসে আমাকেও একটা পাথরের ওপরে বসতে বলল।

লোকটা কিন্তু বন্দুক হাতে তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে।

আপনিও বসতে পারেন বন্দুক রেখে কারণ আমরা আপনার শত্রু নই। বিরূপাক্ষ মৃদু হেসে বলল।

আমার বসবার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আগে তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

কি প্রশ্ন আপনার, বলুন?

কে তোমরা?

নাম বললেও তো আপনি আমাদের চিনবেন না।

তোমাদের নাম আমি জানতে চাই না আর জানবার কোন প্রয়োজনও আমার নেই, কারণ আমি জানি, কেন তোমরা এখানে এসেছ।

জানেন।

জানি। সেই শয়তানটার হয়ে টিকটিকিগিরি করতে এসেছ এখানে!

বলা বাহুল্য, আমি কিন্তু কথাটা শুনেই চমকে উঠি, লোকটার মুখের দিকে তাকাই।

লোকটা আবার হিংস্র ভাবে বলে, কিন্তু কেবল তোমরা কেন? কেউ ঐ শয়তান খুনী বাগীশ্বরকে হরদয়ালের প্রেতের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

বিরূপাক্ষ এবারে কথা বললে, কার হাত থেকে বাঁচাতে পারব না বললেন?

হরদয়াল চৌধুরীর প্রেতের হাত থেকে। লোকটা বললে।

কিন্তু আপনি কে?

আমি!

হ্যাঁ—

বিরূপাক্ষ আবার বলে—

আর কেনই বা এভাবে আপনি এখানে আছেন?

সব কথা তোমাকে আমি বলতে পারি তবে একটা শর্তে।

শর্তে?

হ্যাঁ।

কি শর্ত আপনার, বলুন।

কাল সকালেই এখান থেকে তোমরা যদি চলে যাবে বলে প্রতিজ্ঞা কর।

এমন প্রতিজ্ঞা তো আমরা করতে পারি না।

তাহলে কোন কথাই আমি বলব না। তোমরা চলে যেতে পার। তবে এও জানবে—ঐ শয়তান বাগীশ্বরটাকে হরদয়াল চৌধুরীর আক্রোশ থেকে বাঁচাতে তো পারবেই না—তোমাদের জীবনও ঐ সঙ্গে বিপন্ন হবে।

বেশ। হবে—তাই হবে। আমরা উঠছি।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল বিরূপাক্ষ। এবং আমার দিকে তাকিয়ে বলল, চল শিশির—ওঠ—

আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

তোমরা তাহলে ফিরে যাবে না ? লোকটা আবার প্রশ্ন করল।

না।

নিজেদের প্রাণসংশয় জেনেও না ?

না।

কিন্তু তোমরা জান না, সে একটা খুনী—একটা হত্যাকারীকে সাহায্য করতে তোমরা এখানে এসেছ।

খুনী !

হ্যাঁ—হরদয়ালের মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—

তা আমি জানি। জানি, He was killed ! তাকে হত্যা করা হয়েছে। শান্তকণ্ঠে বিরূপাক্ষ কথাগুলো বললে।

জান ? জান তুমি সে কথা ?

জানি বললে কথাটা ভুল হবে। তবে আমার অনুমান তাই। কারণ ছুটন্ত ঘোড়া থেকে কেউ পড়ে গিয়ে ঐভাবে ক্ষতবিক্ষত হবার পরও সেই ঘোড়াকে গুলি করে মারবার মত ক্ষমতা তার থাকাটা একটু অবিশ্বাস্য বৈকি—

ঠিক। ঠিক ধরেছ তুমি। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে তার মাথায় গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। তারপর তার দেহটা ও মাথাটা এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয় যার ফলে পুলিশের ধারণা হয় ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়েই তার মৃত্যু হয়েছিল, সেই আঘাতে—

আমারও তাই ধারণা।

তবে—

কি তবে ?

তবে তুমি ঐ শয়তানটাকে সাহায্য করছ কেন বিরূপাক্ষবাবু ?

আপনি দেখছি, আমার নামটাও জানেন।

জানি।

কি করে জানলেন ?

ও যখন তোমাকে খবর দিতে যায় ছায়ার মতই ওকে আমি অনুসরণ করছিলাম। তাছাড়া—

লোকটার মুখের কথা শেষ হ'ল না। সমস্ত পার্বত্য গুহাটা প্রচণ্ড একটা

বন্দুকের গুলির শব্দে সহসা সচকিত হয়ে উঠল। একটা তীক্ষ্ন যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ করে লোকটা অকস্মাৎ আমাদের সামনেই ঘুরে পড়ে গেল।

॥ ১৮ ॥

ব্যাপারটা এত আকস্মিক আর এত অভাবিত যে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা যেন হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই বিরূপাক্ষের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠি। বাঘের মতই এক থাবা দিয়ে বিরূপাক্ষ গুহা থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে একলাফে গুহার বাইরে পড়ে চেঁচিয়ে বললে, ওকে তুই দেখ শিশির—আমি আসছি—

পরে বিরূপাক্ষের মুখ থেকে সে রাত্রের যে কাহিনী শুনেছিলাম সেই কাহিনীটুকুই আগে বর্ণনা করে তারপর আবার বর্তমান কাহিনীর মধ্যে ফিরে আসতে চাই।

বন্দুকটা যেন ছোঁ মেরেই এক প্রকার মাটি থেকে তুলে নিয়ে এক লাফে একেবারে বিরূপাক্ষ গুহার বাইরে গিয়ে পড়ল। কুয়াশা তখন প্রায় কেটে গিয়েছে। চাঁদের আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দৃষ্টিতে আসে। সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়ে নজরে পড়ল বিরূপাক্ষের মাত্র হাত দশ-বারো ব্যবধানে আর একজন কে যেন আগে আগে ছুটে চলেছে।

বিরূপাক্ষও ছুটতে থাকে তাকে অনুসরণ করে। ছুটতে ছুটতে দু'জনে গিরিপথটা অতিক্রম করে একটা উপত্যকার মত খোলা জায়গায় এসে পড়ে।

বাঁ পাশে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে খাদ। আর তারই গা দিয়ে বলতে গেলে একেবারে একটু ডাইনে বেঁকে উঠে গিয়েছে সোজা পথটা যে পথ দিয়ে সন্ধ্যা-বেলা কয়েক দিন আগে বাগীশ্বর তাদের নিয়ে গিয়েছিল।

ঐ পথে পড়ে দৌড়তে শুরু করে লোকটা। এবং কিছুদূর যাবার পরই একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে ছিল, সেই ঘোড়াটার ওপর লোকটা লাফিয়ে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে সওয়ার নিয়ে ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করে।

বিরূপাক্ষও সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তুলে ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করে বন্দুকের ট্রিগার টিপে দিল। দুড়ুম! প্রচণ্ড একটা শব্দ কঠিন পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপরেই ঘোড়াটা সওয়ার নিয়ে বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল।

বিরূপাক্ষ কিন্তু তবু থামে না, যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটতে লাগল। একটু এগোতেই বাঁকের ওপাশে নজর পড়ল বিরূপাক্ষের সামনে তার ঐ ঘোড়-সওয়ার ছুটছে। অর্থাৎ তার হাতের বন্দুকের গুলি ওদের স্পর্শও করেনি।

বিরূপাক্ষ আবার সেই ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করে বন্দুক তোলে কিন্তু

গুলি আর তার ছোঁড়া হ'ল না, তার আগেই সেই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

তর তর করে যেন হাওয়ার গতিতে নেমে এসে ঘোড়সওয়ারের পথের সামনে দাঁড়াল সেই ছাগল-দাড়ি ছায়ামূর্তি।

রাত্রিশেষের পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় বিরূপাক্ষ স্পষ্ট দেখেছিল সেই ছায়ামূর্তির থুতনিতে ছাগল-দাড়ি। সেই ছায়ামূর্তিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়সওয়ার কোমর থেকে পিস্তল বের করে গুলি ছোঁড়ে পর পর কয়েকবার যেন পাগলের মতই। গুলি ছোঁড়ার শব্দও শোনা যায় কিন্তু সেই শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই হঠাৎ যেন চক্ষের পলকে কোথা থেকে কি ঘটে গেল, ঘোড়া সমেত ঘোড়সওয়ার হঠাৎ যেন শূন্যে একটা লাফ দিয়ে ডান দিককার খাদের মধ্যে সোঁ করে নেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, মনুষ্যকণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্ত একটা শেষ চিৎকার। মানুষের শেষ মৃত্যু-চিৎকার।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বিরূপাক্ষ। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য যেন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। তারপরই দেখতে পেল সেই দীর্ঘ ছায়ামূর্তি যেন ঝড়ের বেগে তারই দিকে এগিয়ে আসছে।

ব্যাপারটা সঠিক বুঝবার আগেই সেই শ্বেত বস্ত্রাবৃত ছায়ামূর্তি যেন একটা ঝড়ো হাওয়ার মতই বিরূপাক্ষর পাশ ঘেঁষে গুহার দিকে চলে গেল। ঠিক পাশ দিয়ে যখন ছায়ামূর্তিটা চলে যায় একটা হিমশীতল হাওয়ার ঝাপটা শুধুমাত্র যেন তার গায়ে এসে লাগে। আপনা থেকেই বিরূপাক্ষের চোখটা বুজে যায়।

সামনের দিকে যখন তাকাল বিরূপাক্ষ, ছায়ামূর্তিকে আর দেখতে পেল না। হাওয়ার মধ্যে যেন ছায়ামূর্তি হাওয়া হয়েই মিলিয়ে গিয়েছে।

বিরূপাক্ষ ওদিকে ছুটে গুহা থেকে বের হয়ে যাবার পর আমি তাড়াতাড়ি আহত লোকটাকে তুলে ধরি।

বুকের বাঁ দিকে গুলি লেগেছিল। গায়ের জামাটা রক্তাক্ত হয়ে উঠছে। লোকটা জ্ঞান হারিয়েছিল গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই। ক্ষিপ্র হাতে লোকটার গায়ের জামা খুলে ফেললাম।

প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে ফিরে এল বিরূপাক্ষ। সেই অপরিচিত লোকটা তখনও অচেতন এবং ক্ষতস্থান দিয়ে তখনও তার রক্ত ঝরছে।

বিরূপাক্ষের মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু চমকে উঠি। সমস্ত মুখখানা যেন তার ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে। বিবর্ণ।

কি হ'ল বিরু? আমার প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না বিরূপাক্ষ।

নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে ভূশয্যায় শায়িত অচেতন রক্তাক্ত লোকটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তাকে পরীক্ষা করতে থাকে।

প্রাণ আছে এখনো—বলতে বলতে অক্লেশে লোকটাকে কাঁধের ওপরে তুলে নিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, চল—

॥ ১৯ ॥

আমাদের নির্দিষ্ট বাসায় যখন ফিরে এলাম রাত্রি তখন শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের সাড়া পেয়ে স্বরূপ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

শয্যার ওপর ধীরে ধীরে শুইয়ে দেয় লোকটাকে বিরূপাক্ষ।

স্বরূপ বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শয্যায় শায়িত হতচেতন সেই লোকটার মুখের দিকে।

বিরূপাক্ষ স্বরূপের দিকে তাকিয়ে শুধাল, একে চিনতে পারছিস, স্বরূপ?

নিঃশব্দে স্বরূপ মাথা দুলিয়ে বললে, না।

শিশির!

কি?

এক কাজ কর, স্বরূপকে সঙ্গে করে এখুনি তুই চলে যা ব্রিজপ্রসাদ বাবুর কাছে। তাঁকে সব কথা বলে যত শীঘ্র সম্ভব একজন ডাক্তার সঙ্গে করে এখানে চলে আসবি গেস্ট হাউসে।

বিনা বাক্যব্যয়ে স্বরূপ আমার সঙ্গে চলল পথ দেখিয়ে।

ঘণ্টাখানেক বাদে ডাঃ চৌবেজি ও প্রৌঢ় ম্যানেজার ব্রিজপ্রসাদ বাবুকে সঙ্গে নিয়ে টমটমে করে ফিরে এলাম আবার।

বাগীশ্বরের সন্ধান করেছিলাম কিন্তু তিনি তার বাংলোতে ছিলেন না।

ফিরে এসে দেখি, আহত লোকটার জ্ঞান তখন ফিরে এসেছে। যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছে মধ্যে মধ্যে।

ঘরে পা দিয়ে আহত লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন চমকে উঠল ব্রিজপ্রসাদবাবু।

একি? এঁকে—এঁকে কোথায় পেলেন?

চিনতে পেরেছেন এঁকে?

বিরূপাক্ষই প্রশ্ন করে।

নিশ্চয়ই।

কে লোকটা?

আমার মৃত মনিব হরদয়াল চৌধুরীর ছোট ভাই।

মানে, প্রভুদয়াল।

হ্যাঁ। প্রভুদয়াল।

সত্যি-সত্যিই চিনতে পেরেছেন ত—এই প্রভুদয়াল—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—আর তাই ত সেদিন আপনাকে বলেছিলাম কিন্তু আমার

মনিব ফিরে এসে কথাটা বললেও, বিশ্বাস আমি করতে পারিনি।

আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল। বিরূপাক্ষ বলে।

ঐ দিনই দ্বিপ্রহরে। প্রভুদয়ালের অবস্থা তখনও সংকটজনক। তাকে ব্লাড ট্রান্সফিউসন দেওয়া প্রয়োজন—কিন্তু ব্লাড হাসপাতালে না থাকাতে—ব্লাড আনতে লোক গেছে—নিকটবর্তী বড় হাসপাতালে।

ঘরের মধ্যে আমি ও ডাঃ চৌবেজি বসে ছিলাম। পাশেই ব্যান্ডেজ বাঁধা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে শয্যায় প্রভুদয়াল চৌধুরী।

ঘণ্টা তিনেক আগে ব্রিজপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে বিরূপাক্ষ বের হয়ে গিয়েছে, এখনো ফেরেনি। নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনেও জরুরী চিঠি দিয়ে ব্রিজপ্রসাদ লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। থানার কেউ এখনও এসে পৌঁছোয়নি।

আমার একটু বিস্ময় লাগছিল, বাগীশ্বরের দেখা নেই এখনো কেন?

বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ ষ্ট্রেচারে কম্বল ঢাকা একটা মৃতদেহ নিয়ে বিরূপাক্ষ ও ব্রিজপ্রসাদবাবু ফিরে এল।

সাড়া পেয়ে আমি ও চৌবেজি বাইরে এসে ষ্ট্রেচারে কম্বল ঢাকা মৃতদেহটা দেখে তো অবাক।

দেখে মনে হচ্ছে, মৃতদেহ। কার? প্রশ্ন করি আমি।

বিরূপাক্ষ আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চৌবেজিকে শুধায়, প্রভুদয়াল কেমন আছে?

বিশেষ ভাল না। চৌবেজি বললেন।

ইতিমধ্যে চিঠি পেয়ে থানা অফিসার এসে হাজির হলো ঘোড়ায় চেপে।

কি ব্যাপার ব্রিজপ্রসাদবাবু? থানা অফিসার পাণ্ডে শুধালেন।

আসুন ঘরে, সব বলছি। সকলে গিয়ে পাশের ঘরে বসল।

কিন্তু বাগীশ্বর ঝাঁকে দেখছি না। তিনি কোথায়? থানা অফিসার প্রশ্ন করেন।

জবাব দিল এবার বিরূপাক্ষ—He is dead! তিনি মৃত।

মৃত?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনাকে, আপনাকে তো আমি চিনলাম না?

বিরূপাক্ষ তখন সংক্ষেপে তার পরিচয় ও কেন সে এখানে এসেছে সব বলল।

বিরূপাক্ষের কথা শুনে মিস্টার পাণ্ডে বললেন, I see! কিন্তু মিস্টার ঝাঁ মৃত, বলছিলেন। তাঁর মৃতদেহ কোথায়?

ঐ বারান্দায় ষ্ট্রেচারে কম্বল-ঢাকা রয়েছে। ওকে আপনারা আগেও দেখেছেন কিন্তু চিনতে পারেন কি—

তারপরই স্বরূপকে ডাকল বিরূপাক্ষ ঘরের মধ্যে।

পাণ্ডেজি, দেখুন ত একে চিনতে পারছেন কিনা—

নাতো—

চেনেন, এ আপনাদের বিশেষ পরিচিত—

কি বলছেন আপনি মিঃ সেন—ব্রিজপ্রসাদ ও থানা অফিসার দু'জনাই বলে।

হ্যাঁ—ও-ই এখানে হরদয়ালবাবুর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিল—

সে কি!

হ্যাঁ। লছমন ছুটি নিয়ে যাবার পর ও-ই এসেছিল বদলি সহিসের কাজ করতে এখানে।

মানে। সুলতান। ব্রিজপ্রসাদ প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—সুলতানই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে সুলতানই তো বটে। সত্যি তো। আশ্চর্য! লোকটাকে এতদিন চিনতেই পারিনি!

পারবেন কি করে, একে চোখে ছিল ঠুলি, তার ওপরে বাগীশ্বর রেখেছিলও ওকে আপনার চোখের আড়ালে।

পাণ্ডেজি এবার শুধালেন, ওকে নিয়ে তাহলে কি করবো এবার মিঃ সেন?

কি আর করবেন, চালান দেবেন। বিচারে তো ফাঁসিই হবে ওর—তখনো বিরূপাক্ষের কথাটা শেষ হয়নি, হঠাৎ সুলতান পাণ্ডের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাউ হাউ করে বোবা কান্না কেঁদে উঠল।

কথা বলে বিরূপাক্ষই আবার, কেঁদে কোন ফল হবে না সুলতান। একমাত্র যদি সব কথা স্বীকার কর ত, দারোগা সাহেব তোমাকে বাঁচাতে পারেন। কি বল! বলবে সব?

কাঁদতে কাঁদতেই মাথা হেলিয়ে সুলতান সম্মতি জানাল।

তখন একে একে প্রশ্ন করে জানা গেল বিরূপাক্ষের কথাই সত্য, তার অনুমান মিথ্যা নয়। সুলতান আগাগোড়াই বাগীশ্বরের সর্বপ্রকার দুষ্কর্মের ডান হাত ছিল এবং বাগীশ্বরই তাকে বোবা করে রেখেছে যাতে সে মুখ না খুলতে পারে কোনদিন কারো কাছে ভবিষ্যতে।

আক্রোশভরে পাণ্ডেজি বলেন, শয়তান। স্কাউন্ড্রেল—

কিন্তু সুলতান হরদয়ালের মৃত্যুর রহস্যটা উদ্ঘাটন করতে পারল না! সে সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।

আমরা তখন সুলতানকে নিয়ে ব্যস্ত, ইতিমধ্যে প্রভুদয়ালের শেষ সময় ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছিল। ডাক্তার ছুটে আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন।

ব্যগ্র হয়ে শুধায় বিরূপাক্ষ, কি খবর ডাঃ?

রক্ত এখনো এল না?

এসে হয়ত রাত্রে পেঁছাবে—

সেদিন বৈকালে। থানায় বসেই কথা হচ্ছিল। ব্রিজপ্রসাদ, বিরূপাক্ষ—পাণ্ডেজি—আমি। পাণ্ডেজিই শুধান, অতীতের সব কথা খুলে বলুন ব্রিজবাবু—

কিন্তু গুলিবিদ্ধ ঐ আহত লোকটাই যে নিঃসন্দেহে প্রভুদয়াল চৌধুরী, সেটা বুঝলেন কি করে?

কেন জানতে পারব না, আমার চাইতে ভাল করে ওদের ত কেউ চিনত না—

ব্রিজপ্রসাদবাবু বলতে লাগল—ছেলেবেলা থেকে ওদের দুই ভাইকে আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। তাছাড়া—প্রভুদয়ালের কপালে ডান দিকে একটা জড়ুল ছিল ও ডান পায়ে ও বাঁ পায়ে জোড়া আঙুল ছিল। সব কিছুই ওর শরীরে আছে, দেখছি।

আপনি তাহলে নিঃসন্দেহ ব্রিজপ্রসাদবাবু—ঐ লোকটা আপনাদের সেই প্রভুদয়ালই।

হ্যাঁ।

॥ ২০ ॥

ব্রিজপ্রসাদের সনাক্তকরণের পরে কারুরই আর সন্দেহ রইল না যে গুলি-বিদ্ধ আহত লোকটাই শিবদয়াল চৌধুরীর সেই নিরুদিষ্ট সন্তান প্রভুদয়াল চৌধুরী। এবং যে প্রভুদয়ালের ট্রেন এ্যাকসিডেণ্টে মৃত্যু হয়েছে বলেই সকলে এতদিন জেনে এসেছে। নকল প্রভুদয়াল এ্যাকসিডেণ্টে মারা যাবার পর—দেহটা এমনই ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল যে তাকে তখন আর চেনবার উপায় ছিল না। কেবল তার পকেটে একটা পার্স কিছু টাকা সমেত পাওয়া যায়—যার মধ্যে সোনার জলে লেখা ছিল—প্রভুদয়াল—নিঝুমপুর।

ব্যাগটা হয়ত লোকটা প্রভুদয়ালের পকেট থেকে চুরি করেছিল—বিরূপাক্ষ সব শুনে বললে।

এখন বোঝা যাচ্ছে, আসল প্রভুদয়াল এতকাল যে কোন কারণেই হোক নিরুদ্দিষ্ট ছিল!

কিন্তু কথা হচ্ছে, শিবদয়ালের ঐ ছেলে প্রভুদয়াল যখন জীবিত ছিল তখন হরদয়ালের মৃত্যুর পর তো তারই সমস্ত সম্পত্তি পাওয়ার কথা। এবং সলিসিটারের কাছে এসে সে আত্মপ্রকাশ করলে সেই সব কিছু পেত। বাগীশ্বরের কোন দাবীই টিঁকত না। তবে কেন প্রভুদয়াল এসে সম্পত্তির দাবী জানাল না আর কেনই বা এভাবে এখানে এসে আত্মোগোপন করেছিল।

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে ঘরের মধ্যে বসে ব্রিজপ্রসাদ, মিঃ পাণ্ডে ও আমার মধ্যে সেই একই আলোচনা চলছিল।

বিরূপাক্ষ পাশের ঘরে ছিল। সে অচৈতন্য প্রভুদয়ালের শিয়রের ধারে একটা চেয়ার নিয়ে নিঃশব্দে বসেছিল।

প্রভুদয়াল ক্রমশঃই সিংক্ করছে। রাতটা হয়ত পেরুবে না। যদি কোন রকমে তার একটুর জন্যও জ্ঞান ফিরে আসে বা অজ্ঞান অবস্থাতেই কোন কথা তার মুখ থেকে বের হয়। কিন্তু বৃথা আশা। সে রকম কোন লক্ষণই প্রভুদয়ালের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না। এবং ডাক্তার বলছিলেন, রাতটা কাটে কিনা সন্দেহ।

আরো একটা ব্যাপার ইতিমধ্যে ঘটেছিল। সুলতান হঠাৎ উধাও হয়েছিল।

পাণ্ডের লোকেরা চারদিকে ছুটছে তার খোঁজে, কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।

রাত দশটা নাগাদ স্থানীয় চৌকিদার সুলতানকে আবার ধরে নিয়ে এলো। সে নাকি স্টেশনে যাবার পথে জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল।

সুলতানকে ধরে আনা হয়েছে সংবাদ পেয়েই বিরূপাক্ষ ঘরে এসে ঢুকল।

মিঃ পাণ্ডে তখন নানাভাবে সুলতানকে জেরা করতে শুরু করেছেন কিন্তু সে একেবারে চুপ! কোন কথারই জবাব দিচ্ছে না।

বিরূপাক্ষ এসে ঘরে ঢুকতেই পাণ্ডে তাকে বললেন, এই যে মিঃ সেন। ও তো কোন কথারই জবাব দিচ্ছে না—

বিরূপাক্ষ মৃদু হেসে বলে, জবাব দেবার মত ওর ক্ষমতা নেই বলেই ও কোন জবাব দিচ্ছে না, মিঃ পাণ্ডে—

ক্ষমতা নেই মানে?

লোকটা বোবা।

সে কি!

পাণ্ডে যেন চমকে ওঠেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

হ্যাঁ—ওর বাকশক্তি খুব সম্ভবত চিরকালের জন্যই কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

কি বলছেন আপনি, মিঃ সেন!

হ্যাঁ আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো—ওকে মূক করে দিয়েছিল আমাদের বাগীশ্বরই তার নিজের স্বার্থে!

সত্যি বলছেন!

তাই আমার ধারণা।

ব্রিজপ্রসাদ বাবু?

বলুন!

এবার চলুন—মৃতদেহটা সনাক্ত করবেন—বিরূপাক্ষ বলে—

সকলে উঠে দাঁড়াল।

চলুন।

সকলে আমরা বারান্দায় এলাম এবং বিরূপাক্ষ স্ট্রেচারের ওপর থেকে কম্বল সরাতেই চমকে উঠলাম। ক্ষতবিক্ষত একটা মৃতদেহ। বীভৎস রক্তাক্ত।

তাহলেও চিনতে পারি, সেটা বাগীশ্বর ঝাঁরই মৃতদেহ। এ অবস্থা কেমন

করে হল ওঁর?

গতরাত্রে পাহাড় থেকে নীচের খাদে ঘোড়াসমেত পড়ে গিয়ে। বির্‌পাক্ষ বলল।

বলেন কি? কি করে পড়ে গেলেন?

সংক্ষেপে বির্‌পাক্ষ তখন আবার গতরাত্রের ঘটনাটা খ্‌লে বলল। কেবল বলল না—সেই ছায়াম্‌র্তির কথা। ছায়াম্‌র্তির কথাটা পরের দিন ট্রেনে ফিরবার পথে বির্‌পাক্ষ আমাকে বলেছিল।

মিস্টার পাণ্ডে এবার বললেন, কিন্তু ঐ আহত লোকটা—ওকে তো চিনতে পারলাম না ব্রিজপ্রসাদবাব্‌, ও কে?

ও ম্‌ত হরদয়াল চৌধ্‌রীর একমাত্র ছোট ভাই প্রভুদয়াল চৌধ্‌রী। বললেন ব্রিজপ্রসাদ।

I see! তাহলে যে শ্‌নেছিলাম অনেকদিন আগে ট্রেন এ্যাকসিডেণ্টে উনি মারা গিয়েছিন—সেটা তাহলে—

না—সত্য নয়।

তাহলে উনি এতদিন কোথায় ছিলেন?

কথা বলল এবারে বির্‌পাক্ষ, সে প্রশ্নের জবাব এখন একমাত্র ঐ প্রভু-দয়ালই দিতে পারে।

কিন্তু প্রভুদয়াল যে ট্রেন এ্যাকসিডেণ্টে নিহত হয়েছিলেন তার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল কি? মিস্টার পাণ্ডে ব্রিজপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

তাহলে ব্যাপারটা আপনাকে খ্‌লে বলতে হয়। বললেন ব্রিজপ্রসাদ।

বল্‌ন।

সাত বছর প্‌র্বে হরদয়াল ও প্রভুদয়ালের বাপ শিবদয়াল চৌধ্‌রী তখন বেঁচে। শিবদয়ালের দ্‌'টি বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর সন্তান র্‌কিম্নণী। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর শিবদয়াল বছর পাঁচেক বাদে আবার বিবাহ করেন। সেই দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান হরদয়াল ও প্রভুদয়াল। র্‌কিম্নণীর চাইতে সাত বছরের ছোট হরদয়াল এবং হরদয়ালের চাইতে চার বছরের ছোট প্রভুদয়াল।

হরদয়াল বিশেষ লেখাপড়া করেননি। কিন্তু প্রভুদয়াল কলকাতায় থেকে পড়তো। কলকাতায় অধ্যয়নকালেই কুসংসর্গে মিশে প্রভুদয়াল এক নম্বরের জ্‌য়াড়ী হয়ে ওঠে এবং কথাটা জানতে পেরে শিবদয়াল ছেলেকে সংশোধন করবার অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল হতে পারেন নি। এবং শেষপর্যন্ত একদিন বাপ ও ছেলেতে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। ঝগড়া করে প্রভুদয়াল বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। দিন দ্‌ই বাদে সংবাদ পাওয়া যায়, সে ট্রেন এ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে সাহারানপ্‌রে। সংবাদ পেয়ে হরদয়াল ও শিবদয়াল ম্‌তদেহ দেখতে যান। ম্‌তদেহ মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও শিবদয়াল সেটা যে প্রভুদয়ালেরই ম্‌তদেহ সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন।

॥ ২১ ॥

ব্রিজপ্রসাদবাবু নিঃসন্দেহ হলেন বটে প্রভুদয়াল সম্পর্কে কিন্তু প্রভুদয়ালের কাছ থেকে কোন ইতিহাসই জানা গেল না শেষ পর্যন্ত, ওই দিনই তার মৃত্যু হওয়ায়।

প্রভুদয়ালকে বাঁচান গেল না শেষ পর্যন্ত। প্রভুদয়াল মারা যেতে আমাদের আর কিছু করবার না থাকায় আমরাও কলকাতাভিমুখী ট্রেনে উঠে বসলাম সেই রাত্রেই।

যথাসময়ে নিঝুমপুর থেকে ট্রেন ছাড়লো। ট্রেন ছাড়বার পর আমি প্রশ্ন করলাম বিরূপাক্ষকে ব্যাপারটা ঠিক কি হলো জানবার জন্যে।

বিরূপাক্ষ চুপ-চাপ কামরার জানালার কাছে বসেছিল একটা জ্বলন্ত চার্মিনার হাতে। আমার প্রশ্নে ফিরে তাকিয়ে বলল, সত্য বলতে কি, ব্যাপারটা আমিও বুঝতে পারিনি শিশির।

কেন ?

জানি না। তবে এইটুকু বুঝতে পেরেছি সম্পত্তির লোভে বাগীশ্বর হরদয়ালকে হত্যা করেছিল।

কিন্তু ঐ ছাগল-দাড়ি ছায়ামূর্তি ?

দুর্বোধ্য !

মানে ?

Spirit বা আত্মা বলে সত্যই কিছু আছে কিনা জানি না। তবে সত্যিই যদি তেমন কিছু থেকে থাকে তো বলব ঐ রহস্যময়, দুর্বোধ্য ছাগল-দাড়ি ছায়ামূর্তি অপঘাতে মৃত হরদয়াল চৌধুরীরই প্রেত ছাড়া কেউ নয়।

সত্যি বলছিস ?

সত্য মিথ্যা নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলিস না শিশির। কারণ দুনিয়ায় আজও অনেক কিছু এমন ঘটে যায় আমাদের স্বাভাবিক সুস্থ বুদ্ধির অগোচরে এবং বিচারে যার ব্যাখ্যা চলে না। হয়ত ব্যাপারটা সত্যই। কিম্বা আমাদের সকলেরই চোখের ভুল।

চোখের ভুল মানে ?

বললাম তো যুক্তি বিচারের কথা তুলিস না, থই পাবি না। যাক যা বলছিলাম। তুই লক্ষ্য করেছিস কিনা জানি না, হরদয়ালের হলঘরে তোর মনে আছে কিনা জানিনা ব্রিজপ্রসাদবাবু যে গ্রুপ ফটোটা আমাকে দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে হরদয়ালের চেহারার সঙ্গে আমাদের দেখা সেই ছায়ামূর্তির চেহারাটা হুবহু মিলে যায়।

হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছি, কিন্তু।

আর কিন্তু কি ?

কিন্তু বিরু—

হ্যাঁ, বুদ্ধির অগোচর হলেও ব্যাপারটা তাই। এবং আমার ধারণা—

বাগীশ্বর ঝাঁ অর্থলোভে কৌশলে হরদয়ালকে হত্যা করেছিল। কিন্তু হত্যা করেও সে সেই অর্থসম্পত্তি ভোগ করতে পারল না। হরদয়ালের প্রেত তার পিছু নিল। এবং ঐ প্রেতই হয়ত প্রভুদয়াল—তার ছোট ভাইকে টেনে এনেছিল নিঝুমপুরে। যার ফলে অর্থাৎ বাগীশ্বর ব্যাপারটা জানার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো সঙ্ঘর্ষ।

কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না বিরু।

কি?

প্রভুদয়াল এভাবে এসে আত্মগোপন করে না থেকে, সোজাসুজি তার প্রাপ্য সম্পত্তির দাবী করলেই ত পারত।

হয়ত পারত।

তবে?

এমনও তো হতে পারে তার পক্ষে কোন কারণে সামনাসামনি এসে সম্পত্তির দাবী জানান সম্ভবপর ছিল না।

কিন্তু—

হ্যাঁ, এমনও তো হতে পারে—হরদয়ালকে চক্রান্ত করে হত্যা করার মধ্যে বাগীশ্বরের সঙ্গে তারও হাত ছিল।

বলিস কি!

বললাম তো সবই অনুমান। প্রভুদয়াল বেঁচে থাকলে শেষ পর্যন্ত হয়ত সব কিছুরই মীমাংসা হত কিন্তু তার মৃত্যুতে তা আর সম্ভবপর হল না।

কিন্তু তোর কি মনে হয়?

মনে হয় সেই রকমই কিছু! কারণ প্রভুদয়ালের মধ্যে পাপ না থাকলে তাকেও ওই রকম অপঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হত না। হয়ত তার সেই পাপেরই মূল্য শোধ করছে ওইভাবে বাগীশ্বরের বন্দুকের গুলিতে অপঘাতে মরে। কিন্তু আর না, রাত অনেক হল এবার একটু ঘুমের চেষ্টা করা যাক।

কথাটা বলে বিরূপাক্ষ টান টান হয়ে বাক্সের ওপরে শুয়ে পড়ল কম্বলটা টেনে নিয়ে। এবং দেখতে দেখতে তার নাক ডাকতে শুরু করে। আমার কিন্তু চোখে ঘুম আসে না। গত কয়েক দিনের ব্যাপারটাই মনের মধ্যে আমার আনাগোনা করতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি হল। অনেক দিন পরে নিঝুমপুরের ঘটনাটা লিখতে বসে সেই কথাটাই আজও আমার মনে হচ্ছে—আসলে ব্যাপারটা কী? সত্যিই কি সেই ছাগল-দাড়ি ছায়ামূর্তি মৃত হরদয়াল চৌধুরীরই প্রেত?

প্রেত বলে সত্যিই কি তাহলে কিছু আছে? না, সবটাই আমাদের একটা দৃষ্টিবিভ্রম।

করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে

১৯৪২-এর ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' নীতি গ্রহণ করে। আসমুদ্র-হিমাচল সমস্ত ভারতবাসী সেদিন মহাত্মাজীর 'করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে' এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ভারতের একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বেলেছিল, তাই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে আগষ্ট বিপ্লব নামে খ্যাত। এই বিপ্লব দেখা দিয়েছিল ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বহু বর্ষব্যাপী পুঞ্জীভূত অত্যাচারের ও শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানে। এই বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে নেতাদের কোন নির্দেশ ছিল না, কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছিল না। এক জায়গার বিপ্লবের সঙ্গে অন্য জায়গার বিপ্লবের কোন যোগাযোগ ছিল না, কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। তথাপি সেদিনকার শহীদদের আত্মোৎসর্গে এতদিনকার বনিয়াদী বৃটিশ সাম্রাজ্যও কেঁপে উঠেছিল।

অতীত ! হ্যাঁ, অতীত বৈকি !

১৯৪২-এর অগ্নি-বিপ্লবের কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টাতে চলেছি।

যুগ ত বদলেছে, তবু কেন অতীতকে স্মরণ করি ? স্মরণ করি, কারণ সে যে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্তরাঙা ইতিহাস।

শীতের সন্ধ্যা। খাঁড়ির ওপারে বাবলা গাছগুলো যেন কেমন এর মধ্যেই ধূসর, অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অমর পড়বার বইটা বুজিয়ে রেখে ঘরের বাইরে সান-বাঁধানো রোয়াকের উপর এসে দাঁড়াল। গায়ে একটা খদ্দরের রঙিন হাফসার্ট ; পরিধানে মোটা খদ্দরের ধুতি। মাথার চুলগুলো এলোমেলো রুক্ষ, কোনদিনই চিরুণীর সঙ্গে সংস্পর্শ নেই। দিদি নীলা প্রায়ই তাই বলে: কি নোংরাভাবেই না তুই থাকতে পারিস অমর ! মাথাটা যেন একটা ঝড়ো কাকের বাসা।

দিদির কথায় অমর মৃদু মৃদু হাসে, কোন জবাব দেয় না। চোখের সামনে ভাসছে একটা অস্পষ্ট ধোঁয়ার পর্দা। সেই পর্দা ভেদ করে শীত সন্ধ্যার আড়ষ্ট বাবলা গাছগুলোর ছায়ামূর্তি যেন আরো অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। দীপকের আসবার কথা ছিল, কিন্তু এলো না ত ! নিশ্চয় কোন কাজে আটকা পড়েছে। কাজ-পাগলা দীপক। সত্যি, দীপককে ওর কি যে ভাল লাগে ! যেন রাঙা দীপ্তমান একটি ঋজু প্রদীপ-শিখা।

ওদেরই ক্লাসে এসে অমর ভর্তি হয়েছে মাত্র মাস কয়েক হলো। অমরের বাবা এই ছোট মহকুমা শহরটিতে বদলী হয়ে এসেছেন মাত্র কয়েক মাস হলো। অমরের বাবা নীরেনবাবু এখানকার সাব-ডিভিসন্যাল অফিসার।

অমর ও সমর দুটি ভাই এবং বোন নীলা।

বড় ভাই সমর ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাসে এম-এ পড়ছিল ; হঠাৎ যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় ও পড়া ছেড়ে দিয়ে সৈনিক বিভাগে চাকুরী নিয়েছে। এখন বিহার রেজিমেণ্টের একজন অফিসার। দিদি নীলা প্রাইভেটে বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বাড়ীতেই পড়াশুনা করে।

অমর দশম শ্রেণীতে পড়ে, সামনের বার ম্যাট্রিক দেবে। লেখাপড়ায় বরাবরই সে খুব ভাল ছেলে। দাদা সমর কোনদিনই লেখাপড়ায় তেমন সুবিধা করতে পরেনি বলে, নীরেনবাবুর ইচ্ছা অমরকে দিয়ে আই-সি-এস পরীক্ষা দেওয়াবেন। ছেলেকে তিনি সেইভাবেই তৈরী করেছেন ওর ছোট-বেলা হতে। অনেকখানি আশা তার অমরের উপরে।

ওদের মা প্রায় বছর দশেক আগে হঠাৎ একদিনের কলেরায় মারা যান, সেই থেকে নীরেনবাবু ওদের একাধারে মা ও বাপের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।

বাড়ীতে ওদের এক বিধবা মাসী আছেন। তিনিই ওদের দেখা-শোনা

করেন। আর আছে বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য শ্যামু বা শ্যামুদা। অমর শ্যামু-দার কোলেপিঠেই মানুষ। অমরের স্বভাব চিরদিনই একটু খামখেয়ালী ও পাগলাটে ধরনের। রোগা দোহারা চেহারা। এক মাথা রুক্ষ চুল। গায়ের রং বেশ কালো ; কিন্তু চোখ-মুখের গঠন অতীব সুশ্রী। ছোটবেলা হতেই অতি-রিক্ত পড়বার দরুন ইতিমধ্যেই তাকে চশমা নিতে হয়েছে। চোখে সর্বদা একটি পুরু লেন্সের চশমা।

চোখের দৃষ্টি সরল কিন্তু উজ্জ্বল। সর্বদাই কেমন যেন এক অনুসন্ধিৎ-সার আলো ফুটে বের হয়। কথা বলেও খুব কম, সেই কারণেই একটা দুর্নাম ওর চিরদিন মুখচোরা বলে, কিন্তু অপূর্ব স্নিগ্ধ একটি হাসি যেন ওর কালো পাতলা ঠোঁট দুটিকে সর্বদাই জড়িয়ে আছে।

নিজের প্রখর বুদ্ধির দ্বারা যতটুকু ও বুঝে উঠতে পারে, তার বেশী ওকে বোঝান শুধু কষ্টসাধ্যই নয়—দুঃসাধ্যও। তর্ক ও করে না, কারণ সেটা ওর স্বভাব নয় বলে, কিন্তু ওর মতের সঙ্গে যখন কারো মতে মেলে না, তখন একটি কঠিন অবজ্ঞায় ওর মুখখানি যেন পাথরের মত কঠিন হয়ে থাকে।

ক্রমে অন্ধকারে সব নিঃশেষ হয়ে মুছে গেল। শীতের ঘোলাটে আকাশের এক প্রান্তে, বাবলা গাছের শীর্ষ ছুঁয়ে কৃষ্ণপক্ষের সরু এক ফালি চাঁদ। বরফের মতই ঠাণ্ডা, মৃত্যুর মত ফ্যাকাশে, বর্ণহীন। নদীতে বোধহয় জোয়ার জেগেছে, খাঁড়ির জল তাই অনেকটা বেড়ে উঠেছে।

মাইতিদের মস্তবড় কাঠের ব্যবসা। খাঁড়ির মুখে অসংখ্য কাঠের গুড়ি, জোয়ারের স্ফীত জলে ভেসে উঠছে একটি দুটি করে। দীপক বলেছিল, আসবো ; কিন্তু এখনও ত এল না।

দীপক। অমরের মতই রোগা। গায়ের রং কিন্তু উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। অমরের মত কালো নয়। তীক্ষ্ম টানা টানা দুটি চোখ স্বপ্নময়। উন্নত খঙ্গের মত উদ্ধত নাসা। মাথায় রেশমের মত পাতলা মসৃণ চুল—প্রশস্ত কপালের উপরে সর্বদাই উড়ে উড়ে এসে পড়ে তার কয়েকগাছি। পাতলা পদ্মপাপড়ীর মত দুটি ঠোঁট, মুক্তার মত শুভ্র সুগঠিত। দাঁতগুলো ঝক্-ঝক্ করে শুভ্রতায়।

ওরা সাত ভাই, ও-ই সবার ছোট। বড় ছয় দাদার মধ্যে বড়দা, মেজদা, সেজদা রাজনৈতিক অভিযোগে কোথায় কোন্ কারাগারে রাজবন্দী। ছোড়দা পিনাকীর বছর তিনেক আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার অপরাধে ফাঁসী হয়ে গেছে। মণিদা, কংগ্রেসসেবী আত্মভোলা, ব্রহ্মচারী ঘরছাড়া। সোনাদা. বহু দিন হলো সন্ত্রাসবাদীদের দলে মিশে পুলিশের গুলীতে নিহত। কুট্টিদা কমিউনিস্ট—একেবারে ভিন্নধর্মী। আর সবার ছোট দীপক, অমরেরই সম-বয়সী, বছর চৌদ্দ-পনের হবে, স্থানীয় স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র।

ওদের বাবা দ্বিজনাথবাবু এককালে এখানে মস্তবড় নামকরা জাঁদরেল

উকিল ছিলেন ; তিনিও আজীবন কংগ্রেসসেবী ছিলেন, এখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স। দুটি চোখই তাঁর অন্ধ হয়ে গেছে। মাথাটা যেন কেমন একটু বিকৃত হয়ে গেছে।

ওদের মা জাহ্নবী দেবী—অপূর্ব ! সত্যিই মা। কি সুন্দর! দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। ছোট-খাটো বেঁটে মানুষটি। দীপকের মতই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ গায়ের রং। মাথা ভর্তি চুল। রগের দুপাশে চুলগুলি সাদা হয়ে গেছে। সর্বদাই পরিধানে ময়লা মোটা লালপেড়ে খদ্দরের একখানা শাড়ী। নিরাভরণ হাত দুটিতে মোটা মোটা দুটি শাঁখা মাত্র সম্বল। কপালে মস্তবড় একটি লাল সিন্দুরের টিপ।

একটি ছেলে ফাঁসীতে প্রাণ দিল, তিনটি জন্ম-অন্তরীণ, একটি ঘর-বিবাগী, স্বামী অন্ধ ; তবু যেন এতটুকু নালিশ বা ক্ষোভ নেই! করুণ স্নিগ্ধ হাসিতে সর্বদাই যেন তাঁর প্রশান্ত মুখখানি ভরা ; অপূর্ব !

ক্লাসের মধ্যে সেরা ছাত্র দীপক। মাস্টাররা বলেন, দীপকের মত তীক্ষ্ণধী ও বুদ্ধিমান ছেলে আজ পর্যন্ত স্কুলের জীবনে কেউ তাঁরা দেখেননি। অদূর ভবিষ্যতে একদিন সে যে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেরা ছাত্র বলে পরিগণিত হবে, দশের এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে, এ বিষয়েও তাঁরা সকলেই একমত। ছেলে ত নয় যেন হীরের টুকরো।

স্কুলের মাস্টার মহাশয়দের মধ্যে অনেকেই শিবজনাথবাবুদের বাড়ী যাতায়াত করেন।

হেডমাস্টার সুধাংশুবাবুর বয়সে অনেক হয়েছে ; স্থির সৌম্য চেহারা, একমুখ সাদা ধবধবে দাড়ি। আজ প্রায় ত্রিশ বছরের উপর স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ তিনি করে আসছেন। দীপকের দাদারা প্রত্যেকেই ওঁর ছাত্র ছিল একদিন, বিশেষ করে দীপকের ছোড়দা পিনাকী ; দীপকের মতই নাকি অমনি তীক্ষ্ণধী মেধাবী ছেলে ছিল সে। অথচ মেয়েদের মত কোমল স্নেহপ্রবণ অন্তর ছিল তার। মানুষের সামান্য দুঃখেও তার দুচোখের কোল বেয়ে অজস্রধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। স্থানীয় স্কুল হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে সে জেলার কলেজে গিয়ে ভর্তি হলো।......

তারপর অকস্মাৎ একদিন বিদ্যুতের মতই ভয়ঙ্কর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল ; ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টুয়ার্টকে গুলী করে হত্যা করার অপরাধে সে নাকি ধরা পড়েছে। সংবাদটা শুনে সুধাংশুবাবু সহসা যেন পাথরের মতই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সন্তানহীন তিনি, পুত্রের মতই ভালবাসতেন তিনি পিনাকীকে। সে দিনটা ছিল রবিবার। সুধাংশুবাবু সংবাদটা শুনেছিলেন ওখানকারই থানার দারোগা সাহেব মহম্মদ জানের কাছে। সে-রাত্রে সুধাংশু-বাবু আহার পর্যন্ত করতে পারেননি। সারাটা রাত্রি বাইরের বারান্দায় অস্থির-পদে ভূতের মত পায়চারী করেই শুধু বেড়িয়েছিলেন। প্রতিকারহীন

দুঃসহ বেদনায় তাঁর সমগ্র হৃদয়খানি যেন সেদিন শতধায় দীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

পিনাকী দীর্ঘ ঋজু সরল রেখার মতই যেন লম্বা। ভাসা ভাসা সরল দুটি চোখের চাউনী। যে মানুষের সামান্যতম দুঃখেও কেঁদে বুক ভাসিয়েছে, কেমন করে ধরলে সে আগ্নেয়াস্ত্র। আশ্চর্য! তারপর বিচার শুরু হলো।

অধীর আগ্রহে সুধাংশুবাবু বিচারের ফলাফল দেখতে লাগলেন।......

মাঝে মাঝে দ্বিজনাথবাবু ওখানে সন্ধ্যার দিকে যেতেন। অন্ধ দ্বিজনাথ-বাবু সংবাদপত্র পড়তে পারেন না। সুধাংশুবাবুই পড়ে পড়ে শোনান. ঘরের এক কোণে নিস্তব্ধ হয়ে ছায়ার মত অন্ধকারে বসে থাকেন জাহ্নবী দেবী।

'তারপর ?' দ্বিজনাথবাবু প্রশ্ন করেন।

'মামলার শুনানী গতকাল ঐ পর্যন্তই হয়েছে, তারপর মুলতুবী আছে। ...আবার আগামীকাল শুনানী!'

'বুঝলে সুধা, অন্ধ আমি, অথর্ব। নইলে পিনুকে ডিফেন্স আমিই করতাম। ছোকরা উকিল মহীতোষ! ঝানু সরকারী উকিলের মার-প্যাঁচ ও বুঝবে কি করে? নিষ্ফল আক্রোশে দ্বিজনাথের শুকনো ভাঙা মুখখানা যেন সহসা পাথরের মতই কঠিন ও শক্ত হয়ে উঠে। হ্যারিকেনের লাল পাংশু আলো অন্ধ চোখের ঘষা কাচের মত মণি দুটোর উপরে প্রতিফলিত হয়ে যেন সহসা অদ্ভুত একটা দ্যুতিতে চক্ চক্ করে উঠে!...সুধাংশুবাবুর মনে পড়ে মহাভারতের সেই কুরুরাজ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ। ভাষাহীন নিষ্ফল মূক বেদনার ব্যর্থতায় দ্বিজনাথের নুয়ে পড়া কুব্জ দেহটা যেন হঠাৎই কেঁপে উঠে, আবার স্থির হয়ে যায় পাথরের মত।...

তারপর একদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো জজ সাহেবের রায় : পিনাকীর ফাঁসীর হুকুম।

বৈশাখের শেষ। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে পৃথিবী যেন খাঁ-খাঁ করছে। সারাটা দিনের রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীর বুক হতে যেন অসংখ্য অগ্নিশিখা বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

দ্বিজনাথবাবু আগেই সে সংবাদ শুনেছিলেন তাঁর এক ভাগ্নের মুখে. তিনি শহরে মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে যাতায়াত করছিলেন।

সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকার। মানুষ-জনের কোন সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই। একটা কঠিন স্তব্ধতা যেন পাষাণের মত ভারী, বাড়ীটার উপরে চেপে বসেছে।

বাইরের দাওয়ায় স্তব্ধভাবে ছায়ার মত বসে আছেন অন্ধ দ্বিজনাথবাবু। অন্দরে জাহ্নবী দেবী দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে! পাশে তাঁর দুই ছেলে দীপক ও সমীর। দাওয়ার এককোণে একটা লণ্ঠন, কমান আছে। অস্ফুটস্বরে দ্বিজনাথবাবু যেন কি বলছেন। টুকরো টুকরো দু'একটা কথার আওয়াজ সুধাংশুবাবুর কানে এসে বাজল : দুঃখ করো না জাহ্নবী, দুঃখ করো না! আর কেউ না জানুক, আমরা ত জানি, পীনু আমাদের নির্দোষ।

একমাত্র দোষ তার...পরাধীন দেশের ছেলে সে। পরাধীন দেশের মা তুমি... আর পরাধীন দেশের বাপ আমি। একটা অহেতুক ভয় যেন সহসা সুধাংশু-বাবুর কণ্ঠ টিপে ধরে। তিনি পালিয়ে আসেন ত্রস্তে পা টিপে টিপে। এরপর বহুদিন তিনি ও-বাড়ীর দিকে পা বাড়াতেও পারেননি। অকারণ একটা ভয়ে বুকের মধ্যে যেন কেমন অসোয়াস্তি বোধ করেছেন। পা দুটো কেঁপে কেঁপে থেমে গেছে।

শেষবারের মত জাহ্নবী দেবী দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যু পথ-যাত্রী নাড়ী-ছেঁড়া-ধন সন্তানের সঙ্গে। সঙ্গে ছিল ছোট দুই ছেলে সমীর ও দীপক।

পিনাকী নারকেলের নাড়ু খেতে বড় ভালবাসত। মা তাই কিছু নার-কেলের নাড়ু তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে! ফাঁসীর আসামী পিনাকী তখন জেলের মধ্যে বসে মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য পড়ছিল। মধুসূদনের লেখা ছিল তার সবচাইতে প্রিয়।

'পীনু!' মা মৃদুস্বরে ডাকেন।

'মা!' পীনু মুখ তুলে তাকাল, এগিয়ে এসে শিশুর মতই মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

স্তব্ধ আলিঙ্গনের মধ্যে মাতা-পুত্র কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। কারো মুখেই কোন কথা নেই। পিনাকীই প্রথম কথা বলল—'মা, আমি জানতাম তুমি আসবে। তোমার শেষ আশীর্বাদ না পেলে ত আমার যাওয়া হয় না। এবার তুমি এসেছো, আমার যাওয়ার পরোয়ানাও মিলল!' চোখে জল আসছিল।

পুত্রের দিক হতে মুখটা মা বুঝি ফিরিয়ে নেন। বলেন, 'তোর জন্য নারকেলের নাড়ু বানিয়ে এনেছি পীনু!'

'এনেছো, কই দাও!...'

মা আঁচল হতে নাড়ু খুলে ছেলেকে একটি একটি করে খাওয়াতে লাগলেন। বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে ছেলে শুধাল, 'আমার জন্য তোমার কি খুব কষ্ট হবে মা?'

'না বাবা! তুমি আমার সোনার চাঁদ ছেলে। স্টুয়ার্টের মত অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট আর ছিল না। আমি নিজেই কতদিন ভেবেছি, এমন কি কেউ নেই যে ও নরাধম পিশাচকে এ পৃথিবী হতে সরিয়ে দিতে পারে?'

'মাগো, সত্যই তুমি আমার মা! জগজ্জননী, শক্তিরূপিণী!'

॥ দুই ॥

'অমর ?'

'কে ?' অমর চমকে বই হতে মুখ তুলে পিছনের জানালার দিকে তাকাল।

রাত্রি তখন আটটা হবে। খোলা জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে দীপক অস্পষ্ট আলোছায়ায়।

'ভিতরে এসো দীপক !'...চেয়ার ছেড়ে অমর উঠে দাঁড়ায়।

'কাল আমাদের ব্যায়াম-সমিতির পঞ্চবার্ষিক উৎসব। মা-ই সভানেত্রী হ'তে রাজী হয়েছেন। আসছো ত ?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আজ তুমি সন্ধ্যায় এলে না কেন ? তোমার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম দীপ।'

'শক্তিসংঘ হতে বের হয়ে তোমার এদিকেই আসছিলাম, পথে পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে দেখা। পণ্ডিত মশাইয়ের ছেলেটির আজ উনিশ দিন জ্বর। পণ্ডিত মশাইয়ের স্ত্রী ও তিনি নিজে এই উনিশ দিন পালা ক'রে রাত জাগছেন। অথচ একথা আমাদের তিনি জানাননি। তাই দেখতে গিয়েছিলাম তাঁর ছেলেটিকে। আজ রাত্রে আমি সেখানেই থাকবো। ওখান হতে ফিরে মাকে সেকথা জানাতে গিয়েছিলাম। সেইখানেই এখন যাচ্ছি। তাই যাওয়ার পথে তোমার এখানে এলাম।'

'ডাক্তার দেখছেন না ?'

'হ্যাঁ, আমাদের শম্ভুবাবুই দেখছেন।'

'অবস্থা কেমন দেখলে ?'

'ডিলিরিয়াম দেখা দিয়েছে, বোধহয় বাঁচবে না।'

'পণ্ডিত মশাইয়ের ঐ একটিই ছেলে না ?'

'হ্যাঁ, এক মেয়ে কল্যাণীদি আর ঐ ছেলে শম্ভু ! আচ্ছা ভাই এখন যাই, রাত্রি হলো, কাল সন্ধ্যা সাতটায় মিটিং আমাদের বাড়ীতেই হবে।'

দীপক চলে গেল।

পরের দিন। দীপকদের বাড়ীতে। ব্যায়াম-সমিতির সব সভ্যরাই প্রায় এসেছে। তরুণ কিশোরের দল। নবীন আশার রঙীন শিখা ! এগার হতে ষোল বছরের সব কিশোর ছেলের দল। দীপকদের বাইরের ঘরে সব জড়ো হয়েছে। ঘরের সিলিং হতে তারে ঝুলন্ত একটা হ্যারিকেন-বাতি জ্বলছে। একটা উঁচু মোড়ার উপরে জাহ্নবী দেবী বসে আছেন। সমিতির সেক্রেটারী হানিফ মার পাশেই বসে। দীপক এসে পৌঁছুতে পারেনি এখনো। দুপুরের দিকে পণ্ডিত মশাইয়ের ছেলেটি মারা গেছে। তারই সৎকারে সে ও সমিতির আর দুটি ছেলে চলে গেছে।

অমর এসে ঘরে প্রবেশ করল। এগিয়ে এসে মার পায়ের ধুলো মাথায় নিল। চিবুক স্পর্শ করে মা বললেন—'বেঁচে থাকো বাবা !'

জাহ্নবী দেবী সকলেরই মা। সত্যিই তিনি মা। ঝুলন্ত হ্যারিকেনের একটুখানি তামাটে আলো মার মুখের উপরে এসে পড়েছে। ডান হাতটি কোলের উপরে আলতোভাবে পড়ে আছে। মা বললেন, 'তোমাদের সভা তা হলে আরম্ভ হোক হানিফ।'

'বিশ্বনাথ ও দীপক এখনো যে এসে পৌঁছায়নি মা!'

'সৎকার শেষ না হলে ত তারা আসতে পারবে না বাবা! তাদের জন্য তোমাদের সভা কেন ঠেকে থাকবে?'

'কিন্তু তাকে বাদ দিয়েই বা আমরা কেমন ক'রে সভা করবো মা?'

মা মৃদু হাসলেন, 'তোমাদের বিরাট কিশোর শক্তির সে সামান্যতম একটি অংশমাত্র! কারও জন্য অপেক্ষা করবার মত ত আমাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় নেই বাবা! তোমরা সভার কাজ আরম্ভ কর।'

এরপর আর অপেক্ষা করা চলে না। সভার কাজ শুরু করতেই হলো। প্রথমেই সেক্রেটারী হানিফ মিয়া সমিতির বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করে শোনাল।

তারপর আরো দু'চারটে আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনার পর মা বললেনঃ 'তোমরাই দেশের তরুণ কিশোর দল। পরাধীন দেশকে তোমরাই একদিন স্বাধীনতার স্বর্ণমুকুট পরাবে। সেদিন আগত ঐ! হিন্দু-মুসলমান ভাইয়েরা, তোমরা আজ পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে এই প্রতিজ্ঞাই করবে, একই দেশমাতৃকার তোমরা দুটি সন্তান হিন্দু-মুসলমান। তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য দেশ। সেখানে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, শিখ নেই, পাঞ্জাবী নেই, তোমরা সকলে একই দেশ-মায়ের সন্তান, ভাই ভাই। সামনে তোমাদের কণ্টকে ভরা অন্ধকার দুর্গম পথ।'

মা একটু থামলেন। অদ্ভুত একটা জ্যোতি যেন মার মুখের উপরে ভেসে উঠছে।

'কিন্তু তারও আগে তোমাদের মানুষ হতে হবে—শিক্ষায় আচারে ব্যবহারে। মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে, গায়ে শক্তি অর্জন করতে হবে,—সুন্দর স্বাস্থ্য, শুচি মন। রাজনীতি বড় কঠিন নীতি। তোমাদের বয়সে তোমরা এখন বুঝতে পারবে না। সে নীতিকে সমগ্র হৃদয় দিয়ে বুঝতে হলে, তার জন্য তোমাদের তৈরী হতে হবে আগে। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, সেই নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে পা ফেলে না চললে তোমরা পথ হারিয়ে ফেলবে—ভ্রষ্ট হবে!'

আবার থামলেন মা। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দীপক ও বিশ্বনাথ এসে ঘরে প্রবেশ করল। মা একবার চোখ তুলে তাদের দিকে তাকালেন। তারপর আবার শুরু করলেন বলতেঃ 'কাজ আর হুজুগের মধ্যে অনেক তফাত আছে' মার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেলঃ 'একতা, বলিষ্ঠ মন ও দেহ যদি তোমাদের থাকে, তবেই সত্যিকারের যুদ্ধ-সৈনিক হতে পারবে তোমরা। তোমাদের

জয় যাত্রায় কেউ বাধা দিতে পারবে না তখন !'

শেষের দিকে মার কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে কি এক গভীর উত্তেজনায়। নিঃশব্দে কিশোরের দল মার কথা শুনতে থাকে। খোলা দরজা-পথে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে সহসা হ্যারিকেনের শিখাটাকে একবার কাঁপিয়ে যায়। মার মুখের উপরে প্রতিফলিত আলোটাও একবার সেই সঙেগ কেঁপে ওঠে।...নিস্তব্ধ কিশোরের দল মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে !

অমর একা একা বাড়ী ফিরছিল। অন্ধকার শীতের রাত্রি ; কুয়াশার কিন্তু কোথাও লেশমাত্র নেই। কালো রাত্রির আকাশটার বুকে জ্বলছে অসংখ্য তারকা। চাঁদ ডুবে গেছে কিছুক্ষণ হবে হয়ত। বড় রাস্তাটা প্রায় নির্জন বললেও চলে। এ দিকটায় এখন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

রাস্তার দু'পাশে আজকাল অসংখ্য ভিখারী দেখা যায়। মহাযুদ্ধে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে দেখা দিয়েছে বীভৎস খাদ্যসঙ্কট। গ্রাম ছেড়ে দলে দলে সব শহরে চলে আসতে শুরু করেছে এর মধ্যেই। ভীমার মন্দিরের সামনে এসে অমর থমকে দাঁড়াল। ধাপে ধাপে সিঁড়ি মন্দিরে উঠে গেছে। সেই সিঁড়িতে অসংখ্য ভিখারী ছেলে, বুড়ো, কচি—কেউ শুয়ে, কেউ বসে।

স্তিমিত তারার আলোয় অন্ধকারে মনে হয় যেন বিরাট এক ভৌতিক ছায়া-মিছিল পথভ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। গায়ের মধ্যে অকারণেই কেমন যেন ছম্-ছম্ করে ওঠে !

ক্ষুধার্থ পৃথিবী যেন রাতের অন্ধকারে মহাশূন্যে অসংখ্য কঙ্কাল-শীর্ণ বাহু বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে—'ভিক্ষাং দেহি মে।...অন্ন দে !...অন্ন দে !...বড় ক্ষুধা !...ম্যায় ভুঁখা হুঁ !...

অমর আবার এগিয়ে চলে। অন্নং দেহি মে, ম্যায় ভুঁখা হুঁ ! দিনের আলোয় ও প্রত্যহই ওদের দেখে। কেউ শতছিন্ন বস্ত্র পরে, কেউ বা অর্ধনগ্ন, কেউ কেউ বা আবার একেবারেই উলঙ্গ। সবার কণ্ঠেই ঐ এক সুর—'অন্নং দেহি মে।' কি বীভৎস চেহারা ওদের ! শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ, রুক্ষ ধূলি-মলিন মাথার চুল। চোখগুলো কোটরে বসে গেছে, তবু কেমন অস্বাভাবিক এক দীপ্তিতে ছুরির ফলার মত ঝক্-ঝক্ করে চোখের মণিগুলো। ওদের চোখের দিকে চাইলে মনে হয় যেন ওরা তীক্ষ্ন নখ দিয়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে সবাইকে। আজকাল প্রায় রাত্রেই ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওই জীর্ণ কঙ্কালসার মরা-মানুষগুলোকে স্বপ্ন দেখে। নিরুপায় আতঙ্কে ও ঘুমের ঘোরেই শিউরে শিউরে ওঠে। ও স্বপ্ন দেখেঃ যেন বিরাট এক মিছিল ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মত এঁকে বেঁকে শহরের বুক বেয়ে চলেছে। কিন্তু কোথায় ? ঐ লোক-গুলোর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আকাশ ও বাতাস যেন ধূম্র-পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। ওদের পদভারে পৃথিবী পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে ওঠে ! এরাও কি এই মাটির পৃথিবীরই মানুষ। এই মাটির পৃথিবীতে কি এরাও ঘর বেঁধে বাস করতে চায় ! মার মুখে শোনা ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ওর মনে পড়ে।

সেই বুভুক্ষিত হিংস্র নরনারী শিশু-যুবার দল! দিনের পর দিন তারা ধনীদের নিদারুণ অভিজাত্যের নিষ্পেষণ সহ্য করেছিল। বুকের রক্ত ঢেলে তারা জুগিয়েছিল ধনীর বিলাসখেলার উপকরণ! খেয়েছে তারা হাজারো জুতোর ঠোক্কর, রক্তাক্ত পিঠে চামড়ার বেতের আঘাতের পর আঘাত! অর্ধাহারে অনাহারে মৃত্যুকে বরণ করেছে তিলে তিলে। তারপর একদিন সেই অত্যাচারের বেদীতে জেগে উঠলো বিপ্লবের আগুন। সেই আগুন লেলিহান শিখায় ছড়িয়ে পড়ল ধনীদের প্রাসাদের স্বর্ণচূড়ায়-চূড়ায়। তখন ওদের বহুদিনের সঞ্চিত সেই ক্ষুধার লেলিহান আগুনে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল।

দেশের মূক সর্বহারা গণশক্তি জেগে উঠলো, হাতে নিয়ে তরবারি। অত্যাচারের হলো শেষ! গিলোটিনের রক্তে দেশ লাল হয়ে উঠল! আর সেই বিপ্লবের আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে জেগে উঠল নতুন ফ্রান্স—নতুন সমস্যা নিয়ে, নতুন চেতনা নিয়ে। এরাও কেন অমনি করে জ্বলে ওঠে না? কেন দেয় না পুড়িয়ে সব ছারখার করে? যাক সব পুড়ে, ছাই হয়ে যাক! ...জেগে উঠুক নতুন ভারতবর্ষ।...যেমনি করে একদা জেগে উঠেছিল সুনীল জলধিতল হতে বহুযুগ আগে সেই সুন্দর স্বাধীন ভারতবর্ষ!

শ্যামুদা অমরের জন্য জেগেই বসেছিল। দরজার কড়া নাড়তে সে-ই এসে দরজা খুলে দিল! 'এত রাত্রি করে কোথায় ছিলিরে অমু?' শ্যামুদা প্রশ্ন করে।

'দীপকদের ওখানে গিয়েছিলাম।'

'সেই কখন বের হয়েছিস, আর দেখা নেই, বাবু খুঁজছিলেন।'

'কেন?'

দিদি নীলা এসে ঘরে প্রবেশ করল। সে এতক্ষণ তার পড়বার ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিল। শ্যামুদা ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দিদি বললে, 'তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে অমু।'

অমর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতেই বলল, 'কাল শুনবো দিদি! কাল বলো। আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'...

'না, আজই সেগুলো বলা দরকার।'

'কিন্তু এখন আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে যে।' অমর আবার অগ্রসর হলো।

'অমর। যেও না. ঐ চেয়ারটায় বসো।' আদেশের সুর যেন ধ্বনিত হয় দিদির গলায়।

বিস্মিত অমর ফিরে এসে চেয়ারটায় উপবেশন করল: 'বল কি বলবে।'

'আজ সন্ধ্যার সময় বাবার কাছে থানার দারোগা ইউসুফ এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন তুমি নাকি সব নিষিদ্ধ দলের সঙ্গে মিশছো!'

বিস্মিত ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অমর দিদির মুখের দিকে তাকায়।

'তুমি জান, দীপকের দাদারা রাজবন্দী—অন্তরীণ ; একজনের ফাঁসী পর্যন্ত হয়েছে ? তাদের বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা তোমার উচিত নয়, এটাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে ?'

'বুঝলাম। তাদের বাড়ীতে যাওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু তারা নিষিদ্ধ হলেন কি যুক্তি অনুসারে দিদি ?'

'তুমি এখনো ছেলেমানুষ আছো অমর, সব কথা তুমি বুঝবে না।'

'কিন্তু বুঝিয়ে দিতে পারলেও বুঝবো না, এত কম বয়স ত আমার নয় দিদি ? তোমার আসল বক্তব্যটা কি খুলেই বল না ?'

'জান, বাবা সরকারী চাকরী করেন ? তাঁর ছেলে হয়ে তুমি রাজদ্রোহী-দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কর কি করে ?'

'তাঁরা রাজদ্রোহী কি-না তা জানি না দিদি, তবে তাঁরা দেশকে ভাল-বাসেন, দেশের ছেলেরা কি করে মানুষের মত হবে, এই চেষ্টাই মা করছেন, এবং আমরা যারা তাঁর ওখানে যাতায়াত করি, সেই শিক্ষাই তাদের তিনি দিচ্ছেন। দেশকে ভালবাসা মানে নিশ্চয়ই রাজদ্রোহিতা নয়।'

'তর্ক তোমার সঙ্গে আমি করতে চাই না অমর। মোট কথা তুমি আর সেখানে যাবে না।'

'তোমার হুকুম কি এটা ?'

'না, এটা বাবার আদেশ বলেই জানবে।'

অমর উঠে দাঁড়াল। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে দৃঢ় অথচ শান্তস্বরে শুধু বলল, 'জানি না দিদি, আদেশটা তোমারই, না বাবার। যদি তোমার হয়, তবে বলবার কিছু নেই ; যদি বাবার হয়, তবে তিনি আদেশটা নিজ মুখ হতেই আমায় দিলে পারতেন, কেন না তিনি জানেন, অন্যায় আমি করি না এবং করবোও না। তবে এই দিকটা আমি কোনদিনই ভাবিনি।'

নিঃশব্দে অমর ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। বিছানায় শুয়েও অমর বহুক্ষণ জেগে ছট্‌ফট্‌ করে কাটাল সে রাত্রে। সত্যি! একথাটা ত কোন-দিনই সে ভাবা প্রয়োজনও মনে করেনি। দেশের কথা ভাবা, চিন্তা করা বা সামান্য আলোচনা করাটাও তাহলে দেশদ্রোহিতা বিদেশীর আইনে। যেহেতু তার বাবা একজন সরকারী পদস্থ কর্মচারী, সেই হেতু যে-দেশে ও জন্মেছে, সেই দেশের কথাও তার ভাববার বা আলোচনা করবার অধিকার নেই। চমৎ-কার যুক্তি।

এরই নাম বৃটিশ শাসন-পদ্ধতি! এমনি করেই আজ বৃটিশ-শক্তি সমগ্র ভারতবর্ষটাকে পঙ্গু করে রেখেছে। মানুষ বলতে একটা প্রাণীকেও বেঁচে থাকতে দেবে না। গলা টিপে মারবে, এই এদের পণ।

॥ তিন ॥

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই বরাবর অমর তার বাবার অফিস-ঘরে এসে প্রবেশ করল। অমরের বাবা নীরেনবাবু কতকগুলো অফিস-সংক্রান্ত ফাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

'বাবা' বলে ডেকে অমর একেবারে পিতার সামনে এসে দাঁড়াল। নীরেন-বাবু মুখ তুলে পুত্রের দিকে তাকালেন। রাত্রে তার ভাল করে ঘুম হয়নি, চোখের কোল দুটো বসে গেছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো।

'আমায় কিছু বলবি অমর?' সস্নেহে নীরেনবাবু প্রশ্ন করেন।

'হ্যাঁ বাবা, আপনি চাকরী ছেড়ে দিন।'

ভীষণ রকম চমকে নীরেনবাবু ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। ছেলের প্রশ্নটা যেন তিনি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না।

'কি বললি?' ছেলের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন।

'আপনি চাকরী ছেড়ে দিন বাবা! যে চাকরী মানুষকে নিজের দেশের প্রতি ভালবাসাকে পাপ বলে শিক্ষা দেয়—যে দেশের রাজার কাছে নিজের দেশকে ভালবাসলে রাজদ্রোহ হয়, সে দেশের রাজার চাকরী করবেন না।'

'অমর!' নীরেনবাবুর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ।

'হ্যাঁ বাবা, কাল দিদির মুখে কতকগুলো কথা শোনা অবধি সারাটা রাত্রি আমি ঘুমোতে পারিনি, ঐ কথাগুলোই ভেবেছি। আপনি আমাকে বলে এসেছেন আমাকে আই-সি-এস হতে হবে, কিন্তু গতকাল সর্বপ্রথমে বুঝলাম, আই-সি-এস হতে হলে আমাকে কি হতে হবে।'

গতকাল থানার নতুন দারোগা ইউসুফের মুখে পুত্রের গতিবিধি সম্পর্কে কতকগুলো কথা শুনে নীরেনবাবু ভেবেছিলেন, পুত্রকে একটু শাসন করে দেবেন, কিন্তু আজ ছেলের কথা শুনে তাঁর কেমন সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। তাঁর এতদিনের যত্নে গড়ে তোলা স্বপ্ন-প্রাসাদের মূলে ঘুণ ধরেছে, যে কোন মুহূর্তেই সেই স্বপ্ন-প্রাসাদ ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। জ্যেষ্ঠপুত্র সমরকে দিয়ে তাঁর কোন সাধই মেটেনি, কত আশা তাঁর অমরের উপরে, কিন্তু—

নীরেনবাবুর চোখের সামনে সব যেন কেমন ধোঁয়ার মতই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাঁর এত সাধের অমর!...দু'চার মিনিট নীরেনবাবু নির্বাক হয়ে রইলেন, তারপর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বসো, অমর।'

অমর বাপের সামনের চেয়ারটায় উপবেশন করল।

'বাবা, আপনিই ত একদিন আমায় বলেছিলেন, জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী, এবং তাঁদের সেবাই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।'

নীরেনবাবু আজ সত্যিই পরাভূত—বাক্যহারা। স্বপ্নেও হয়ত কোনদিনই তিনি ভাবেননি, তাঁরই দেওয়া অস্ত্র একদিন আচম্বিতে তাঁরই বুকে এসে বিঁধে বুকখানাকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেলবে। কি তিনি আজ জবাব দেবেন

এ প্রশ্নের ? চারদিকে একবার তিনি ব্যাকুলভাবে দৃষ্টিপাত করলেন।

অমর বলছিল, 'চাকরী আপনি ছেড়ে দিন বাবা! আমরা একটা মুদীর দোকান করবো। দাদাই বা কেন যুদ্ধের চাকরী করবে, তাকে ফিরে আসবার জন্য লিখে দিন। শুনেছি গ্রামেও আমাদের জমি-জমা আছে, আমাদের কিছুরই অভাব হবে না।'

নীরেনবাবু ছেলের সোজা প্রশ্নের সোজা জবাবটা এড়িয়ে গেলেন, শতকরা নিরানব্বইজন বাপের মতই। বললেন, 'দেশের কথা ভাববার তুমি অনেক সময় পাবে অমর! বয়স এখনও তোমার অল্প। আগে লেখাপড়া শিখে মানুষ হও। শিক্ষা ও জ্ঞানের ভাল প্রসার না হ'লে সব বিষয়ে ভাল ক'রে ভাববার শক্তি কারো জন্মায় না। যাও পড়তে বসগে, তোমার মাস্টার মশাই অপেক্ষা করছেন পড়বার ঘরে।' নীরেনবাবু কতকটা যেন এক নিঃশ্বাসেই কথাগুলো বলে আবার কাগজপত্রের উপরে ঝুঁকে পড়লেন।

অমর একটুক্ষণ অবনতমুখী বাপের দিকে তাকিয়ে দেখে কি ভেবে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু যে প্রশ্নের ঝড় তার মনের মধ্যে জেগেছিল তার মীমাংসা হলো না।

বাইরে পড়বার ঘরে অমরের মাস্টার মশাই সুজিতবাবু অমরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অমর এসে পড়বার টেবিলের সামনে বসল।

শীতের সকাল। পুবের জানালা-পথে শীতের প্রভাতী রোদ এসে ঘরের মধ্যে পড়েছে, প্রথম উষ্ণতার ঈষৎ আভাস। পড়াশুনার ব্যাপারে অমর সাধারণতই একটু বিশেষ মনোযোগী ; কিন্তু ঐ দিন সকালে যেন সে কিছুতেই পাঠ্যপুস্তকে মন বসাতে পারছিল না। গত রাত্রি ও আজ প্রত্যুষের কতকগুলো কথা যেন তার মনকে বিক্ষিপ্ত ক'রে ফেলছে বারবার। পাঠ্য-পুস্তকের বিষয়বস্তু হতে তার চঞ্চল মন যেন ক্ষণে ক্ষণে এলোমেলো পথ দিয়ে আনাগোনা করতে লাগল।

সেদিনকার ইংরাজী পড়া শেষ ক'রে ইতিহাসের বইখানা অমর টেনে নিতেই সুজিতবাবু সস্নেহে অমরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আজ তুমি পড়ায় মন দিচ্ছ না অমর! পড়তে কি আজ ইচ্ছা করছে না ?' অমর কোন জবাব দিল না ; মাথা নীচু করে রইল।

'পড়তে যদি ইচ্ছা না করে, তবে আজ থাক না হয় পড়া।'

'মাস্টার মশাই !' অমরের ডাকে সুজিতবাবু মুখ তুলে পূর্ণদৃষ্টিতে অমরের মুখের দিকে তাকালেন।

'ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখে আমি যদি আই-সি-এস না হই, তবে কি বাবাকে খুব দুঃখ দেওয়া হবে ?'

সুজিতবাবু জানতেন, সাধারণ ঐ বয়েসী ছেলেদের থেকে অমর একটু বেশী তীক্ষ্ন। এই অল্প বয়সেই অনেক জিনিসকে উপলব্ধি করবার বিশেষ একটা জ্ঞান ছেলেটির মধ্যে বহুবার তিনি লক্ষ্য করেছেন। অমরের বাবার

সঙ্গেও আলাপ-আলোচনায় যতটুকু তিনি বুঝতে পেরেছেন, অমরের উপরে নীরেনবাবু অনেকখানি আশাই পোষণ করেন।

ছেলেকে শেষ পর্যন্ত আই-সি-এস করবার একটা উগ্র বাসনা নীরেন-বাবুর কথায়-বার্তায় উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এও তিনি জানেন, অমর যে রকম মনোযোগী, পরিশ্রমী ও তীক্ষ্ন ছেলে, তার পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে একজন আই-সি-এস হওয়া এমন কিছুই একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ত হবে না। অমর নিজেও যে সেইভাবে নিজেকে তৈরী করছে না, তাও নয়। সর্বতোভাবেই সে নিজেকে সেইভাবে আপ্রাণ চেষ্টায় গড়ে তুলতে সচেষ্ট। আশ্চর্য রকম পিতৃভক্ত সন্তান সে। তাই সুজিতবাবু আজ অবাক হয়ে গেলেন অমরের মুখে এই ধরনের কথা শুনে।

পড়ার ফাঁকে ফাঁকে অমরের সঙ্গে সুজিতবাবুর অসঙ্কোচে অনেক প্রকার আলোচনাই হতো। স্বল্পভাষী অমরের মধ্যে দূরের মানুষকে আপন করে নেওয়ার একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল। ছাত্র হলেও গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মাঝখানে অমর ও সুজিতের পরস্পরের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্বভাব জেগে উঠেছিল এ কয় মাসের মধ্যেই।

নিজের ছোট ভাইটির মতই সুজিতবাবু অমরকে স্নেহ করতেন। তার ভাল মন্দর দিকে সর্বদা তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতেন। সস্নেহে সুজিতবাবু অমরকে বললেন, 'তোমার কি হয়েছে, আমাকে সব খুলে বল অমর! হঠাৎ কেন আজ তোমার মনে এসব কথা উদয় হলো?'

'দেশ আমাদের পরাধীন মাস্টার মশাই! আমরা সেই পরাধীন দেশের পরাধীন মানুষ! অথচ দেশকে আবার আমাদের স্বাধীন করতেই হবে। এবং তাই যদি হয়, তবে যারা আমাদের দেশবাসীকে চক্রান্ত ক'রে পরাধীন ক'রে রেখেছে সেই শাসকজাতির শোষণের প্রতিনিধি কেমন ক'রে আমি হবো? অথচ বইয়ে পড়েছি—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ; বাবা চান আমি লেখাপড়া শিখে আই-সি-এস হই। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে যেমন তাঁকে অসম্মান করতে পারি না, তেমনি ত আমার দেশকেও আমি ভুলতে পারি না মাস্টার মশাই!'

'সব কথাই তোমার ঠিক অমর! পিতা এবং দেশ দু'দিকেই তোমার কর্তব্য আছে, এবং দু'দিককার কর্তব্যই তোমাকে সমানভাবে পালন করতে হবে। তাই যদি পারো তবেই বুঝব, তুমি সত্যিকারের শিক্ষিত, তুমি মানুষ! সত্যি সেদিন সার্থক হবে তোমার 'অমর' নাম। দেশকে ভালবাসলেই শুধু দেশকে স্বাধীন করা যায় না অমর! সর্বাগ্রে তোমাকে মানুষ হতে হবে, জানতে হবে তোমার দেশের মধ্যে কোথায় গলদ, কিসের অভাব, কি প্রয়োজন! তা জানতে হলে তোমাকে অনেক পড়াশুনা করতে হবে, অনেক কিছু বুঝতে হবে, জানতে হবে। প্রকাণ্ড একটা মেসিনের সব কলকব্জাগুলোর সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, যেমন কোথায় মেসিনের কল বিগড়েছে, ধরা যায় না,

তেমনি দেশের সব কিছু না জানলে, দেশকে স্বাধীন করবার জন্য চেষ্টা করাও যায় না। দেশকে আজ তুমি ভালবেসেছো, এইটাই আজ দেশের সবচাইতে বড় পাওয়া। এমনি ক'রে যেদিন দেশের সমস্ত কিশোর-কিশোরীদের মনে দেশপ্রেম জেগে উঠবে, সেদিন দেশের স্বাধীনতাকে কোন পরদেশী বিজেতাই আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না বেশীদিন। কুঁড়ি হতে যেমন ফুল ফুটে উঠে, তেমনি তোমাদের ঐ দেশপ্রেম হতেই জন্ম নেবে একদিন লাখে লাখে দেশকর্মী। ইতিহাসেই পড়েছো, Rome was not built in a day! আগে দেশকর্মী হবার সাধনা করো, তারপর দেশের কাজ! তাছাড়া আই-সি-এস পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেই যে তোমাকে আই-সি-এস হয়ে থাকতে হবে তার ত কোন মানে নাই। সুভাষচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, তাঁরাও ত আই-সি-এক হয়েছিলেন, কিন্তু চাকরী করেননি। তেমনি পরবর্তীকালে যদি তোমার মনে তখন এই কথাটাই উদয় হয় যে, তোমার পক্ষে চাকরী করা সম্ভব হচ্ছে না, সেদিন নিশ্চয়ই তোমার বাবা বেঁচে থাকলেও বাধা দেবেন না। বর্ত্তমানে তোমার সামনে একমাত্র নির্দেশঃ মানুষ হতে হবে—কতকগুলো ডিগ্রীর বোঝা নিয়ে লবণবাহী বলদ নয়। সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষ, দেশের ভাবী সন্তান।' যেন কতকটা এক নিঃশ্বাসেই সুজিতবাবু কথাগুলো বলে শেষ করলেন। অমরও একাগ্রচিত্তে কথাগুলো শুনে গেল।

মনের অনেকখানি দ্বন্দ্ব যেন কেটে গেছে।

'বেলা হয়ে গেল অমর! তোমার স্কুলে যাবার সময় হলো, আজ উঠি।'

সুজিতবাবু উঠলেন। অমর নত হয়ে মাস্টার মশাইয়ের পায়ের ধূলো নিল। মাস্টার মশাই সুজিতের মাথায় ডান হাতখানা রেখে বললেন, 'মানুষ হও'।

।। চার ।।

আজ কয়েকদিন হতেই শীতটা যেন একটু কম বলে মনে হচ্ছে। বসন্ত আসতে ত এখনও অনেক দেরী, তবে?—এখনও ত শুকনো পীত পাতাগুলো ঝরে পড়বার সময় হয়নি। তবে এ বসন্ত বাতাসের আবির্ভাব কেন—দিকে দিকে বিলীয়মান শীতের সকরুণ দীর্ঘশ্বাসের মত ?

অমরের দাদা ক্যাপটেন সমর ২৮ দিনের 'ওয়ার লিভ' নিয়ে বাড়ীতে এসেছে। মণিপুর ফিল্ড হতে এসেছে। মুখে সর্বদাই যুদ্ধের গল্প। চটকদার বড় বড় কথা।

নীরেনবাবু প্রায়ই ছেলের কাছে বসে বসে যুদ্ধের গল্প শোনেন। দিদি নীলাও সে সভায় যোগ দেয়। কেবল বাড়ীর মধ্যে অমরই বেশীর ভাগ ঐ ধরনের সভা ও গল্প এড়িয়ে যায়। ইচ্ছে করেই সে ওদের গল্প-সভাকে এড়িয়ে চলে, ওর ভাল লাগে না।

গ্যালান্ট্রির জন্য দাদা সমর M. C. (Military Cross) ডেকরেশন

পেয়েছে। ডেকরেশন দেওয়ার সময় ডিভিশানের কমাণ্ডার জেনারেল কিভাবে ওর পিঠ চাপড়ে বলেছে 'বাহাদুর!' তারই বারংবার পুনরাবৃত্তি—একঘেয়ে আত্মস্তুতি।

অমরের মনে হয় 'গ্যালাণ্ট্রি'ই বটে। দুর্ধর্ষ জাপানী সৈন্যদের ছুঁচালো বেয়োনেটের সামনে না দাঁড়াতে পেরে বর্মা হতে গৌরবময় (?) পশ্চাদপসরণের সময় কোন্ এক শাদা চামড়া কর্ণেলের জীবন রক্ষা করবার জন্যই তার দাদাকে M. C. ডেকরেশন দেওয়া হয়েছে, সেইটাই নাকি তার গ্যালাণ্ট্রি ও ডিস্টিংগুইসড্ সার্ভিসের অকাট্য প্রমাণ। পাকাপোক্তভাবে ভবিষ্যতে সৈন্যবাহিনীতে চাকরী পাওয়ার আশা নাকি তার খুব বেশী।

প্রথম দিক দিয়ে নীরেনবাবু তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সমরের উপরে যতটা নিরুৎসাহ ছিলেন, এখন যেন আর ততটা তিনি নন। শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালী পিতার মতই তিনি অদূরে ভবিষ্যতে পুত্রের একটি ভাল পাকাপোক্ত সরকারী চাকরীর সম্ভাবনায় উৎসাহিত ও উৎফুল্ল আজকাল। যে দাসত্বের বীজ পুরুষানুক্রমে তাঁর শরীরের প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত, এ তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে এবং এর জন্য হয়ত নীরেনবাবুকেও ততটা দোষ দেওয়া চলে না।

সমর এবারে ছুটিতে আসা অবধিই লক্ষ্য করেছে, অমর তাকে যেন বিশেষ-ভাবে সর্বদাই এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। নেহাৎ কোন সময়ে সামনা-সামনি পড়ে গেলে নিতান্ত দু'চারটে ছোটখাটো কথা বলে অমর পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

অমরের টেস্ট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এক ইংরাজী ও ইতিহাস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সে দীপকের চাইতে বেশী নম্বরই পেয়েছে। মাত্র পাঁচ নম্বরের জন্য সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এখানকার স্কুলে ভর্তি হবার পর পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই অমরের সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতা দীপকের সঙ্গে।

অমর কিন্তু এই ফলাফলে এতটুকুও দুঃখিত হয়নি। পরীক্ষায় হার-জিত আছেই এবং পরীক্ষার ফলাফলটাই মানুষের বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র সত্য নিরিখ নয়। দীপককে সে গোড়া থেকেই ভালবাসত, পরীক্ষার ফলাফলের পর সেই ভালবাসার সঙ্গে আরো একটা জিনিসের উদ্ভব হয়েছে, সেটা দীপকের প্রতি একটা শ্রদ্ধা।

সেদিন রবিবার, স্কুল বন্ধ। বিকেলের দিকে অমর সেদিনকার সংবাদপত্রটা শুয়ে শুয়ে পড়ছিল। যুদ্ধের নৃশংস আত্মঘাতী অগ্নির লেলিহান শিখা সারাটা বিশ্বময় আজ ছড়িয়ে পড়েছে ধ্বংসের মারমূর্তিতে। দেশ-দেশান্তরে এত কষ্টে গড়ে তোলা সমাজ সংস্কার সভ্যতা যেন শুকনো পাতার মতই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

জার্মান সৈন্যের বিজয় অভিযান চলেছে মহাদেশ রাশিয়ার বুকের উপর দিয়ে। জাপানের অগ্রগতি অব্যাহত! প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশি উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে সাবমেরিন, মাইন, ডেপ্থচার্জে! ছবির মতই চোখের উপরে অমরের গত যুদ্ধের পৃষ্ঠাগুলি ভেসে উঠে একের পর এক।

১৫ই ফেব্রুয়ারী জাপানী সৈন্যদের হাতে সিঙ্গাপুরের পতন। ১৬ই জাপানী সৈন্যদের নিউগিনিতে পদার্পণ। ৭ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন। ৩০শে এপ্রিল জাপানীরা অধিকার ক'রে নিল ল্যাসিও। ৩রা মে মান্দালয়ও অধিকার করল।

সেই সঙ্গে ভারতে, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে এসেছে দুর্দিনের ভয়ঙ্কর কালোমেঘ। যেন একটা কালো ঘোড়া তার অগ্নিনিঃশ্বাসে চারদিকে অগ্নিকণা বৃষ্টি ক'রে চলেছে। দেশে দেশে ভয়ঙ্কর খাদ্য-সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে। ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা বাংলার স্বর্ণাঞ্চলেও সেই আসন্ন দুর্ভিক্ষের কালোছায়া ঘনিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই বহু গ্রামে চাউল দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। সাধারণ চাষা-ভুষা ও গৃহস্থেরা অর্ধাহারে অনাহারে মৃত্যুকে বরণ করেছে। কত লোক এসে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পা বাড়িয়েছে। দুর্ভিক্ষের কালো সাপটা এঁকে বেঁকে চলেছে শহরের দিকে। মৃত্যু-মিছিল এগিয়ে চলেছে, গ্রাস করবে—সব গ্রাস করবে !

সমর এসে ঘরে প্রবেশ করল। 'আজকের কাগজ বুঝি অমু ?'

অমর উঠে বসে, 'হ্যাঁ'। ছোট সংক্ষিপ্ত জবাব।

'যুদ্ধের খবর পড়ছিস বুঝি ? খুব ইণ্টারেস্টিং, না ?'

অমর কোন জবাব দেয় না। সমরই আবার বলতে শুরু করে। বেশী কথা বলা আজকাল যেন সমরের একটা মুদ্রাদোষের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে ঃ 'জাতীয় জীবনে সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, কৃষ্টির দিক দিয়ে মাঝে মাঝে এরকম মহাযুদ্ধ একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ হতে আজ পর্যন্ত তাই এই সংঘর্ষ চলে আসছে।'

'কিন্তু ভারতবর্ষের এতে লাভ কি ? এই মহাযুদ্ধের শেষে যখন ভাগ-বাঁটোয়ারার বৈঠক বসবে, কালনেমির লঙ্কা ভাগের জন্য বিশ্বশান্তির অজুহাতে সেদিনকার সে প্রহসনে ভারতবাসীদের কতটুকু প্রাপ্য থাকবে দাদা ?'

'বলিস কি তুই অমু ? ভারতীয়রা এবার যুদ্ধে যে সাহায্য করছে, তুই কি ভাবিস এ বৃথাই যাবে ? নেভার।'

অমর মৃদু হাসে ঃ 'না দাদা, বৃথা যাবে না। কতকগুলো রঙীন ফিতা মিলবে, সগৌরবে সেগুলো বুকে এঁটে তোমরা পদদলিত ভারতভূমির বুকের উপর দিয়ে মার্চ ক'রে বেড়াতে পারবে !'

সমর ছোট ভাইয়ের কথায় কিছুক্ষণ 'থ' হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্বল্পভাষী অমরের মুখে কি এসব কথা ?

'নীলার কাছে এবারে এসে তোর সম্পর্কে যে সব কথা শুনেছি, সেগুলো তাহলে মিথ্যা নয় ?'

দুইখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গারের মত সহসা যেন অমরের চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য ধক্-ধক্ ক'রে জ্বলে উঠে। একটা কঠিন উত্তর জিহ্বার আগায় এসেই আবার থেমে যায়। তীব্র সরোষে সমর বলে ঃ 'কতকগুলো লোফার ভ্যাগাবণ্ডের সঙ্গে মিশে মিশে আজকাল তোর বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি। It's a remarkable improvement !'

কিন্তু এতটুকু পরিবর্তন নেই অমরের চোখে-মুখে। ধীর শান্ত সংযত কণ্ঠে ও শুধু জবাব দিয়ে যায় : 'দাদা, যাদের তুমি চেন না, তাদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা না থাকতে পারে, কিন্তু অসম্মান প্রদর্শনও তাদের তুমি করতে পার না।'

'Shut up you fool!' সমর তীব্রকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠে।

ধীরপদে অমর ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়। বয়োজেষ্ঠ্যদের কোন দিন অপমান সে করে না।

ঠিক এমনি সময় খোলা দরজা-পথে দেখা গেল দীপককে। রাগদীপ্ত সমরের মুখের দিকে হাস্যোৎফুল্ল চোখে দীপক তাকাল : 'কবে এলেন সমরদা? ভাল আছেন ত?'

সমর কোন জবাবই দিল না। তীব্র দৃষ্টিতে একবার শুধু দীপকের দিকে দৃষ্টিপাত করল। অমরও তার দাদার অভদ্রোচিত ব্যবহারে নিজেকে একান্ত অসহায় ও বিব্রত মনে করছিল। সে যেন দীপককে কি বলতে উদ্যত হতেই মৃদু হেসে দীপক বললে : 'মা এসেছেন অমু, মাসীমার সঙ্গে আলাপ করতে।'

'মা? মা এসেছেন! কই? কোথায় তিনি?'

অমরের কথা শেষ হবার পূর্বেই দীপকের মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

সমর বিস্মিত চোখের দৃষ্টি তুলে দীপকের মার মুখের দিকে তাকাল। মার দুটি চক্ষু যেন প্রদীপ্ত দুটি অগ্নিশিখা। মুখে এক অদ্ভুত সুন্দর হাসি।

অমর এগিয়ে গিয়ে নত হয়ে মার পায়ের ধুলো নেয়।

চিবুক স্পর্শ ক'রে সস্নেহে মা বলেন : 'বেঁচে থাক বাবা! ঐ বুঝি তোমার দাদা?' সমরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অমরকে মা প্রশ্ন করেন।

সমর নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন জবাব দেয় না মার প্রশ্নে।

'অমর ও দীপকের মুখে তোমার কথা আমি শুনেছি বাবা। ছুটি নিয়ে এসেছো বুঝি?' মা আবার প্রশ্ন করেন স্মিতভাবে।

এবার সমর নীরবে ঘাড় হেলিয়ে জানায় : 'হ্যাঁ।'

'তোমরাও যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে গেছো, এরাও তেমনি যুদ্ধ করছে। তোমরা বাইরে, এরা ঘরে।' বলে সস্নেহে মা অমর ও দীপকের দিকে তাকান।

মা আবার মৃদু হেসে বলেন : 'ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আজ আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে বাবা!'

অমর তার দাদার কঠিন স্তব্ধতায় ভিতরে ভিতরে নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিল। নিদারুণ লজ্জায় ও নিষ্ফল বেদনায় সে যেন একেবারে পাথরের মতই স্তব্ধ হয়ে গেছিল। সে ভেবে পাচ্ছিল না, মাকে কি ক'রে এই নিদারুণ লজ্জার হাত হতে পরিত্রাণ দেবে। সহসা একটা কথা মনে হওয়ায় ও পুলকিত হয়ে মার ডান হাতটা চেপে ধরে ব্যগ্র-ব্যাকুল স্বরে বললে : 'চলুন মা, মাসীর সঙ্গে দেখা করবেন না? চলুন!'

'চল বাবা!' অমরের আকর্ষণে পা বাড়ালেন ভিতরে যাওয়ার জন্য। দ্বারপ্রান্তে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে স্নিগ্ধস্বরে সমরকে লক্ষ্য করে বললেন : 'তোমার ছুটি ত এখনও আছে কয়দিন। আমার ওখানে একদিন যেও। তোমার

মুখে যুদ্ধের গল্প শুনবো। আমাদের বাঙালী মায়েদের কত গর্বের বস্তু তোমরা, আজ আমাদের ছেলেরা আবার সৈনিকের প্রতিজ্ঞা নিয়ে রণক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সোনার চাঁদ ছেলে সব!'

মার দেহটা দরজার সামনে অন্তর্হিত হলো। কিন্তু তাঁর শেষের কথাগুলো যেন তখনও সমরের দু'কান ভরে ঝঙ্কার তুলে দিয়েছে ঝম্ ঝম্ ক'রে নতুন বৃষ্টিধারার মত : সোনার চাঁদ ছেলে সব!

।। পাঁচ ।।

মাসীর ব্যবহারের মধ্যে কোথাও এতটুকু আবিলতা ছিল না। সানন্দ-চিত্তেই মাসী দীপকের মাকে গ্রহণ করেছিলেন। মা'র মৃদু সংযত কথাবার্তায় নীলাও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অমরের মুখে বার বার সে শুধু মার নামই শুনেছিল, কিন্তু আজ চোখের সামনে তাঁকে দেখে ও তাঁর সঙ্গে সামান্য কয়েকটি কথাবার্তা বলে সত্যিই সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবিমিশ্র শ্রদ্ধায় তার হৃদয় যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল আজ।

কিন্তু অমরের মনে শান্তি ছিল না।' মা'র প্রতি তার দাদার অহেতুক কঠিন অবজ্ঞা যেন তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত ক'রে ফেলছিল। ফেরার পথে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা সড়কের উপর দিয়ে মা ও দীপকের পাশাপাশি চলতে চলতে অমর বারবার সেই কথাটাই ভাবছিল। মাকে কেন দাদা অপমান করল? মানুষকে মানুষ কেন অশ্রদ্ধা করে? বিশেষ ক'রে যিনি সত্যিকারের ভক্তির পাত্র, তাঁকে অবমাননা করা মানে নিজেকেই ত ছোট করা!

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা সড়ক সোজা গিয়ে যেখানে মিশেছে তার একপাশে ধেনো জমি, অন্য পাশে জলাভূমি। আমন ধানে পাক ধরেছে।

ক্ষীণ একফালি চাঁদ আকাশের একপ্রান্তে জেগেছে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি তারা।

তিনজনেই নীরবে পথ চলছিল। মা মধ্যখানে, আগে দীপক, মার ঠিক পরেই অমর। সহসা মা-ই প্রশ্ন করলেন : 'অমর, কি ভাবছো বাবা?'

অমর চমকে উঠে : 'তেমন কিছু নয় মা!'

'পাগল ছেলে! মায়ের চোখেও ধুলো দিতে চাস রে? কিন্তু কেন এত বিষণ্ণ বাবা! ওরে ভুলে যাস কেন, এ যে মায়ের প্রাণ, এত সহজেই কি তাতে আঁচড় লাগে রে! আয় আমার পাশে আয় দেখি!' মা সস্নেহে হাত বাড়িয়ে অমরকে পাশে টেনে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। মৃদুস্বরে আবার বলতে শুরু করেন : 'মানুষের মন, বিশেষ ক'রে তোমাদের মত কচি ও কাঁচাদের মন বড় ভাবপ্রবণ! একটুতেই যেমন তরঙ্গ উঠে, তেমনি অল্পতেই শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু ভাব-বিলাস তোমাদের চলবে না বাবা! সমগ্র ভারতবাসী যে আজ তোমাদেরই মুখের দিকে চেয়ে আছে। তরুণ কিশোর। তোমরাই যে অনাগত স্বাধীনতার হবে পথ-প্রদর্শক! মুক্তি-সংগ্রামের তোমরাই যে ভাবী সৈনিক।

তোমাদের হাতের মশালের আলোতেই যে দেশের অন্ধকার দূর হবে।'

দূরে জলার ওপারে কোন গৃহস্থের প্রাঙ্গণে বোধহয় আগুন জ্বালা হয়েছে। লাল হয়ে উঠেছে সেদিকটা। জলার কালো জলে সেই আগুনের আলোর রক্ত আভা পড়েছে।

পথের দু পাশে ঝিঁঝিঁ পোকার অশান্ত কান্না।

'অজানা পথের যাত্রী তোমরা। সামান্য সাংসারিক মান-অভিমান, দ্বেষ-হিংসা তোমাদের জন্য নয়। তোমাদের থাকবে না কোন আসক্তি ও বিরক্তি। একটিমাত্র লক্ষ্য তোমাদের সামনে—আমার দেশ। ধনে-ধান্যে-পুষ্পে ভরা এই আমার দেশ। এর উন্নতি চাই।'

সহসা অমর পথিমধ্যেই নিচু হয়ে মার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নেয়।

'সব কটিই আমার পাগল ছেলে। আমার পিনাকী, পিনুও এমনি অভিমানী ছিল। সেও ছিল এই দেশের ছেলে, তোমাদেরই মত'—বাকী কথাগুলো আর উচ্চারিত হলো না। অশ্রুবাষ্পে কণ্ঠের মধ্যে কেঁপে কেঁপে থেমে গেল। মাতৃ-হৃদয় মন্থন ক'রে ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে।

মৃদু জ্যোৎস্নালোকিত আকাশপথে একটা উল্কা ছুটে যায়, সরু একটা আলোর রেখা টেনে!

সকলে দীপকের বাড়ীতে এসে পৌঁছায়। সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকার, কেবল উত্তরের ঘরের ভেজান কপাটের ফাঁকে ঈষৎ একটু আলোর আভাস।

অন্ধকারে দাওয়ায় স্তূপীকৃত ছায়ার মত নিশ্চুপ হয়ে বসে আছেন দীপকের অন্ধ পিতা দ্বিজনাথ রুদ্র! তারই কিছু দূরে আঙিনার উপর দাঁড়িয়ে কে একজন ছায়ার মত।...

ওদের পায়ের শব্দে অন্ধ দ্বিজনাথ সচকিত হয়ে উঠেন: 'কে? জাহ্নবী?'

'হ্যাঁ, কে দাঁড়িয়ে গো?'

'আমি বলাই মা!'

'বলাই হাড়ী। খাঁড়ির ওপারে হাড়ীপাড়ায় থাকে ও।'

বলাই এগিয়ে এসে মার পায়ের সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণিপাত জানায়।

'বেঁচে থাকো বাবা, কি হয়েছে বলাই, এই অসময়ে? এত রাত্রে?'

'মাগো, দীনুকে বুঝি আর বাঁচাতে পারলাম না, আজ তিন দিন ধুম জ্বর। জ্বরে একেবারে বেহুঁস হয়ে আছে, সেই সকাল হতে একেবারে 'রা' করছে না।'

'বোধহয় ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে। ডাক্তার দেখেছে রে?'

'না মা, ডাক্তারকে তিন তিনবার ডাকতে এসেও পাইনি।'

'ওঃ। দীপক, যাও ত বাবা চট ক'রে একবার শম্ভু ডাক্তারের ওখানে; তাকে বলবি এখুনি একবার আসতে, আমি ডাকছি।'

দীপক ছুটে বের হয়ে গেল।

বলাইয়ের দিকে ফিরে মা বললেন—'বোস বলাই, ভয় কি! অসুখ-বিসুখ মানুষ মাত্রেরই হয়। শম্ভু ডাক্তারকে না পাই সরকারী ডাক্তারকে নিয়ে এক্ষুনি আমি তোমার সঙ্গে যাবো। কিন্তু তোমার আগেই আমাকে একটা সংবাদ দেওয়া

উচিত ছিল বাবা।'

'কাকে দিয়েই বা সংবাদ পাঠাই মা! দীনুর মাও ত আজ দশ দিন শয্যাশায়ী। ভাবলাম দুঃখীর ঘরের জ্বরজারি, দু' একদিনেই বুঝি ভাল হয়ে যাবে।'

অমর তখনও চুপটি ক'রে একটি পাশে দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে মা বললেন : 'অমর, রাত্রি হলো, এবার তুমি বাড়ী ফিরে যাও বাবা!'

'আমিও আপনার সঙ্গে যাবো মা বলাইয়ের ওখানে।'

'না না বাবা, বলাইদের ওখানে আজ আর যায় না, রাত হয়ে গেছে। তা ছাড়া বলাইয়ের ওখানে আমার কতক্ষণ দেরী হয়, তাই বা কি জানি! আজ বাড়ী যাও, আর একদিন তখন যেও!'

মার প্রতিটি কথাই এমনি। অতি বড় কঠিন আদেশও মার কণ্ঠে এমনি ক'রে সহজ সুরে প্রকাশ পায় বলেই হয়ত তাঁকে লঙ্ঘন করা কারও সাধ্য হয় না। অমরও মুহূর্তে বুঝে নিল, এ আদেশ লঙ্ঘন করা চলবে না।

মার পায়ের ধুলো নিয়ে নিঃশব্দে অমর বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল।

'বলাই, আজ তোর খাওয়া হয়েছে ত বাবা?' মা শুধালেন : 'অসুখ-বিসুখের বাড়ী, হয়ত একটি দানাও এখন পর্যন্ত তোর পেটে পড়েনি।'

'ক্ষুধা নেই মা! সকালে চারটি পান্তাভাত খেয়েছিলাম মা জননী।'

'মুড়ি আছে ঘরে, এনে দিচ্ছি, কাপড়ে বেঁধে নে।'

মা ছোট ধামায় ক'রে কিছু মুড়ি এনে বলাইয়ের কাপড়ের খুঁটে ঢেলে দিলেন।

উঠানে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

'মা, ডাক্তারদা এসেছেন।' দীপকের গলা।

দীপকের আগে আগেই শম্ভু ডাক্তার সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে তার ডাক্তারী ঔষধ-পত্রের কালো ব্যাগটি।

'কি হুকুম মা! আমায় ডেকেছেন?'

'কে? ডাক্তার! এসো বাবা! বলাইয়ের ছেলেটার নাকি আজ তিনদিন থেকে জ্বর। সকাল হতেই বেহুঁশ!......এখুনি একবার আমাদের সঙ্গে হাড়ীপাড়ায় যেতে হবে। আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি......একটু অপেক্ষা করো।'

'আমি প্রস্তুত মা।'

মা কয়েকটি আবশ্যকীয় জিনিসপত্র আনবার জন্য ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

'বোস ডাক্তার, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' দ্বিজনাথ বললেন।

'আজকাল আপনার হাঁটুর ব্যথাটা কেমন আছে কাকাবাবু?'

'ভালই আছে ডাক্তার, ভালই আছে।......জীর্ণ শরীর অথর্ব, অন্ধ আঁখি। ওপারে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে বসে আছি। অসুখকে আজকাল আর অসুখ বলেই মনে করি না ডাক্তার! অসুখ হওয়াটাও একটা মানসিক বিকার। কেবল ভাবি বেঁচেই যদি রইলাম, তবে অন্ধ হয়ে রইলাম কেন? তোমাদের কর্মতৎপর

জীবনের কথা বসে বসে শুনি আর নিজের অকর্মণ্যতার ব্যর্থতায় নিজেকে নিজে অভিশাপ দিই। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মত বসে আছি কবে কুরুকুল ধ্বংস হবে তারই দিন গুণে গুণে!'……শেষের দিকে দ্বিজনাথের কণ্ঠস্বর বুঝি অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হয়ে আসে।

মা এসে দাওয়ায় দাঁড়ালেন। সামান্য একটি খদ্দরের চাদর গায়ের উপরে, হাতে একটি পুঁটুলি! 'চল ডাক্তার, আমি প্রস্তুত।'

দীপক এগিয়ে আসে: 'আমিও তোমার সঙ্গে যাবো মা।'

'না দীপক। তোমার পরীক্ষা এসে গেছে. আজ হিস্ট্রীটা শেষ ক'রে রাখ, আর সমীর ফিরে এলে সকলে ভাত বেড়ে নিয়ে খেয়ো।'

দ্বিজনাথবাবুর দিকে এগিয়ে মৃদুস্বরে জাহ্নবী দেবী বললেন: 'আমি তাহলে যাই।'

'এসো!……'

'চল ডাক্তার।' জাহ্নবী দেবী, ডাক্তার ও বলাই গৃহ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

।। ছয় ।।

খাঁড়ীতে সবে তখন জোয়ারের জল ঢুকতে শুরু করেছে। পাড়ে অনেকখানি পর্যন্ত নরম কাদা, ভেতরে জল। ছোট একখানা ছৈ-হীন নৌকা।

বলাই গিয়ে দাঁড় নিয়ে বসল। মা ও ডাক্তার পাশাপাশি দুখানা সরু তক্তার উপরে উপবেশন করলেন। বলাই নৌকা ছেড়ে দিল।

'পৌষ মাস শেষ হতে চলল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।' ডাক্তার গায়ের কোটের বোতামগুলো আঁটতে আঁটতে বললে।

'হ্যাঁ, এবারে শীতটা একটু বেশীই যেন পড়েছে।' মা জবাব দেন।

দাঁড় টানার ছল-ছলাৎ শব্দ। চাঁদ ডুবে গেছে। ওপারের বাবলা গাছগুলো অন্ধকারে যেন একটা ধূসর পর্দার মত মনে হয়। আকাশ ভরা তারা। চারপাশে তখনও একটা স্তব্ধতা। নিঃসীম আকাশের তলে অখণ্ড স্তব্ধতা যেন মনের উপরে চেপে বসে।

'কেমন প্র্যাক্‌টিস্‌ চলছে ডাক্তার?' মা প্রশ্ন করেন।

'রোগের ত অভাব নেই মা। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে রোগ-ব্যাধি ত লেগেই আছে। কিন্তু যুদ্ধের আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, ঔষধপত্র কিছুই প্রায় পাওয়া যায় না। সাধারণ লোকের পক্ষে এখন রোগের চিকিৎসা করাই ত দায় হয়ে উঠেছে। ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ কুইনাইন-ই নেই। মিলিটারীর কল্যাণে সব উড়ে যাচ্ছে। একদল লোক আগে থাকতে 'কুইনাইন' স্টক্‌ ক'রে রেখেছিল, আজ তারা চোরাবাজারে অগ্নিমূল্যে সেই সব কুইনাইন বেচে পকেট ভর্তি করছে। চোরাবাজার! সর্বত্র চোরাবাজারেরই এখন জয়জয়কার মা! মানুষের জীবনই এখন চলছে চোরাবাজারের অন্ধকারময়

গলিপথে। সকলেই দেখছে কিসে দু' পয়সা আসে।'

মা হেসে ফেলেন: 'রাগ করো না ডাক্তার। মানুষের ধর্ম'ই এই। কেবল স্বার্থ' আর স্বার্থ'! এ তো তোমার রাশিয়া নয় যে, equal distribution হবে। একে দেশটা পরাধীন, সর্বদা শাসক-সম্প্রদায়ের শোষণনীতির মধ্য দিয়ে কোনমতে চলতে হচ্ছে, তার উপর বেধেছে এই বিশ্বযুদ্ধ। অত্যাচারে লোক মরছেই কুকুর-বিড়ালের মত, তার সঙ্গে উপসর্গ এসে জুটেছে নিদারুণ খাদ্য-সংকট! ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসছে দেশের সামনে। অথচ টাকা-পয়সাওয়ালা একদল লোক এই দুঃসময়ে উঠে-পড়ে লেগেছে দেশের সব খাদ্যশস্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনে কিনে গুদামজাত করতে। সেদিন সমীর বলছিল, কুণ্ডু মশাই নাকি ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ হাজার বস্তা চাল তাঁর গুদামে জড়ো করেছেন।'

'আমার কি মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় জানেন মা, ঐ সব লোকদের গুদাম লুঠ ক'রে সব ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিই। তারপর তাদের সুবর্ণ প্রাসাদে লাগিয়ে দিই আগুন।'

মা হেসে ফেললেন: 'সংক্রামক ব্যাধির মতই আজ এই হীন ধনস্পৃহা সমগ্র ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এদের রোধ করা তোমার আমার মত দু' একজনের কর্ম' ত নয় ডাক্তার! যতদিন না দেশের সমগ্র গণশক্তি জেগে উঠে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়, ততদিন এ অত্যাচার চলবেই! মিথ্যে চীৎকার ক'রে কয়জন গলা ফাটালে বা দু' চার জন জেলে গেলে শুধু শক্তিক্ষয়ই হবে। বেশী দূর যেতে হবে না ডাক্তার, দেশের সন্ত্রাসবাদীদের কথাই ভেবে দেখো, 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন,' 'কাকোড়ী ষড়যন্ত্র', 'মীরাট ষড়যন্ত্র' ইত্যাদির কথা। কি লাভ হয়েছে তাতে? লাভের মধ্যে ত দেখতে পাই সোনার চাঁদ কতকগুলো ছেলে মিথ্যে ফাঁসীকাঠে বা আজীবন কারাবাসে নষ্ট হয়ে গেল। অথচ এদের দিয়ে দেশের কত কাজই না হতে পারত। দেশে দেশে, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলতে হবে বিপ্লবী সংঘ এবং সময় বুঝে একই সঙ্গে সকলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ওদের বিরুদ্ধে মরণপণে এবং তাই যেদিন সম্ভব হবে, সেদিন দেখবে ওদের সকল শক্তি ধুলোর মত গুঁড়িয়ে যাবে।

'১৮৫৭র সেপাই বিদ্রোহের প্রাক্কালে নানা সাহেব তাঁতিয়া টোপী সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বিপ্লবের মন্ত্র বিলিয়ে বেড়িয়েছিলেন গণ-বিপ্লব আনতেই, কিন্তু তখনকার সরকারী প্রসাদতুষ্ট কতকগুলো হিন্দু কর্মচারী ও দেশীয় কয়েকজন রাজা সে প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দিল।'

উত্তেজনায় মার কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে। মা বলতে থাকেন: 'কূটচক্রী এই বৃটিশ রাজতন্ত্র। ভারতবাসীর মর্মমূলে এরা মৃত্যু-আঘাত হেনেছে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মধ্য দিয়ে। ওরা বুঝেছিল ভারতের এই অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতে পারে, তাহলে এদের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা এরাই গুঁড়ো ক'রে দেবে নিজ হাতে স্বার্থের ছোরাছুরি চালিয়ে। আমি

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অদূরে ভবিষ্যতে এই সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির বিষে জর্জরিত হয়ে যাবে সারা ভারতভূমি। আগুন জ্বলে উঠবে। এ বড় সাংঘাতিক অস্ত্র। শুধু তাই নয়, ভারতে এই যে বহুসংখ্যক অন্ত্যজ জাতি আছে, এদেরও আমরা গোঁড়ামী ও সমাজ-ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে এতদিন আমাদের স্পর্শে বাঁচিয়ে দূরে সরিয়ে রাখলাম, এরও পরিণাম ভয়ংকর। দেশের নেতারা, দেশের সমাজের শীর্ষস্থানীয়েরা ভুলে যান যে আমরা পরাধীন। মানুষের জাত মানুষের চাইতে বড় নয়। তারা ভুলে যান যে একবার দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে, তখন সেই স্বাধীন রাষ্ট্রের সংস্কার করবার প্রচুর অবকাশ তাঁরা পাবেন! এতে ক'রে আমরাই দিনের পর দিন দুর্বল হচ্ছি, আর বিপক্ষ দল ক্রমে বলীয়ান হয়ে উঠছে। ভারতের স্বাধীনতার দিন আরো পিছিয়ে যাচ্ছে।'

নৌকা এসে পাড়ে লাগল। বলাই বললে : 'মা, আমরা এসে গেছি।'

সরু সংকীর্ণ পথ। অন্ধকার। দুপাশে রাংচিতা ও ফণীমনসার কাঁটা ঝোপ। অন্ধকারে আগুনের ফুলকীর মত ঝোপের গায়ে জোনাকির ইতস্তত আলোর নিশানা। তিনজন নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করতে থাকে।

পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে হাড়ীপাড়ায়। কতকগুলি ঘন-সন্নিবেশিত ছাপরা ও খড়ে ছাওয়া ঘর, ঘর না বলে খুপড়ী বলাই ভাল। অন্ধকারে ঘরগুলো সব যেন একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে আছে ব'লে মনে হয়। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ সেখানকার বাতাসকে ভারী ক'রে তুলেছে।

সকলে এসে একটা চালার সামনে দাঁড়াল। ঘরটার দরজায় একটা ময়লা শতচ্ছিন্ন দুর্গন্ধময় চট ঝুলছে। চটের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় একটা অস্পষ্ট আলোর স্বল্পাভাস। ভিতরে একটা কেরোসিনের কুপী জ্বলছে।

বলাই চটের পর্দাটা তুলে ধরলে : 'আসুন মা জননী!'

নিঃসংকোচ আহ্বান, তাতে কুণ্ঠার লেশমাত্র নেই, কেন না ইতিপূর্বে আরো অনেকবার মা এদের ঘরে এসে এদের সংকোচ মুছে দিয়েছেন। মাকে এরা নিজেদের একজন বলেই মনে করে।

অপরিসর নোংরা ছোট একটা ঘর। কাঁচা মাটির ঠাণ্ডা মেঝে, বাঁশের বাকারীর বেড়া, তাতে গোময় লিপ্ত। এক কোণে কতকগুলি হাঁড়ি-কলসী স্তূপ করা। আর এক কোণে শতচ্ছিন্ন ময়লা কাঁথার উপরে শুয়ে বলাইয়ের স্ত্রী ও তার পাশে বলাইয়ের ছেলে দীনু। বছর পনের বয়স হবে। অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি!

দীনুর ঠিক মাথার কাছে বসে মাস্টার সুজিতবাবু। মাথায় জলপটি দিয়ে হাওয়া করছেন।

ওদের সকলকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সুজিতবাবু মুখ তুললেন : 'মা এসেছেন?'

'মাস্টার। কখন এলে?' মা শুধান।

'এই কিছুক্ষণ মা, বলাই যখন আপনার ওখানে যাচ্ছে, পথে ওর সঙ্গে আমার দেখা। টেম্পারেচার নিয়েছিলাম, ১০৫য়ের উপরে জ্বর, অজ্ঞান হয়ে আছে।'

সুজিতবাবু জবাব দেন।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে রোগীকে পরীক্ষা করলেন। মার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'মা, আমার যতদূর মনে হচ্ছে ম্যালিগনেণ্ট্ ম্যালেরিয়া, এখানে ফেলে রাখলে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা ত করা যাবে না। একে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'তাই যদি মনে করো তবে আর দেরী ক'রে লাভ কি ডাক্তার!' মা মৃদুস্বরে জবাব দেন।

'না মা, দীনুকে আমার হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেবো না। তাহলে ও আর বাঁচবে না। সেখানে ওরা যত্ন নেয় না। আমার ঐ একটিমাত্র ছেলে মা জননী!'

'তোমার কোন ভয় নেই বলাই, আমি নিজে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে বলে দেবো, তাছাড়া সে আমাদের ডাক্তারেরও বন্ধু। সেও বলে দেবে। ডাক্তার যখন বলছে, এখানে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হবে না, তখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভাল।'

'জননী গো, সে হাসপাতালে শুনেছি ওরা জ্যান্ত মানুষ মেরে ফেলে,' বলাইয়ের স্ত্রী বলে।

শেষ পর্যন্ত মা বুঝিয়ে বলায়, দীনুকে স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করাই শাব্যস্ত হয়। সেই রাত্রেই দীনুকে হাসপাতালে নিয়ে গেল ওরা। সব ব্যবস্থা ক'রে মা যখন গৃহে ফিরে এলেন, রাত্রি শেষ হতে আর বড় বেশী দেরী নেই। পূর্বাশার প্রান্তে প্রথম আলোর আভাস। শুকতারাটা তখনো নেভেনি।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু দীনুকে বাঁচান গেল না। ঐ শীতের ঠাণ্ডায় তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করায় ঠাণ্ডা লেগে বুকে নিমুনিয়া ধরে গেল। চার দিনের দিন দীনু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

মৃত্যুর সময় মা হাসপাতালে দীনুর শয্যাপার্শ্বেই বসেছিলেন। বলাই মার পায়ের উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল : 'মাগো জননী, আমার কি হলো।'

মার চোখেও বুঝি জল। তিনি ধীরপদে উঠে বলাইয়ের পাশে বসে তার ভুলুণ্ঠিত মস্তকের উপরে সস্নেহে একখানা হাত রেখে গভীরভাবে বললেন, 'বলাই, ওঠ বাবা, কাঁদিস্ নে। এ যে ভগবানের মার।'

কিন্তু সদ্য-সন্তানহারা হতভাগ্য পিতার অশ্রু কিছুতেই যেন বাধা মানতে চায় না। বলাই ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

শহরের বুকে তখন সন্ধ্যার আসন্ন আঁধার নেমে আসছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের আলোগুলো সবে একটা দুটো করে জ্বলতে শুরু করেছে। হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের মড়া কাটার ঘরের সামনে একটা কুকুর করুণ সুরে কেঁদে উঠল।

সৎকারের সব ব্যবস্থা ক'রে মা প্রায় রাত্রি এগারোটায় বাড়ী ফিরে এলেন।

অন্ধ দ্বিজনাথ একইভাবে একটা ছিন্ন ধূসর রঙের গরম র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে দাওয়ায় বসেছিলেন, পদশব্দে উৎকর্ণ হয়ে উঠেন ঃ 'কে? জাহ্নবী এলে!'

মৃদুস্বরে মা জবাব দেন : 'হ্যাঁ।'

'পারলে না ধরে রাখতে ছেলেটাকে, ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল !'

জাহ্নবী দেবী দ্বিজনাথের পায়ের সামনে এসে বসলেন। বড় শ্রান্ত আজ তিনি। দীনুর মৃত্যু-শোকটা যেন তাঁর পিনাকীর মৃত্যু-শোককেও ছাপিয়ে গেছে।

দ্বিজনাথ তাঁর ডান হাতখানি বাড়িয়ে জাহ্নবী দেবীর পিঠের উপর রাখলেন : 'দুঃখ করো না জাহ্নবী ; চোখের জল ফেলো না। তোমার আক্ষেপ কোথায় তা আমি জানি, উপযুক্ত বাসস্থান, উপযুক্ত আহার, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসা হলে হয়ত দীনু বাঁচতো। কিন্তু ভুলে যেও না, তোমার ঐ অতগুলি 'উপযুক্ত'র উপসর্গ এড়াতে তুমি পারবে না। তার কারণ, অতগুলো উপসর্গকে যদি মূলে খোঁজ করতে চাও তবে দেখবে, সবেরই মূল অধিকার ক'রে আছে আমাদের পৌণে দুই শ' বৎসরের পরাধীনতা। ভারতবাসীর জীবনের আজকে সেইটাই বড় ও একমাত্র উপসর্গ।'

'এ আমার দুঃখ নয়। এ আমার নিরুপায়তার অনুশোচনা। আর কতকাল এইভাবে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে বলতে পারো ? এই যে মৃত্যু-সাগরের এপারে দাঁড়িয়ে আমরা দগ্ধ হচ্ছি, কবে ওপারে পেঁছাবো ?'

'হবে জাহ্নবী ! হবে। নিরাশ হয়ো না, দিন বুঝি আগত ঐ ! অন্ধ চোখের অন্ধ দৃষ্টির সামনে মাঝে মাঝে খুলে যায় আমার এক অপূর্ব জগৎ।' বঙ্কিম গেয়েছেন—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

'সেই মন্দিরের ভিত্ গড়ে উঠছে ! এই মৃত্যু, এই প্রাণদান এ নিষ্ফল হবার নয়। মাঝে মাঝে কি আমার ইচ্ছা হয় জান জাহ্নবী, অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের মত বৃটিশের এই লৌহ-সাম্রাজ্যবাদটাকে লৌহ-ভীমের মত বক্ষে চেপে ধরে নিষ্পেষণে গুঁড়ো ক'রে দিই !' উত্তেজনায় অন্ধ দ্বিজনাথ হাঁপাতে থাকেন।

দীপক কখন একসময় বুঝি ঘুম ভেঙে পাশে এসে দাঁড়ায়।

চকিত হয়ে উঠেন দ্বিজনাথ ; পায়ের শব্দ একবার শুনলে আর তিনি ভোলেন না। বিধাতা তাঁর চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছেন বলেই হয়ত শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁর এত সজাগ হয়ে উঠেছে তাঁরই আশীর্বাদে। এমনি ক'রেই বুঝি এক হাতে যাকে তিনি বঞ্চিত করেন, অন্য হাতে তুলে দেন আশীর্বাদ। মৃদুস্বরে শুধান : 'কে দীপ্ !' দীপককে তিনি 'দীপ্' বলেই ডাকেন।

'হ্যাঁ বাবা, আমি !'—মৃদুস্বরে দীপক সাড়া দেয়।

'এসো, আমার পাশে বোস !' পুত্রের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে দ্বিজনাথ বলেন : 'অন্ধকারের দীপশিখা, তাই তোমার নাম দিয়েছি দীপক ! আলো। আলো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি

হউক জয় ।' তোরা সেই দুয়ার-ভাঙা জ্যোতির্ময়ের অগ্রদূত ! তোমার মা কাঁদছেন বাবা ! এ তোমার মায়ের চোখের জল নয়, শত শত নিপীড়িত জননীর তপ্ত-অশ্রু ! এবং ঐ অশ্রুমুখী জননীদের মধ্যেই মিশে আছেন আমাদের অশ্রুমুখী দেশ মাতৃকা ! তাঁর চোখের জল মোছাতে হবে ।'

'আশীর্বাদ করুন বাবা !' দীপক পিতার পায়ের ধুলো নেয় ।

'চিরদিনই ত আমি তোমাদের আশীর্বাদ করি বাবা ! চিরদিনই করি । অন্ধ, দেখতে পেলাম না, আমার পিনাকী হাসতে হাসতে যেদিন ফাঁসীর মঞ্চে জীবন দিয়ে গেল, সেদিনও সেইখানে বসে বসেই তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম আমার আশীর্বাদ ! অন্ধ পিতার শেষ আশীর্বাদ ! মৃত্যু তোমার সার্থক হোক পিনু ! নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ । সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ! তার ত বিনাশ নেই । সে যে অক্ষয় অব্যয়, তার যাত্রা লোকে লোকে । জীর্ণ বসন তুমি ত্যাগ করলে মাত্র ! অক্ষয় হয়ে রইলো তোমার সত্যিকারের তুমি ; যা চিরসুন্দর, মৃত্যুহীন জ্যোতির্ময়, তার ত' শেষ নেই । মৃত্যু যে তার কাছে চির পরাজিত ! অবনত হয়ে চিরদিন মৃত্যু বারবার তার কাছে নতি স্বীকার ক'রে নিয়েছে । পিনু ! আমার পিনাকী !' অন্ধ পিতার বুক ভেঙে নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে ।

দীপক অন্ধ পিতার অন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে । পিতাকে তার এতখানি বিচলিত হতে ইতিপূর্বে বড় একটা কোন দিনও দেখেনি ।

।। সাত ।।

১৯৪২ সাল । ২৬শে জানুয়ারী । রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো । প্রবেশিকা পরীক্ষা এসে গেছে, রাত জেগে অমর আজকাল পড়াশুনা করে । গতকালও অনেক রাত্রে সে শুয়েছে পড়া শেষ করে ।

ঘুমটা ভেঙে গেল । অস্পষ্ট একটা গানের মৃদু রেশ তার প্রথম জাগা সত্তার দুয়ারে এসে সহসা যেন ঘা দিয়েছে । যেন কোন মহাসিন্ধুর ওপার হতে ভেসে আসে কি মহাসঙ্গীত ! মিলিত কণ্ঠের সে উদাত্ত সুর দূর-দূরান্ত হ'তে ভেসে এসে যেন তার সদ্য ঘুমভাঙা মনের দুয়ারে আঘাত হানল । ভাল করে তখনও ঘুমের ঘোরটা কাটে নি ।

আধো জাগা, আধো ঘুম ।—কাদের কণ্ঠস্বর ।—চকিতে ওর মনে পড়ল—আজ ২৬শে জানুয়ারী । স্বাধীনতা দিবস !—পরাধীন জাতির স্বাধীনতার ব্রত উদ্‌যাপন !...স্বাধীনতা দিবস ! কাল রাত্রে পড়া শেষ হয়ে গেলে ক্যালেণ্ডারের পাতায় সে আগামী কালের ২৬শে তারিখটার গায়ে লাল পেন্সিল বারবার বুলিয়েছিল । স্বাধীনতা দিবস । ২৬শে জানুয়ারী । মনে পড়ল । প্রভাত-ফেরীর দল ! তারাই গান গাইছে ; গানের ঐক্যতান ক্রমে এগিয়ে আসে—কাছে, আরো কাছে । জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে ! ভারত ভাগ্য-বিধাতা ।

অমর ধড়ফড় ক'রে শয্যা হতে উঠে পড়ে । জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে । সব সে গত সন্ধ্যায়ই ঠিক ক'রে রেখেছে । স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতীক

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত সেই জাতীয় পতাকা। অমর তাড়াতাড়ি শয্যা হতে উঠে বাইরে এসে বারান্দায় রক্ষিত জলের বালতী হতে চোখেমুখে খানিকটা ঠাণ্ডা জল দিল, এবং একপ্রকার ছুটেই ছাদের উপরে উঠে গেল। মস্ত একটা বাঁশ গত সন্ধ্যায়ই সে ছাদের উপরে ঠিক ক'রে যোগাড় করে রেখে দিয়েছে।

পূর্বাকাশে রক্তিম আভাস!—২৬শে জানুয়ারী নবোদিত সূর্য।

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাটা বাঁশের মাথায় বেঁধে অমর বাঁশটাকে উঁচু ক'রে তুলল, প্রাচীরের সঙ্গে বেঁধে দেবার জন্য।

সহসা এমন সময় প্রভাত-ফেরীর দল হতে চীৎকার উঠলো: 'বন্দেমাতরম্!'

বুকের ভিতর হতে যেন সহসা অশান্ত সপ্তসমুদ্র গর্জন ক'রে উঠে; বন্দেমাতরম্। অমর কণ্ঠ খুলে চীৎকার ক'রে উঠে: 'বন্দেমাতরম্'! প্রতিধ্বনি দিক হতে দিগন্তে ছড়িয়ে যায়: বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্!!

প্রভাত-ফেরীর দল মুখ তুলে অমরদের ছাদের দিকে চেয়ে সহসা সহস্র-মিলিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠে: 'বন্দেমাতরম্'।

'মহাত্মা গান্ধী কী জয়!'—

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!…

'বন্দেমাতরম্!'—

অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ ঘোর রবে এসে বালুবেলার উপরে যেন আকুল আবেগে আছড়ে পড়ল!

নীরেনবাবু নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাচ্ছিলেন। সহসা তাঁর ঘুমটা ভেঙে গেল। আকাশ-বাতাস রঞ্জিত হচ্ছে সেই মন্ত্রোচ্চারণে: 'বন্দেমাতরম্'! ধড়ফড় ক'রে নীরেনবাবু শয্যার উপরে উঠে বসলেন। কে যেন তাঁর এতদিনের দুরন্ত গোলামীর কণ্ঠটা সজোরে টিপে ধরেছে। দম আটকে আসছে। শ্বাস নিতে পারছেন না। সহসা এমন সময় অমরের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এলো, যেন বজ্রনিনাদ: 'বন্দেমাতরম্'। কে যেন তাঁর বুকে একটা বুলেট চালিয়ে দিয়েছে। শুধু অমরের একটি কণ্ঠস্বরই নয়, যেন শত শত জনগণের কণ্ঠ ভেদ ক'রে অগ্নিমন্ত্রের বাণী উচ্চারিত হলো: বন্দেমাতরম্।

নীলা ঘরের মধ্যে আলোয়ান জড়িয়ে চেয়ারের উপরে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিল, সেও চমকে উঠে শুনলো সেই ডাক: 'বন্দেমাতরম্'! পারলে না আর বসে থাকতে। উঠে পড়ল সে চেয়ার ছেড়ে, দ্রুতপদে খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ছেলে বুড়ো, স্ত্রী, যুবক, যুবতী—সে দলে কেউ বাদ যায়নি। আগে আগে চলেছেন অমরের মাস্টার মশাই সুজিতবাবু, তাঁর পাশে মা, দীপক ও সমীর। মাস্টার মশাই ও সমীরের হাতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। ও মুগ্ধ হয়ে গেল, অবাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে রইলো। মেঘে ছাওয়া আকাশ বিদীর্ণ ক'রে যেন সহস্র-কিরণ অংশুমালী ঝলকে উঠেছে হঠাৎ আলোর উচ্ছ্বাসে।

ক্যাপ্টেন সমরের ঘুম ভেঙে গেছিল। স্লিপিং গাউনটার বোতাম আঁটতে আঁটতে সেও কখন এক সময় নীলার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাসী ওদের জন্য সকালের চা ও জলখাবার তৈরী করছিলেন, তিনিও সব ফেলে রেখে দাঁড়িয়েছেন ওদের পিছনে এসে।

আবার আকাশে-বাতাসে ধ্বনি উঠল, 'বন্দেমাতরম্'। ছাদের উপরে অমরের গলা শোনা গেল, প্রত্যুত্তর : 'বন্দেমাতরম্ !'…

নীরেনবাবুর আহারে এতটুকু রুচিও সেদিন ছিল না, সুপাচ্য সুপেয় খাদ্যবস্তু যেন তাঁর গলা দিয়ে নামতে চায় না। অমর প্রসেশনের সঙ্গে সেই সকালে বের হয়ে গেছে বাড়ী থেকে। সমস্ত বাড়ীটা যেন এক অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় থম্ থম্ করছে।

নীরেনবাবু একটি কথাও বলেননি, তাঁর চোখের সামনে দিয়েই অমর ছুটে গিয়ে প্রসেশনের দলে মিশেছিল ! খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু তিনি তাকিয়ে দেখেছিলেন। অমরকে বাধা তিনি দেননি। তাঁর কণ্ঠ যেন বোবা হয়ে গেছিল। কোর্টে একটা জরুরী মোকদ্দমা আছে। আজ তার রায় দিতে হবে। আজ প্রায় বছর চারেক থেকে তিনি 'রক্তচাপে' ভুগছেন, নিয়মিত আহার, ঔষধ ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থেকে মাস ছয়েক তিনি ভালই ছিলেন, কিন্তু সকাল হতেই আজ আবার মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছেন। কোনমতে চারটি মুখে গুঁজে কাছারীতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। বাইরের রাস্তায় সাইকেলের ঘণ্টি শোনা গেল, ক্রিং ক্রিং…!

বাইরে সমরের গলা শোনা গেল, দারোগা সাহেব যে ! কি সংবাদ ? গুড মর্ণিং ! নীরেনবাবু বুকের মধ্যে যেন সহসা একটা ধাক্কা খেলেন।

তিনি আর অগ্রসর হতে পারলেন না, ঘরের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। থানার দারোগা ইউসুফের গলা শোনা গেল ; 'গুড মর্ণিং, মিঃ চক্রবর্তী বাড়ী আছেন ? আপনার পিতা !'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো ? বাবা এখুনি বের হবেন।'

'তাঁর সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা আছে।'

মাথাটার মধ্যে কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে, কিন্তু তবু নীরেনবাবু খোলা দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

ঘরে ঢুকেই ইউসুফ দাঁড়িয়ে উঠল : 'নমস্কার স্যার !'

'কি খবর দারোগা সাহেব ?'

'আপনি ত' সবই জানেন স্যার ! ময়দানে আজ স্বাধীনতা দিবসের মিটিং হচ্ছে, স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জেলা থেকে এখানে এসেছেন, তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত আছেন। আপনার ছোট ছেলে অমরকেও সেই দলে দেখে এলাম। প্রমোশনের জন্য আপনার নাম স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পাঠিয়েছেন ; কিন্তু…' বাকী কথাগুলো ইউসুফ আর বললে না, নীরবে নীরেনবাবুর মুখের দিকে শুধু তাকাল। ইউসুফের গোল গোল রাঙা চোখ দুটো চক্ চক্ করছে।

'অমর ছেলেমানুষ, কিন্তু আপনি ত তার পিতা !'…

'আচ্ছা আপনি যান, দেখি আমি কি করতে পারি।'

'থ্যাংক ইউ !'…ইউসুফ ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

নীরেনবাবু নিস্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ স্থাণুর মত সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুকের মধ্যে যেন তাঁর আগুন জ্বলছে! তাঁর অমর! স্বপ্নের অমর!…কি অসীম স্নেহই না তাঁর অমরের প্রতি! একদিকে তাঁর এতদিনের গোলামীর ইমারৎ, অন্যদিকে তাঁর বড় আদরের মাতৃহারা সন্তান অমর। একদিকে তাঁর গোলামীর কুসংস্কার, অন্যদিকে পিতার বুকভরা স্নেহ। সংস্কার ও স্নেহে সংঘর্ষ।

সহসা সমরের ডাকে নীরেনবাবু চমকে উঠেন ঃ 'বাবা!'

'এ্যাঁ!'

'অমরকে কিছুদিন এখান হতে সরিয়ে দিলে হয় না? এখন ত তার স্কুল বন্ধ। পরীক্ষাও সেই মার্চ মাসে। কলকাতায় পিসিমার কাছে এ কয় মাস গিয়ে থাকুক। সেখানে রমেন আছে, সেও এবার ম্যাট্রিক দেবে, সেখানেই পড়াশুনা করবে, তারপর পরীক্ষার সময় মার্চ মাসে এখানে আবার ফিরে আসবে। আমারও ত আর ৪।৫ দিনের মধ্যে ছুটি শেষ হবে, আমার সঙ্গেই যাবে।'

'দেখি আমি ভেবে, তোমরা কেউ তাকে কিছু বলো না, যা বলবার আমিই তাকে বলবো।' নীরেনবাবু সাইকেল নিয়ে কাছারীর দিকে বের হলেন। কত রকমের এলোমেলো চিন্তাই যে তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। মাথার মধ্যে একটা চাকা ঘর ঘর শব্দে ঘুরছে আর ঘুরছে। বেলা তখন দশটা কি সাড়ে দশটা হবে, হাসপাতালের সামনে ময়দানে লোক যেন গিস্ গিস্ করছে।

দূরাগত সমুদ্র গর্জনের মত একটা কলগুঞ্জন। নীরেনবাবু সাইকেল চালিয়ে অগ্রসর হন।

মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে খদ্দরের ধুতী-চাদর পরা, মাথায় গান্ধীটুপী কে একজন বক্তা বক্তৃতা দিচ্ছেন; কয়েকটি যুবক ও কিশোর মঞ্চের চারপাশে দাঁড়িয়ে। অমরও তাদের মধ্যে আছে। মাথার রুক্ষ এলোমেলো পশমের মত চুলগুলো কপালের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গায়ে একটা টুইলের সাদা হাফ সার্ট, কোমরে কাপড় জড়ান। বুকের উপরে হাত দুটো জড়ো করা। ধ্যানমগ্ন। বক্তার কথাগুলো যেন প্রাণ দিয়ে শুনছে।

সর্ববিষয়েই তার এমনি অখণ্ড মনোযোগ। তারই পাশে দাঁড়িয়ে অমরের মাস্টার মশাই সুজিতবাবু।

শান্ত সমুদ্রের বুকে জেগেছে জোয়ার! উত্তাল তরঙ্গমালা সগর্জনে ছুটে আসছে বেলাভূমিকে গ্রাস করতে। বহুযুগের সমুদ্র ছিল ঘুমিয়ে, হঠাৎ আজ কোন্ ক্ষ্যাপা হাওয়া তার বুকে তুলল প্রভঞ্জন!…

আনমনেই কখন নীরেনবাবু সাইকেলের গতি কমিয়ে ফেলেছিলেন, হঠাৎ যেন আবার খেয়াল হতেই প্যাডেলের উপরে জোরে চাপ দিলেন। সাইকেল তীব্রগতিতে ছুটে চলল।

॥ আট ॥

নীরেনবাবু মনে মনে যতটা আশঙ্কিত হয়েছিলেন, তার কিছুই ঘটল না। অমরকে কলকাতা যাওয়ার কথা বলতে, অতি সহজেই সে সম্মতি জ্ঞাপন করল। সে বলল : 'বাবা যখন বলছেন, তখন সে কলকাতায় পিসিমার বাড়ীতে থেকেই পড়াশুনা করবে।' মাথা নিচু ক'রে অমর ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

বোবা দৃষ্টি নিয়ে নীরেনবাবু পুত্রের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার মাতৃহারা বড় আদরের সন্তান অমর।

নিঃশব্দে পিতার কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অমর সোজা নিজের পড়বার ঘরে এসে ঢুকল। টেবিলের উপরে অনেকক্ষণ শ্যামুদা টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে গেছে। বাতির শিখাটা কমানো। অস্পষ্ট আলোছায়ায় ঘরখানি থম্ থম্ করছে। এই সবে কিছুক্ষণ হল অমর মিটিং থেকে ফিরেছে। সারাটা দিন পেটে একটি দানাও পড়েনি। সারাটা দ্বিপ্রহরের রৌদ্র মাথার উপর দিয়ে গেছে। অসহ্য একটা যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। গা-হাত-পায়েরও অসহ্য যন্ত্রণা! মাথা ও কপাল দিয়ে যেন আগুনের তাপ বের হচ্ছে।

মাসী এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

'অমু!'

'কে?' অমর চোখ তুলে মাসীর দিকে তাকাল।

অমরের দিকে দুধের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে মাসী বললেন : 'এই নে, দুধটা খেয়ে নে বাবা, সারাটা দিন কোথায় ছিলি?'

'দুধ!' অমরের চোখ দুটো যেন রক্তজবার মতই লাল। ল্যাম্পের আলোয় অমরের রক্ত আঁখির দিকে দৃষ্টি পড়ায় মাসী চমকে উঠেন।

দুধের গ্লাসটা টেবিলের উপরে রেখে মাসী আরো কাছে এগিয়ে এলেন ঃ 'কি হয়েছে রে অমু? চোখ তোর অত লাল কেন?' মাসী অমরের কপালের উপরে তাঁর হাতটি স্পর্শ করতেই যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন : 'উঃ! তোর কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে! দেখি তোর গা।' জ্বরের উত্তাপে অমরের সর্বাঙ্গ তখন সত্যই যেন পুড়ে ঝলসে যাচ্ছে। 'জ্বরে যে তোর গা পুড়ে যাচ্ছে! চল শুবি চল।' মাসী একপ্রকার জোর ক'রেই অমরকে টেনে নিয়ে গিয়ে শয্যায় শুইয়ে দিলেন।

একটা অদৃশ্য আতঙ্ক যেন মাসীর মনের উপরে কালোছায়া ফেলেছে! মাসী মনে মনে সহসা শিউরে উঠেন। চোখ বুজে বুঝি সে আতঙ্কটাকে ভুলে যেতে চান।

কিন্তু পরের দিন প্রত্যুষে অমরের শয্যার পাশে এসে দাঁড়াতেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে মাসী কি করবেন আর ভেবে পান না। জ্বরের ঘোরে অমর আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে শুধু অস্পষ্ট কাতরোক্তি। চোখ দুটি বোজা। রাত্রে বোধহয় বমি করেছে, মেঝেতে জমাট বেঁধে আছে। গায়ে লেপটা চাপানো। শুধু মুখটাই খোলা। সমগ্র মুখখানা যেন ফুলে উঠেছে, একটা চাপা উগ্র রক্তিমাভা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

'অমু !' মৃদুস্বরে মাসী ডাকেন। কিন্তু কোন সাড়া নেই। মাসী তার একটি ঠাণ্ডা হাত অমুর কপালের উপরে রাখলেন।

'অমু ! বাবা !'

রক্তচক্ষু মেলে অমর তাকায় ঃ 'মাথায় বড় যন্ত্রণা !'

অমরের অসুখের কথা মাসীর কাছে শুনে পাগলের মত নীরেনবাবু ছুটে এলেন ছেলের রোগশয্যার পাশে।

তখুনি সরকারী ডাক্তারকে ডেকে আনা হল। রোগী দেখে ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

'ডাক্তারবাবু ?'···নীরেনবাবুর কণ্ঠে ভাষা রুদ্ধ হয়ে যায়।

'বসন্ত !···কবে শেষ টিকা দেওয়া হয়েছিল ?'

'বছর দুই আগে।'

'খুব সাবধানে থাকতে হবে, বাড়ীর সকলকে টিকে নিতে হবে।'

অমরের বসন্ত হয়েছে শুনে মাসী যেন পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এই আশংকাই যে তিনি করেছিলেন। আজ কয়দিন হতেই শহরে বসন্ত দেখা দিয়েছে।

ডাক্তার সবরকম ব্যবস্থাপত্র দিয়ে চলে গেলেন।

নীরেনবাবু বাইরের ঘরের চেয়ারটার উপরে থপ্ ক'রে বসে পড়লেন। বসন্ত ! কথাটি যেন অসংখ্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত নীরেনবাবুর দু চোখের দৃষ্টি জুড়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। নীরেনবাবু উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্থাণুর মত চেয়ারটার উপরে বসে রইলেন। কখন এক সময় দীপক এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছে তা তিনি টেরও পাননি। সহসা এক সময় দীপকের ডাকে তিনি চমকে উঠেন ; 'অমর আছে ?'

'কে ?'

'আমি দীপক। অমর আছে ?'

'অমর !···হ্যাঁ, তার বসন্ত হয়েছে।'

'বসন্ত হয়েছে ? কখন ? সে ত···'

'এইমাত্র ডাক্তার এসেছিলেন, বলে গেলেন।'

'আমি একবার তাকে দেখবো।'

'দেখবে !···ভিতরে আছে যাও।'

দীপক বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। নীরেনবাবু একইভাবে বসে রইলেন চেয়ারটার উপরে।

দীপকের মুখে অমরের অসুখের সংবাদ পেয়ে জাহ্নবী দেবী আর একটি মুহূর্তও দেরী করলেন না। ছেলেকে সঙ্গে ক'রে সোজা অমরের রোগশয্যার পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন।

পরের দিন সর্বাঙ্গে লাল লাল গুটি দেখা দিল, অসহ্য যন্ত্রণায় অমর কাৎরাতে লাগল। মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে ভুল বকছে : আমি যাবো বাবা ! আপনি

যখন বলছেন যাবো !…হাঁ কলকাতাতেই যাবো। মা! আমায় কলকাতায় যেতে হবে! আমি ভুলিনি। আমার দেশ! পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ!…

শয্যার একপাশে নীরেনবাবুও বসে, দুচোখের কোলে তাঁর জল ভরে ওঠে।

দীর্ঘ একুশ দিন যমে-মানুষে টানাটানি ক'রে, শেষটায় জয়ী হলো মানুষ।

অক্লান্ত সেবায় মা অমরকে আবার সুস্থ করে তুললেন। পূর্ণজ্ঞান যেদিন আবার অমরের ফিরে এল, নীরেনবাবু মার সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন: 'ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে ছোট করবো না, অমরকে আপনি প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনি জানেন না, অমরকে আমি আপনার হাত হতে কেড়ে দূরে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, তাই বোধহয় ভগবান আজ আবার তাকে আমার বুক হতে কেড়ে নিয়ে আপনারই হাত দিয়ে আমায় ফিরিয়ে দিলেন।'

'অমর ও দীপক আমার কাছে ত পৃথক নয়, চৌধুরী মশাই। হারানোর ব্যথা আমি জানি। জোর করে ধরে রাখতে চাইলেই ত' কাউকে ধরে রাখা যায় না; তাতে ক'রে আরো দূরেই চলে যায় যে।'

'আমি এতদিন অন্ধ হয়ে ছিলাম, আপনিই আমার দৃষ্টি খুলে দিলেন।'

নীরেনবাবু ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

।। নয় ।।

অমর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেনি। বেলা দ্বিপ্রহর। অমরের শিয়রের পাশে বসে মা অমরকে কংগ্রেসের গল্প শোনাচ্ছিলেন: 'এ ত' দু এক বছরের ইতিহাস নয়, দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর জাগরণের ইতিহাস। কত অসংখ্য কর্মী ত্যাগী মহাপুরুষদের জীবনান্ত প্রচেষ্টা। এ শুধু সামান্য ইতিহাসই নয়, আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতভূমির কোটি কোটি নিরস্ত্র জনগণের দুর্বার স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক অভূতপূর্ব কাহিনী; একটা নিরস্ত্র জাতি, একক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক বলে বলীয়ান বিদেশী শাসকশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে চলেছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশের কোন জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসেই এ ধরনের কোন দৃষ্টান্ত নেই। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ-শাসিত ভারতে সিপাহী-আন্দোলন হয়। আমি তাকে ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মত সিপাহী-বিদ্রোহ বলতে পারি না অমু। যেদিন আবার নতুন ক'রে ভারতের ইতিহাস লেখা হবে, সেদিন স্বর্ণাক্ষরে সে ইতিহাসের পাতায় লেখা হবে প্রথম স্বাধীনতা-আন্দোলন বলে। এবং সেই সর্বপ্রথম আন্দোলন। কিন্তু সংগ্রামের অস্ত্র, ধারা, কৌশল এবং উদ্দেশ্যের দিক হ'তে বিবেচনা করলে কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সিপাহী আন্দোলনের উত্তরাধিকারী ব'লে হয়ত স্বীকার করা যায় না। সিপাহী-আন্দোলন ছিল ভারতের ক্ষীয়মাণ সামন্ততান্ত্রিক শাসকশ্রেণীর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবার একটা চেষ্টা মাত্র। যে কয়টি কারণে সিপাহী-আন্দোলন সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল, তার মধ্যে সেদিনকার সেই আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের জনসাধারণের সহযোগিতা ও সহানুভূতির অভাবটাই ছিল

অন্যতম। একথাটা আজ কেউই আর অস্বীকার করবেন না। পলাশী যুদ্ধের পর হতে সিপাহী-আন্দোলন পর্যন্ত একশত বৎসরের ইংরাজ-শাসনে ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে যে ভাঙা-গড়া চলছিল তার মধ্যে অভ্যুদয় হল এক ভারতীয় নতুন সমাজ-শক্তির।

'তারপর সিপাহী-আন্দোলনের পরবর্তী ভারতের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এই নতুন সমাজ-শক্তি ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় ক'রে বেড়ে উঠেছিল। সেদিনকার সেই শক্তি-পূজারীদের মধ্যেই আমরা পেলাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এস সুব্রহ্মণ্য আয়ার, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Banerjee), স্যার ফিরোজশা মেটা ও আনন্দ চার্লু প্রভৃতি ভারতের সুসন্তানদের। ভারত গভর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ এ. ডি হিউমকেই ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু সেই সময়কার এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস যাঁরা সঠিকভাবে জানেন, তাঁরা কিন্তু একথা স্বীকার না ক'রে পারেন না যে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-ই কংগ্রেসের জনক।

'ভুলবে না এদেশের লোক কোনদিন সেই ১৮৮৫ সালের কথা। ঐ সালেই প্রথম কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সময় হতেই ভারতের বিভিন্ন জাতি হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, ভারতীয় খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের একত্রীভূত সাধনায় আজ জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস দুর্দমনীয় শক্তিশালী অদ্বিতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।'

মা একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন : 'অবিশ্যি একথা খুবই ঠিক যে, প্রথম দিকে কংগ্রেস ভারতীয় ধনী ও শিক্ষিত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনাকে স্পর্শ করেছিল। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই মুখর ক'রে তুলেছিল। এবং তখনকার দিনে যে কংগ্রেস গড়ে উঠেছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল কি ক'রে বেশী সংখ্যায় ভারতীয় উচ্চ চাকুরীতে ও দেশ শাসনের ব্যাপারে নিযুক্ত হবে।

'কিন্তু ক্রমে সে মহাসভার মধ্যে প্রাণ-রস সঞ্চারিত হতে লাগল যখন কংগ্রেসের আহ্বান নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে গিয়েও পেঁছাল। সে ডাক তারা অগ্রাহ্য করতে পারলে না। ধনিক শিক্ষিতের তারাও অনুগামী হলো।

'ধনী ও শিক্ষিতের পাশে যখন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত লোকেরা এসে দাঁড়াল, তখন দেখা গেল, কতকগুলো বেশী মাইনের চাকুরী ও দেশ শাসনের ব্যাপারে কিছু অংশ পেলেই আমাদের সত্যিকারের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটছে না। আরো অনেক কিছুই বাকী থেকে যাচ্ছে। এর ফলেই কংগ্রেসের মধ্যে দুটো দল দেখা দিল। দক্ষিণপন্থী বা পুরাতনপন্থী ও বামপন্থী। এবং ঐ বামপন্থীদের দাবীর চাপেই সেদিন কংগ্রেসের জন্য একটা বলিষ্ঠ আদর্শ খুঁজে বের করবার একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হলো।

'সেদিন যে বৃদ্ধ বলিষ্ঠ নেতা ঐ বলিষ্ঠ আদর্শের সর্বপ্রথম অনুসন্ধান দিলেন, তাঁরই নাম দাদাভাই নৌরজী। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের সভাপতির আসন

হতে কম্বু নিনাদে তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেনঃ স্বরাজ অর্জনই কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য।'

'আশ্চর্য! এত দিন কি এই কথাটা কেউ ভাবেনি মা?' অমর প্রশ্ন করে মৃদুস্বরে।

'না! কিন্তু লক্ষ্য ত' স্থির হলো স্বরাজ অর্জন। এখন কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে, এই হল চিন্তা!'

'তারপর?'

'তারপর সেই পথের প্রথম সন্ধান পাওয়া গেল বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে।' মা আবার চুপ করলেন। একটুক্ষণ যেন কি ভাবলেন, তারপর মৃদুস্বরে আবার বলতে সুরু করলেনঃ 'বৃটিশের পক্ষ থেকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সেই শুরু হ'তেই মুসলমানদের কংগ্রেস-বিরোধী করবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা হয়েছিল। এবং ঐ আয়োজনে প্রথম নেতৃত্ব করেন স্যার সৈয়দ আহম্মদ। যে মুহূর্তে কংগ্রেসের আদর্শ একমাত্র স্বরাজ লাভ ব'লেই ঘোষিত হলো, সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান বা ভারতীয় মুসলমানদের কংগ্রেস বিরোধী করবার জন্য মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হল। মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার ভারতীয় মুসলমানদের কংগ্রেসের বিরোধী করবার জন্য এক অপূর্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত জাল বিস্তার করলে।

'বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন কংগ্রেসের সহানুভূতি লাভ করলেও ঐ স্বদেশী আন্দোলনকে সর্বভারতীয় ব্যাপার বলে মেনে নিতে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা সেদিন কিছুতেই রাজী হলেন না।

'স্বরাজের আদর্শ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু কংগ্রেসের দুই দল বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীর মধ্যে ঐক্য সাধিত হয়নি, এবং দুই দলের মধ্যে এই বিরোধ ভীষণ আকারে দেখা দিল সুরাটে, কংগ্রেসের অধিবেশনে।

'সে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। দুইপক্ষের মধ্যে একটা মিটমাট বা মিলনের চেষ্টা অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক চেতনার নব নব উন্মেষের সঙ্গে তাল রেখে দক্ষিণপন্থীরা শেষ পর্যন্ত চলতে পারলেন না বলেই বোধহয়, তাঁদের কংগ্রেস ত্যাগ করে সরে যেতে হলো।

'১৯১৪-১৮র প্রথম বিশ্ব-সংগ্রামের মধ্যে কংগ্রেসের বামপন্থী দলের উপর সরকারী দমন-নীতির রথচক্র নিষ্ঠুর ও ভীষণভাবেই চলেছিল। এবং যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর জয়ী বৃটিশ আরও বলীয়ান হয়ে উঠে দমন-নীতির স্থায়ী পরাকাষ্ঠা দেখাল।'

'রৌলট আইন জারী করতেই সর্বপ্রথম পাঞ্জাবে বিক্ষোভ দেখা গেল। সেই বিক্ষোভের নির্মম সমাপ্তি ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত আবালবৃদ্ধবনিতা ও শিশুর উপরে বেপরোয়া গোলাগুলী চালিয়ে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে। পাঞ্জাবের মাটি রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। কংগ্রেসের ইতিহাসে শুরু হলো সেদিন এক নতুন অধ্যায়। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে এলেন নব চেতনা নিয়ে, নতুন আশার বাণী বহন ক'রে কংগ্রেসের পতাকাতলে। তিনি বললেনঃ "এবারে আমরা করবো অহিংসভাবে আইন অমান্য আন্দোলন।"

'ঐ আইন অমান্য আন্দোলনের ভিতর দিয়েই ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে কংগ্রেসের পরিচয় ঘটল।

'ইতিমধ্যে আবার নিয়মতান্ত্রিক দিক হতে এল মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার। এ ঘটনার সময়ই ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা মীমাংসার জন্য লক্ষ্ণৌতে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এবং ঐ চুক্তির ফলেই মুসলমানেরা পৃথকভাবে নির্বাচিত হবে সাব্যস্ত হয়। পরে ঐ চুক্তির জোরেই ১৯১৯ সালে মুসলমানরা পৃথক নির্বাচনের অধিকার পেল।

'১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন করেন। দেশে মহাত্মার আন্দোলন অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা দিল। ফলে সুদূর পল্লীতে পল্লীতে নিভৃত অঞ্চলে গড়ে উঠতে লাগল কংগ্রেস কমিটি। মহাত্মার এ অসহযোগ আন্দোলন একদিকে আমাদের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসকে সংগ্রাম শক্তিতে পরিণত করল, অন্যদিকে জাতীয় মহাসভার সঙ্গে হল জনগণের সংযোগ। দেশের জনসাধারণ সেই ১৯০৭ সাল হতে বিপ্লবমুখী হয়েছিল, এতে সকলের সুবিধাই হল। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনা উপলক্ষে মহাত্মা অসহযোগ আন্দোলন থামিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মধ্যে। হিন্দু-মুসলমান ভাইরা এবারে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ছোরা-ছুরি নিয়ে শুরু করলো দাঙ্গা-হাঙ্গামা। ইতিমধ্যে এ দেশে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেহরু রিপোর্ট প্রণয়ন। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ ও সাইমন কমিশনের আগমন। এদিকে অসহযোগ আন্দোলনের পর হতেই কংগ্রেসের নতুন বামপন্থীদল সমাজতান্ত্রিক আদর্শে গড়ে উঠতে লাগল।

'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বললেনঃ দেশের জনগণের সমর্থন না থাকলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক দাবীর কোন মূল্যই নেই। কারণ আমরা যতক্ষণ না স্বাধীনতা পাচ্ছি, ততক্ষণ দেশের আর্থিক উন্নতি আমরা কিছুতেই করতে পারবো না। এর পর নানা ঘটনা-বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে লাহোরে জহরলালের নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হল। তারপর হল করাচী অধিবেশন, গৃহীত হল মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাব। এবং ১৯৩৬ সনে কৃষক ও শ্রমিক-শ্রেণীর সহযোগিতার জন্য কার্যসূচী ও গণ-সংযোগ প্রস্তাব গৃহীত হল।

'এদিকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়েই বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক আরম্ভ হয়। কংগ্রেসের পক্ষ হ'তে মহাত্মা গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসলেন। আবার তখন আরম্ভ হল আইন অমান্য আন্দোলন। বৃটিশ এবারে উঠে-পড়ে লাগলেন কংগ্রেসকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য। কিন্তু নিপীড়নে কংগ্রেস আরো শক্তিশালী হয়ে উঠল।

'গোলটেবিল বৈঠকের পরিণামে ১৯৩৫ সনে ভারত শাসন আইনই শুধু রচিত হল না, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাও সৃষ্টি হল। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে না-গ্রহণ না-বর্জন নীতিতে গ্রহণ করলে। ফলে দেশের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ আরো ভয়ানকভাবে সংক্রামিত হলো। আইন অমান্য আন্দোলনের পর হতেই কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব সংগ্রামবিমুখ হয়ে পড়ল।

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন ধ্বংস করবার মানসে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল, কিন্তু ধ্বংস করবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না।

'এবারে আবির্ভূত হলেন বাংলা তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সন্তান সুভাষচন্দ্র, কংগ্রেসকে আবার সংগ্রামমুখী করবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী নেতাদের ষড়যন্ত্রে তাঁর এ প্রচেষ্টা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

'এরপর এল দ্বিতীয় মহাসমর, আজ যার প্রজ্বলিত ধূম্রশিখায় সমগ্র পৃথিবী কালো হয়ে গেছে।'

অমর ধীর মৃদুকণ্ঠে এবার বলল ঃ 'তারপর সব আমিই জানি মা। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনরূপে সুস্পষ্ট ঘোষণা না করায় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করল।'

'হ্যাঁ, কিন্তু দেশবাসীকে কংগ্রেস আর কোন নতুন পথনির্দেশ আজ পর্যন্ত দিতে পারল কই!'

॥ দশ ॥

এবারে পুত্রের অসুখের মধ্য দিয়ে নীরেনবাবুর মনে একটা গভীর দাগ কেটে বসে গেছে। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের রীতিনীতি ভিন্ন পথে বইতে শুরু করেছে। আজ নতুন এসে পুরাতনকে কণ্ঠ টিপে ধরেছে, বলছে : পুরাতন জীর্ণকে ত্যাগ কর, এগিয়ে চল! কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও সংস্কার, তাকে এককথায় একেবারে ছেঁটে ফেলে দেওয়া ত এত সহজ নয়!

অমর কিন্তু নিজে হতেই অসুখ সেরে যাবার পর পিতাকে অনুরোধ করে কলকাতায় তার পিসিমার বাড়ীতে চলে গেল।

নীরেনবাবু ভেবেছিলেন এখানকার আবহাওয়া হতে অমরকে কোথাও সরাতে পারলেই তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন; কিন্তু অল্প কয়েক দিন পরে কলকাতা হতে অমরের একখানা চিঠি পেয়েই সে ভুল তাঁর ভেঙে গেল।

অমর লিখেছে ঃ

শ্রীচরণেষু

বাবা, আপনি চিন্তিত হবেন না, আমার শরীর আজকাল সম্পূর্ণ সুস্থ। পড়াশুনাও চলছে মন্দ না। পরীক্ষা না দিলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন, তাই পরীক্ষাও দেবো, কিন্তু আপনাকে হয়ত পরীক্ষার ফল দেখে নিরাশ হতে হবে। চারদিকে নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। সাম্রাজ্যলোভী সরকারের যুদ্ধের চাহিদা মেটাতে গিয়ে চারদিকে হাহাকার জেগেছে। গলা দিয়ে আমার অন্ন ওঠে না বাবা! ভাতের গ্রাস মুখের কাছে তুলতেই চোখের উপরে ভেসে ওঠে অনাহারী বুভুক্ষু লক্ষ লক্ষ আমারই মত ভাই-বোন। রাত্রেও ভাল ঘুম হয় না। তার উপরে যখন দেখি আমাদেরই দেশীয় কর্মচারীরা লোভী, শয়তান

বৃটিশের প্রসাদে তুষ্ট হ'য়ে তাদেরই দেশী ভাইদের উপর অকথ্য অত্যাচার ক'রে চলেছে তাদের বিদেশী প্রভুদের তোষণের জন্য, তখন সত্যিই ঘৃণায়, লজ্জায় মূক হয়ে যাই। ভাবি, এই কি সরকারী চাকরীর চরম কথা। তাই যদি হয়, তাহলে এ চাকরীর চেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করাও যে ঢের ঢের ভাল !

নীরেনবাবু পুত্রের চিঠির জবাব দেননি। দিতে সাহস হল না। ঘরেই আজ তাঁর আগুন জ্বলেছে, সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

আজকাল বুকের ব্যথাটা যেন খুব ঘন ঘন আসে। রাত্রে ঘুমের মধ্যে অনেক সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। ডাক্তার এলেন, বললেন ঃ রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। **Complete rest.**

নীরেনবাবু ডাক্তারের কথায় সামান্য একটু হেসেছিলেন মাত্র।

অমরের পিসেমশাই রায়বাহাদুর রণধীর সান্যাল কলকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা জজ। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবীর আই-সি-এস, সেও কোন এক জেলার ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ। ছোট ছেলে রমেন ও একমাত্র মেয়ে করবী কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো প্রকৃতির। রমেন অমরের সঙ্গেই এবারে ম্যাট্রিক দেবে। করবী আশুতোষে বি-এ পড়ে।

রায়বাহাদুর স্বয়ং, তাঁর স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র অত্যন্ত উগ্র রকমের সাহেব-ঘেঁষা এবং সাহেবী-ভাবাপন্ন। বালীগঞ্জ টেরেসে প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য বাড়ী। বিলাতী দ্রব্যসম্ভার ঝিলমিল করে, চোখ ঝলসে দেয় পথিকজনের। বাড়ীতে সাহেবী খানা, বাবুর্চি, সোফার, দ্বারোয়ান। তিন তিনটে দামী মোটরকার। ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দী মিশ্রিত খিচুড়ী ছাড়া কেউ ত কথাই বলে না।

রমেন ও করবীর জন্য রায়বাহাদুর ও তাঁর স্ত্রীর আফশোষের সীমা নেই। কারণ তারা খদ্দর ছাড়া পরে না, টেবিল-চেয়ারে খায় না, সাহেবী খানা ছোঁয় না, মাটিতে আসন পেতে ভাত-ডাল খায়। বাড়ীর গাড়ীতে উঠে না, পায়ে হেঁটে স্কুল-কলেজে যাতায়াত করে। যত সভা-সমিতি-মিটিংয়ে তাদের দু'ভাই-বোনের যাওয়া চাই-ই !

মাঝে মাঝে রায়বাহাদুর চীৎকার ক'রে উঠেন : বের ক'রে দাও ঐ অপদার্থ, বংশের কুলাঙ্গার দুটোকে এ বাড়ী থেকে। আমার নাম ডোবাল ! লোফারের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। যেন চালচুলো নেই। সব কমিউনিস্ট হয়েছেন, সাম্যবাদী !

প্রকাণ্ড বাড়ীটার তিন তলার উপরে ছোট চিলে ঘরটা দুই ভাই-বোন বেছে নিয়েছে। এ বাড়ীর সকল কিছুর স্পর্শ বাঁচিয়ে সেইখানেই থাকে, যেন এ বাড়ীর কেউ নয় ওরা।

অমরও এসে তাঁদের ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে। রমেন অমরের থেকে মাস-কয়েকের ছোট। রুবি ওদের চাইতে প্রায় পাঁচ বছরের বড় !

রমেন দেখতে হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল, কালো রং। কিন্তু করবী ঠিক তার উল্টো। রোগা লিকলিকে পাতলা চেহারা। আগুনের শিখার মত উজ্জ্বল

গায়ের রং। চোখ দু'টি যেন কি এক অদ্ভুত জ্যোতিতে চক্‌চক্‌ করে সর্বদা। কি যে ভাল লাগে অমরের রুবিদিকে। খুব কম সময়ই রুবিদি বাড়ীতে থাকে। কলেজের ছুটির পর কোথায় সভা, সমিতি; এইসব ক'রে বেড়ায়। এক একদিন বাড়ীতে ফিরতে রাত্রি এগারটা সাড়ে এগারটাও হয়ে যায়। পরিধানে বেশীর ভাগ সময়ই থাকে সাদা-সিধে একটি গেরুয়া রংয়ের খদ্দরের ব্লাউজ এবং গেরুয়া রংয়েরই একখানা অল্প দামের মোটা খদ্দরের শাড়ী। মাথায় কোনদিন তেল দেয় না। একমাথা রুক্ষচুল।

একদিন অমর জিজ্ঞাসা করেছিল : 'আচ্ছা রুবিদি, তোমার সব শাড়ীগুলোই গেরুয়া রংয়ে ছাপান কেন?'

'দেশের মুক্তির জন্য আমরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী ছেলেমেয়ে আমরা। দেশকে ভালবাসা অত সহজ নয় অমু! সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীর মত যেদিন তুমি দেশকে ভালবাসতে পারবে, সেদিনই বুঝবে ভাই, ত্যাগের দেশ এই ভারতবর্ষ! তাই রিক্ত গেরুয়া রংয়ের মধ্য দিয়েই আমরা অন্তর ও বাহিরকে মুক্তিস্নানে শুচি করেছি। তাছাড়া বোকা ছেলে এটা বুঝিস না কেন, গেরুয়া রং সহজে ময়লা হলেও বোঝা যায় না। নিত্য রজকের ঘরে কাপড়-জামা দিয়ে কেচে আনবার মত বিলাসিতার অর্থ আমাদের কই! প্রায় পৌনে দুইশত বৎসরের শোষণনীতির ফলে ভারতবর্ষ যে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।'

করবীর একটিমাত্র বিলাসিতা ছিল, দিনে-রাতে প্রত্যহ সাত-আটবার চা পান করা।

রাত্রি বোধ করি এগারটা হবে। রমেনদের বাড়ীটা এর মধ্যেই নিঝুম হয়ে গেছে। কলকাতায় এর মধ্যেই যেন শীত যাই যাই করছে। বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু হয়েছে। আসন্ন পরীক্ষার জন্য রমেন ও অমর তিনতলার ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে পাশাপাশি একটা টেবিলের উপরে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে। নীল সবুজ ডুম ঢাকা টেবিল-ল্যাম্পের আলো কেবল টেবিলটার উপরেই পর্যাপ্তভাবে পড়েছে। বাকী ঘরখানি মৃদু আলোছায়ায় ভরা। পাশের এক ব্যারিস্টারের বাড়ীর দোতলা হতে ভেসে আসছে পিয়ানোর মৃদু টুং টাং মিষ্টি আওয়াজ ও সেই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত কলহাসির টুকরো টুকরো সঙ্গীত।

সিঁড়িতে স্যাণ্ডেলের চটপট আওয়াজ পাওয়া গেল। বাব্বা, এতক্ষণে রুবিদি বুঝি ফিরল।

রমেন উঠে ইলেকট্রিক স্টোভের প্লাগটা পয়েণ্টে লাগিয়ে কেটলীতে চায়ের জল চাপিয়ে দিল। দিদি আসছে, এখুনি ত চা চাইবে।

সত্যি সত্যিই রুবি এসে ঘরে প্রবেশ করল। ঘরে প্রবেশ ক'রেই কোন মতে স্যাণ্ডেলটা পা হতে খুলে টান হয়ে শয্যার উপরে গা ঢেলে দিল।

'অমন ক'রে শুয়ে পড়লে যে দিদি?' রমেনই প্রশ্ন করে।

'ভারত রক্ষা আইনে আজ সন্ধ্যাবেলা চিত্তদাকে ধরে নিয়ে গেল।'

'হঠাৎ! কি অপরাধ!'

'বৃটিশ রাজত্বে অপরাধের কোন প্রয়োজন হয় নাকি! তাদের প্রয়োজন ধরা, সেইটাই ত আমাদের অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। ১৯৩৯ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং কমিটি যেদিন দাবী জানাল বৃটিশ সরকারকে যে, যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ঘোষণা কর ও সেই সঙ্গে অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীন দেশ হিসাবে গণ্য ক'রে আমাদের জাতীয় সরকার গঠনের ক্ষমতা দাও, নইলে যুদ্ধে অসহযোগই আমরা চালাব—'

'ঠিকই ত বলেছিল সেদিন কংগ্রেস। আজকের এই যুদ্ধে ভারতের কোন স্বার্থ থাক বা না থাক, ভারতীয় কোন নেতার সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না ক'রে বা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র পরিষদের কোন মতামত না নিয়েই ভারত সরকার অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে কেন?' বলে উঠে রমেন।

'কাজে কাজেই আটঘাঁট তারা আগে হতে বেঁধেই রেখেছিল, ভারত রক্ষা আইন পাশ ক'রে এখন শুরু করলে তাদের চিরাচরিত দমননীতি! চিত্তদাও সেই দমননীতির মধ্যে পড়েছেন।' রুবি বলে মৃদু হেসে জবাবে।

এখানে এসে মাঝে মাঝে বাইরের মিটিং ও সভা-সমিতিতে কয়েকবার রুবিদির সঙ্গে যাতায়াত ক'রে একমাত্র চিত্তদাকেই অমরের খুব ভাল লাগত। ও চিত্তদার কথাই ভাবছিল।

চিত্তদা সকলের দাদা। বয়স প্রায় বিয়াল্লিশের কাছাকাছি হবে। ১৯০৭ সালে যখন দেশে সন্ত্রাসবাদের ঢেউ এল, সেই সময়েই চিত্তদা স্কুল ছেড়ে বিপ্লবীদের পাশে এসে দাঁড়ায়। গৌহাটি পাহাড়ের উপরে যে কয়জন তরুণ বিপ্লবী দেশকে স্বাধীন করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মরণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, চিত্তদাও সেই দলে ছিল। বৃটিশ সৈন্যের গুলীতে আহত হয়ে সে দুই দিন অজ্ঞান অবস্থায় গাছের তলায় পড়ে থাকে, তারপর দীর্ঘ একমাস ধরে পাহাড়, বন-জঙ্গল, নদী-নালা পার হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। কেউ তার সন্ধান পায়নি। অবশেষে একদিন চুয়াডাঙ্গা রেল স্টেশনে অতর্কিতে ধরা পড়ে ১৫ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করে। এই বছর দেড়েক মাত্র আন্দামান হতে মুক্তি পেয়েছে।

ভারত রক্ষা আইনে আবার ধরা পড়ল আজন্মা ব্রহ্মচারী; দেশসেবাই একমাত্র ব্রত! রোগা লম্বা গড়ন। মাথায় চুল অর্ধেক পেকে গেছে। অমরের তার বিপ্লবী-জীবনের কাহিনী শুনতে বড় ভাল লাগত। চিত্তদা বলে: বঙ্কিমের আনন্দমঠের সন্তান আমরা। অহিংস আন্দোলনকে আমি মনেপ্রাণে নিতে পারি না, অমু। বৃটিশকে এদেশ হতে তাড়াতে হলে, বন্দুকের গুলি চালিয়েই তাড়াতে হবে। বোমা ফেলে উড়িয়ে দিতে হবে লাটপ্রাসাদ। এদেশকে স্বাধীন করতে হলে চাই বিপ্লব। চাই রক্তপাত। রক্ত না দিলে স্বাধীনতা মেলে না। শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে, এদেশের প্রতি শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। কেঁপে উঠেছিল বৃটিশ রাজত্ব সেদিন।

কিন্তু নিভে গেল সে বিপ্লবের আগুন! সেই অগ্নি-যুগের কথা। ঢাকা থেকে শুরু ক'রে লাহোর পর্যন্ত বিদ্রোহের এক বিরাট বিপুল আয়োজন। ঢাকার সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীতে তখন যে সব শিখ সৈন্য ছিল, লাহোরের শিখ ষড়যন্ত্রকারী

সেনারা তাদের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছে। তারাও বিদ্রোহে যোগ দিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ। ময়মনসিং, রাজসাহী, সুন্দরবনের জঙ্গলে স্বাধীনতাকামী সৈনিকদের চলেছে নিত্য কুচকাওয়াজ, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার রণ কৌশল শিক্ষা, গেরিলা যুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা।

বিপ্লবীদের সব আয়োজন পূর্ণ হলো, এবং ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী উত্তর ভারত ও বাংলায় যুগপৎ বিদ্রোহের দিন স্থির হল।

বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী ঐ সংবাদ বেনারসের নেতা শচীন সান্যালকে পাঠিয়ে দিলেন।

শচীন সান্যাল আবার সে সংবাদ বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। বাংলার বিপ্লবীরা সংবাদের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত। কিন্তু কোন সংবাদই এসে পেঁছিল না। লাহোরে নাকি বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশ হয়ে গেছিল। বোমা, অস্ত্র, ঘোষণাপত্র ও পতাকা সহ বহু বিপ্লবী ধরা পড়ে গেল। সেদিন সত্যই মহান মৃত্যুর রঙীন এক নেশা আমাদের যেন পাগল ক'রে তুলেছিল!

সেই সময় স্বাধীনতা কাগজ আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে লিখলে ঃ

না হ'তে মাগো বোধন তোমার,
ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গল-ঘট'।
জাগো মা রণচণ্ডী, জাগো মা আবার,
আবার পূজিব তব চরণ-তট।

সেই বিপ্লবী চিত্তদা আবার কারারুদ্ধ হলো!

॥ এগার ॥

প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে গেল। কলকাতায় থাকতে আর ভাল লাগছিল না, তাই অমর আবার তার পিতার কর্মস্থলে ফিরে এল। ওখানে পেঁছেই সর্বপ্রথমে অমর ছুটে দীপকদের বাড়ীতে গেল।

ইতিমধ্যে ও কলকাতায় বসে বসেই দেখেছে, দেশের উপর দিয়ে কত কিছু হয়ে গেল। ক্রিপ্‌স মিশনের ব্যর্থতা, ভারত রক্ষা আইনের জোরে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার। বহু বিদেশী সৈন্য কলকাতায় ও এদেশের সর্বত্র আমদানি হয়েছে। ক্রিপস্ প্রস্তাব সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেছেন ঃ স্ট্যাফোর্ড লোকটি অত্যন্ত ভালমানুষ, কিন্তু তিনি যে যান্ত্রিক-যানে উঠেছেন, সে যানটি ভাল নয়। সেটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, আখেরে তিনি ঐ যন্ত্রের কাছে নিজের সত্ত্বাও হারিয়ে ফেলবেন। এ কথাও তিনি বলেছেন, প্রস্তাবটি অত্যন্ত দুর্ভাগা প্রস্তাব এবং স্পষ্টই হাস্যকর, কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ক্রিপ্‌সের জানা উচিত ছিল, কংগ্রেস ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করবে না। ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব অনুসারে তিন প্রকারের বিভিন্ন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত তিনটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসংঘের আবির্ভাব হত। পাকিস্তান পরিকল্পনার স্থান প্রস্তাবে ছিল। প্রস্তাবটি সুদূর ভবিষ্যতে প্রতিপালিত হবে, এমন এক প্রতিশ্রুতি (Post dated

cheque) ব'লে গান্ধীজী বর্ণনা করেন।

জওহরলাল বলেছেন : আমরা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে ধরনা দেব না। আমরা স্থৈর্য্য ও জ্ঞানানুযায়ী বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হব। ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাবের দ্বারা আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। একমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিরূপেই এবং অন্যান্যদের মত স্বতন্ত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হলেই আমরা সহযোগিতা করতে পারি। ক্রিপ্‌স্‌ দেশরক্ষা-সচিবকে মনোহারী দোকান, সৈন্যদের জন্য খাবারের দোকান প্রভৃতি চালনার গুরুদায়িত্ব ও ভার দিতে পারেন। আমরা এতেই মেতে উঠতে পারি না।

সমগ্র পৃথিবীর উপরে যে কালোছায়া ঘনিয়ে এসেছে এবং সেই ছায়া যে ভারতবর্ষের উপরেও কালো আভা ফেলেছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

দীপক যেন আর সে আগেকার দীপক নেই। কেমন যেন থমথমে গম্ভীর।

বন্ধুকে অনেক দিন পরে দেখে দীপক মৃদু হেসে আহ্বান জানাল ঃ 'কেমন ছিলে অমর ?'

দীপকের ছাড়া ছাড়া ব্যবহারে অমর একটু যেন আঘাতই পেল ; উদ্যত অশ্রুকে কোনমতে নিরোধ করে মৃদুকণ্ঠে বললে ঃ 'ভালই।'

বাইরের ঘরে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন ঃ 'এই অমু ! কখন এলে বাবা ?'

'আজই এলাম মা !' অমর নত হয়ে মার পায়ের ধুলো নিল।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো। দীপক সমগ্র কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ; অমর ১৫ টাকা বৃত্তি পেয়েছে ; রমেন প্রথম বিভাগে পাশ করেছে।

নীরেনবাবুর ইচ্ছা ছিল অমর প্রেসিডেন্সীতে পড়ে, কিন্তু অমর দীপকের সঙ্গে মেদিনীপুর কলেজে গিয়ে ভর্তি হল। নীরেনবাবুর শরীর আরো খারাপ হয়েছে।

দেশের পরিস্থিত ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছে। যুদ্ধের দাবানল ক্রমেই দিক হতে দিগন্তে লেলিহান শিখায় ছড়িয়ে পড়ছে।

অক্ষশক্তির প্রচণ্ড আঘাতে বৃটিশ সরকার কাহিল। জাপানীরা বর্মা সম্পূর্ণ ক'রে একেবারে ভারতের দ্বারদেশে উপনীত। ইতিমধ্যে জাপানী বোমারু বিমান রাতের অন্ধকারে এসে কলকাতার উপরে বোমা বর্ষণ ক'রে গেছে।

বর্মার অসামরিক অধিবাসী যারা, তাদের দুঃখ-দুর্দশা অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছে। বৃটিশদের ভারত রক্ষার অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা, বৃটিশ শক্তির আজিও ভারতে থাকার দরুন ভারত বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আসন্ন সংকট এবং বৃটিশদের কূটনীতির জন্য ভারতে অগণিত লোকবল, প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভারতের একান্ত অসহায় অবস্থা, ভারতে অগণিত বিদেশী সৈন্য আমদানি —এই সব ব্যাপারে দেশের নেতারা ক্রমে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। মহাত্মাজী অনেক দিন ধরে এই সব প্রতিকারের উপায় চিন্তা করছেন।

সমগ্র ভারতবাসী সেই অর্ধনগ্ন আশ্রমবাসী ত্যাগী ঋষির দিকে তাকিয়ে আছে।

১৪ই জুলাই ১৯৪২ সাল। বিদ্যুতের মতই ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল।

ভারতের অহিংস মুক্তি-সংগ্রামের ঋত্বিক সত্যই আর উপায়ান্তর না দেখে, ১৯৩৯ সনে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের উত্থাপিত 'ভারত ছাড়' নীতির যৌক্তিকতা এতদিন বাদে অনুমোদন করেছেন! তিনি বলেছেনঃ এই আন্দোলনে আমি আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবো। আমার মন বলছে, তোমাকে সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম করতে হবে।…জগতের রক্তচক্ষু দেখে ভীত হয়ো না, এগিয়ে যাও!…

স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত শোনালেন মুক্তির শঙ্খনাদ!

আসমুদ্রহিমাচল চঞ্চল হয়ে উঠলো। মসীকৃষ্ণ অন্ধকার রাতে সহসা যেন আকাশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হাজারো বিজুড়ী চমক হেনে গেল। ছোট শহরটি যেন কেঁপে উঠেছে। ক্লান্ত বাসুকীর সহস্র ফণায় লেগেছে দোলা।

কলেজের ক্লাসে, হোস্টেলে, কমন রুমে, খেলার মাঠে, দোকানে সর্বত্র ঐ এক আলোচনা।

একই ডাবল সিটেড ঘরে দীপক আর অমর থাকে। রমেনও এখানকার কলেজে ট্রান্সফার নিয়ে এসেছে।

পাশের ঘরেই যে ছেলেটি থাকে, এখানকার কলেজের সে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র, কপিলপ্রসাদ পাঁড়ে। ইউ, পি'তে বাড়ী; কিন্তু ওর বাবা মহাদেও-প্রসাদের এই শহরের উপরেই মস্তবড় ধান-চালের ব্যবসা। দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরে মহাদেওপ্রসাদ বাংলা দেশে ব্যবসা করছে।

আজকাল দীপকের কপিলপ্রসাদের সঙ্গেই বেশীর ভাগ সময় কেটে যায়। পড়াশুনা দীপক একপ্রকার ছেড়ে দিয়েছে বললেও চলে। ক্লাসেও দীপককে বড় একটা দেখা যায় না।

একদিন গায়ে পড়ে অমরই দীপককে জিজ্ঞাসা করেছিল দু'চারটে কথা, কিন্তু দীপক যেন অমরকে আজকাল কেমন এড়িয়েই চলতে চায়।

ইতিমধ্যে হঠাৎ রুবিদির একখানা চিঠি পেল অমর। তাতে লেখা আছে—

হে মৃত্যুহীন, অমর!

দেশের অবস্থা দেখছো ত'! যুদ্ধের বাজারে একটা মস্তবড় কালো ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে। পাগলা ঘোড়াটা সব ওলট পালট ক'রে তছনছ ক'রে বেড়াচ্ছে। একটা আসন্ন ঝড়ের সংকেত পাচ্ছ কি? সেই ঝড়ের তাণ্ডবে বৃটিশের এতদিনকার দমননীতি, শঠতা, স্বেচ্ছাচারিতার সুউচ্চ প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। তৈরী থেকো। জেনো, দেশের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমাদের প্রত্যেকেরই রক্তদান করতে হবে। মৃত্যুই শেষ নয়। ভুলো না এ কথা। আমাদের

দলের অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছে। আমারও দিন হয়ত ঘনিয়ে এলো। রমেনের সংবাদ কি? সে চিঠিপত্র দেয় না কেন? কপিলপ্রসাদকে আমি চিনি। ভালবাসা রইল।

শুভার্থিনী রুবিদি

॥ বার ॥

১৯৪২-এর আগস্ট! ৫ই আগস্ট বোম্বাই-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শুরু হল। সর্বপ্রকার পরিস্থিতি আলোচনা করবার পর অবিলম্বে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন, এই বিবেচনায় ৮ই আগস্ট রাত্রি দশটার সময় মহাত্মাজী জানালেনঃ Quit India. ভারত ছাড়। সঙ্গে সঙ্গে A. I. C. Cর সভাও শেষ হল।

'ভারত ছাড়'! 'ভারত ছাড়'! বিপ্লবের পাঞ্চজন্য বেজে উঠল। 'করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে'!

৯ই আগস্ট! ভোর পাঁচটায় মহাত্মাজী দৈনন্দিন প্রার্থনার পর শুনলেন, তাঁকে, মহাদেব দেশাই ও মীরাবেনকে গ্রেপ্তার করবার জন্য বোম্বাই-এর পুলিশ কমিশনার ওয়ারেণ্ট হাতে দ্বারদেশে উপনীত।

বৃটিশের চিরাচরিত দমননীতি শুরু হলো। সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বেআইনী বলে ঘোষিত হল। ভারতের বহু নেতাকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ ক'রে কোথায় কোন্ অজ্ঞাত স্থানে যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, কেউই তা জানতে পারলে না। বৃটিশের দানবীয় দমননীতি মানুষের কণ্ঠস্বর সবলে টিপে ধরেছে, সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ, দেশের নেতারা সর্বত্র কারারুদ্ধ!

কোন পূর্ব পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি নেই; তবু 'ভারত ছাড়' অগ্নিস্ফুলিঙ্গ' ভারতের দিক হতে দিগন্তে ছড়িয়ে গেল।

সরকারীভাবে সেদিন মেদিনীপুর জেলা বিপজ্জনক এলাকা ব'লে ঘোষিত হয়েছে।

মাঝ রাত্রে হঠাৎ কতকগুলো চাপা সতর্ক কণ্ঠস্বরে অমরের ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। রাত্রি কত হবে, কে জানে? একটু আগেই বোধ হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঘরের দরজাটা খোলা, মাঝে মাঝে হু-হু ক'রে ঠাণ্ডা জলো হাওয়া ঘরে এসে ঢুকছে।

কপিলপ্রসাদের কণ্ঠস্বরঃ না না, এ অত্যাচার সইবো না। কাঁথি ও তমলুক মহকুমার, নন্দীগ্রাম ও ময়নার সব রকমের নৌকা সরকারের লোকেরা জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে গেছে। নৌকার উপরেই যাদের জীবনযাত্রা নির্ভর ক'রে, তাদের কথাটা একবার ভেবে দেখো।

—শুধু কি তাই, আজ একদল জেলে একত্র হয়ে মিটিং করেছে তমলুক মহকুমায়। নৌকাগুলো শুধু জোর করে কেড়েই নেয়নি, বেশীর ভাগই আগুন জেবলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বাকীগুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো ক'রে ফেলা হয়েছে—দীপকের গলা।

অমর আর শয্যার উপর শুয়ে থাকতে পারল না, উঠে বসল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল পাশের ঘরে। ঘরের দরজা ভিতর হ'তে বন্ধ। একটি মাত্র খোলা জানালা-পথে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল।

এরা সব কারা? এদের অনেককেই অমর চেনে না। না, এদের কোনদিন দেখেও নি। মাঝখানে দেখা যাচ্ছে কপিলপ্রসাদকে। দীর্ঘ সরলরেখার মত ঋজু দেহাবয়ব। মাথার চুলগুলো পিঙ্গল। ভোঁতা নাক। ছোট ছোট পিঙ্গল চক্ষু। ঘরের মধ্যে জ্বলছে একটা মোমবাতি। মোমবাতির আলো কপিল-প্রসাদের পিঙ্গল চোখের তারায় প্রতিফলিত হয়ে বন্যজন্তুর চোখের মত ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলছে, যেন জ্বলন্ত দু'টি অঙ্গার।

—দায়িত্বহীন দমননীতি-বিশারদ গভর্ণমেণ্ট! এদের আজকের এই বেপরোয়া বঞ্চনানীতি একটি কথাই আমাদের শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আমাদেরই প্রস্তুত হ'তে হবে। মহিষাদল ও সুতাহাটা থানার এলাকা হ'তে রণবীর সংবাদ পাঠিয়েছেন, সেখানে বিদ্যুৎ-বাহিনী গঠন করা হয়েছে। প্রায় তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিদ্যুৎ-বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

'কে?' কপিলপ্রসাদ চমকে খোলা জানালার দিকে তাকাল।

'কে? কে ওখানে?'

অসাবধানতা বশতঃ অমরের হাত জানালার খড়খড়িতে লেগে শব্দ হয়েছিল।

'আমি অমর।'

'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এস!'

'ভিতরে যাবো!'

'হাঁ! কানু, দরজাটা খুলে দাও।'

খোলা দরজা-পথে অমর ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে। একসঙ্গে অনেক-গুলো চোখের দৃষ্টি যুগপৎ অমরের উপরে এসে পতিত হয়।

'বোস অমর!'

'এ কে কপিল?' প্রশ্নকারী একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক। এতক্ষণ ঘরের এককোণায় চুপটি ক'রে বসেছিলেন। মাথার সম্মুখভাগে চক্‌চকে মসৃণ একখানি টাক। পশ্চাতের দিকে যে অবশিষ্ট চুল কটি আছে, তাও কাঁচা-পাকায় মিশান। চোখে নিকেলের ফ্রেমের একখানি চশমা।

'বিনয়দা, এরই নাম অমর।'

'তমলুকের সাব-ডিভিসনাল অফিসারের ছোট ছেলে?'

'হাঁ!'

'একে আজকের মিটিংয়ে ডাকা হয়নি কেন?'

'দীপককে বলেছিলাম, কিন্তু…'

'কাল থেকে সারা দিন ঘুরে ঘুরে ভুলে গেছি, সময় পাইনি।'

'ক্ষতি নেই। অমর, তোমার আর এখানে থাকা চলবে না!'

বিস্মিত অমর বিনয়দার মুখের দিকে তাকায়। ব্যাপারটা যেন ও কিছুই

বুঝে উঠ্‌তে পারছে না।

'দীপক আর তুমি কালই সাইকেলে ক'রে স্টেশনে চলে যাবে! সেখান হ'তে ট্রেনে ক'রে যাবে তমলুক। সেখানে তোমাদের অনেক কাজ।'

'বেশ!'

—Just like a good boy. Not a question why. But to do and die!

অকস্মাৎ অমরকে ফিরে আসতে দেখে নীরেনবাবু বিস্মিত হলেন: 'কি রে! হঠাৎ এ সময় চলে এলি! কলেজ খোলা না?'

'হ্যাঁ! চলে এলাম! ভাল লাগছিল না।'

নীরেনবাবু আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন না।

ঐ দিনই সন্ধ্যার দিকে দীপক এসে সংবাদ দিল, আগামীকাল বিদ্যুৎ-বাহিনীর এক বিশেষ অধিবেশন আছে। সেখানে যেতে হবে। রণবীর সংবাদ পাঠিয়েছেন।

১০ই সেপ্টেম্বর অমর শুনল: পুলিশের গুলীতে বিনয়দা মারা গেছেন। ঘটনাটি এই—প্রায় আড়াই হাজার লোক বিনয়দার নেতৃত্বে মেদিনীপুরের চালের কল হতে বৃটিশ সরকারকে চাল রপ্তানীতে বাধা দেয়। পুলিশ তখন জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে। ফলে তিনজন সেই গুলীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সর্বপ্রথমেই বুক পেতে গুলী নিয়েছেন প্রৌঢ় বিনয়দা! ঘটনার সময় কোন কংগ্রেসকর্মী সেখানে ছিল না। কিন্তু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অদূরবর্তী কংগ্রেস কার্যালয় থেকে প্রায় ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও ছয় হাজার গ্রামবাসী চালের কলের সামনে এসে উপস্থিত হয়।

গুলীবিদ্ধ মৃতদেহগুলি কিন্তু কংগ্রেসের কর্মীদের হাতে না দিয়ে নদীর জলে নিক্ষেপ করা হয়েছে। চোখের উপরে বিনয়দার সেই সৌম্য শান্ত মূর্তি যেন এখনো ভাসছে। গুলীবিদ্ধ রক্তাক্ত মৃতদেহ নদীর স্রোতে ভেসে চলেছে, কোথায়! বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করে অমর। বিদ্যুৎ-বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক সে।

চারদিকে কি নিকষ কালো অন্ধকার!...আকাশে কি মেঘ করেছে? আজকে কত তারিখ? ১০ই সেপ্টেম্বর। বিনয়দা মারা গেছেন তাহলে ৮ই সেপ্টেম্বর।

গতকাল বাবার কাছে পিসেমশাই একখানা চিঠি লিখেছেন। রুবিদি ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছে। চিঠিটা খোলা অবস্থাতেই বাবার টেবিলে পড়েছিল, হঠাৎ ও দেখে ফেলেছে।

পিসেমশাই সর্বশেষে লিখেছেন: আমি জানতাম অপদার্থ মেয়েটা একদিন আমার নাম ডোবাবে। এর পরও তুমি বলতে পার, আমি মুখ দেখাই কি ক'রে। সর্বনাশী, আমার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে গেছে। এ দুর্ঘটনার আগে আমার মৃত্যু হল না কেন।

।। তের ।।

চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। বিদ্যুৎ-বাহিনীতে প্রবেশ করার পর সেই প্রতিজ্ঞা-লিপি ! অন্ধকারে সেই মস্তবড় তেঁতুল গাছটার তলা ও আর রণবীর।

'মৃত্যুকে তুমি ভয় পাও না ?'

'না !'

'দেশের জন্য প্রাণ দিতে তুমি প্রস্তুত ?'

'সর্বদাই প্রস্তুত !'

'নেতার আদেশ বিনা বিচারে শিরোধার্য করবে সর্বদা ?'

'করবো।'

'দেখি তোমার হাতের আঙুল।'

নির্ভীক অমর ডান হাতখানি প্রসারিত ক'রে দেয়।

'এই নাও ছুরি, কাট আঙুল।'

সত্যিই অমর ছুরি দিয়ে অক্লেশে আঙুল কাটল।

'বীর সৈনিক, ললাটে তোমার মুক্তি-সংগ্রামের রক্ততিলক নাও, ধারণ কর।'

নিজ রক্তে অমর এঁকে নিল নিজ ললাটে রক্ততিলক।

অমরের মনে কত কথাই ভেসে আসে, ছায়াছবির মত একের পর এক। মাকে মনে পড়ে না। মা স্বর্গে গেলেন, কতই বা বয়স হবে তখন তার, বছর ছয়েক বই ত নয়।

ওরা তখন বারাসাতে। সারাটা রাত্রি ধরে বাড়ীতে ডাক্তারদের আনাগোনা। রাত্রি তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে ; বাবা ওর হাত ধরে মা যে ঘরে রোগশয্যায় শুয়েছিলেন, সেখানে নিয়ে গেলেন। মার গলা পর্যন্ত একটা ভারী সাদা চাদরে আবৃত। মুখে বিষণ্ণ পান্ডুর মৃত্যুছায়া। নিমীলিত দু'টি চক্ষু। বাবা মৃদুস্বরে ডাকলেন ঃ 'বিমলা, অমর এসেছে। তাকে আশীর্বাদ করো।'

মা চোখ মেলে তাকালেন ; কণ্ঠ তখন তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেছে। নীরবে শুধু ব্যাকুল দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দু'চোখের কোল বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে নীরবে।

অমর কিন্তু কাঁদেনি। ঘরের কোণে হ্যারিকেন বাতিটা জ্বলছে। মার রুগ্ন পাণ্ডুর মুখের উপরে সেই আলো এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যে কেমন যেন বিশ্রী একটা থমথমে নিঃশব্দতা। হ্যারিকেনের আলোয় দেয়ালের উপরে ওর ও বাবার দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। বাবার ছায়াটা মাঝে মাঝে দেওয়ালের গায়ে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না, অথচ কারা যেন নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে চলাফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে। কি ওরা চায় ! কারা ওরা ? লোকগুলোর দীর্ঘ চেহারা। লম্বা লম্বা হাতের আঙুল। চোখে ঘষা কাঁচের মত ফ্যাকাসে স্থিরদৃষ্টি।

পাশের ঘরে দিদি নীলা বোধহয় কাঁদছে। কেন দিদি কাঁদছে ? কি দরকার ওর কাঁদবার ? সব অস্পষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু তবু সে রাত্রের কথা আজও অমর ভুলতে পারেনি।

মা আশীর্বাদ করতে পারেননি, শুধু অমরের দিকে চেয়েছিলেন অশ্রুসজল চোখে। মার অস্পষ্ট স্মৃতির পাশেই আর একটি মার মুখ ভেসে ওঠে। দীপক-জননী তিনি।

আগামীকাল প্রত্যুষে মহিষাদলে বিরাট এক জনসভা হবে। রাত্রি তিনটার সময় এখান হতে বিরাট এক শোভাযাত্রা মহিষাদলের দিকে যাবে। মাস্টার-মশাই সুজিতবাবু ও দীপকের মা সেই শোভাযাত্রা পরিচালনা ক'রে নিয়ে যাবেন। রাত্রি দুটোর সময় সবাই গিয়ে স্কুলের মাঠে একত্রে মিলিত হবে।

অন্ধকার রাত্রি। কালো আকাশের পটে শুধু জ্বলছে অগণিত তারকা। স্কুলের মাঠে আর তিল ধারণেরও স্থান নেই।

মানুষ বলে কাউকে আর চিনবারও উপায় নেই। অন্ধকারে মনে হয় যেন অসংখ্য ছায়ামূর্তি ইতস্তত সঞ্চরণশীল। এতগুলো মানুষ। কিন্তু কোথায়ও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। প্রাচীরের পাশে পেয়ারা গাছটা অন্ধকারে হাওয়ায় পত্রমর্মর তুলছে।

সহসা রাত্রির স্তব্ধতা যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল। কার কণ্ঠস্বর: মহাত্মাজী কী—

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ঃ জয়! ভারত ছাড়! করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে!

স্বাধীন ভারত কী—

জয়!

মিছিল এগিয়ে চলল। ঘুমন্ত শহরবাসী সচকিত হয়ে শুনল তিমির-যাত্রীর নতুন বাণী ঃ করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে। ভারতের অর্ধ উলঙ্গ মুক্তি-সংগ্রামের সন্ন্যাসী কী বাণী আজ শোনালে! অন্ধকারের তটরেখায় নবোদিত সূর্যের সারথি সপ্ত অশ্বের বল্গা ধরেছো কি? চাবুক হানো! মেঘের বুকে বিজলী চমকের মত দিক হতে দিগন্তে সচকিত হয়ে উঠুক সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে। সেই আলোকে জেগে উঠুক তিমির-তীর্থের পথরেখা রুপালী পাতের মত। এগিয়ে চলুক সেই পথ ধরে হাজারো মুক্তি-সংগ্রামের অস্ত্রহীন বীর সৈনিকের দল!...

থর থর কম্পমান মেদিনী। বহুযুগের পুরাতন নোনাধরা পৃথিবী বীর সৈনিকদের পদভার সইতে পারছে না বুঝি, তাই টলছে। লাল সুরকী ঢালা পাকা সড়কের লাল ধুলো উড়ছে, কোটি কোটি রক্ত-রেণুর মত। নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে মিছিল।

অমরের সমগ্র চেতনা যেন অবশ হয়ে গেছে। বাড়ীর সবাই এখনো নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে, কেউ জানতে পারেনি। নিঃশব্দে চুপিসাড়ে ও পা টিপে টিপে খিড়কীর দরজাটা খুলে পালিয়ে এসেছে।

নীরেনবাবু আজকাল আর ছেলেকে ভাল-মন্দ কিছুই বলেন না।

অমর বুঝতে পারে সবই। ব্যথায় ওর বুক ভেঙে যায়। কিন্তু উপায় নেই। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে। জীবন দিয়ে পালন করতে হবে সে প্রতিজ্ঞা। সত্যি বাবার দিকে আজকাল যেন আর চাওয়া যায় না। গালের হাড় বের হয়ে পড়েছে। গলার কণ্ঠাও সজাগ হয়ে উঠেছে। আগেকার মত সদা হাসিখুশি ভাব আর নেই।

করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে।—পূব আকশে সূর্য-সারথির রথ এলো বলে। রক্ত-জবার মত লাল আকাশের প্রান্তে দেখা দিল নতুন দিনের নতুন সূর্য।

মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে কপিলপ্রসাদঃ মাথার রুক্ষ পিঙ্গল চুলগুলো মুখের উপরে এসে পড়েছে।—কে আছো বীর সৈনিক, শৃঙ্খলিত জননীর শৃঙ্খলিত সন্তান! আজ আমাদের পথ দেখাবে, এমন কোন নেতাই নেই আমাদের সামনে। বৃটিশের কারাগারে আজ সবাই বন্দী! কিন্তু তাই বলে আমাদের থামলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে।

সহসা যেন মন্ত্রমুগ্ধ জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। লালপাগড়ী! পুলিশ!

জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য থানার দারোগা লালপাগড়ী নিয়ে এসেছে। দারোগা মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল: 'থাম!'

কিন্তু কপিলপ্রসাদের ভ্রূক্ষেপ নেইঃ 'লালাপাগড়ীর দিন আর নেই।'

'থাম, না হ'লে গ্রেপ্তার করবো।'

'বৃটিশের লৌহ কারাগার আমরা ভেঙে চুরমার ক'রে দেবো।'

দারোগা গ্রেপ্তার করবার জন্য এগিয়ে যায়।

সমগ্র জনতা চীৎকার ক'রে উঠে: 'সাবধান!'

'চালাও লাঠি!'

লালপাগড়ীর লাঠি কিন্তু স্থির থাকে! এতটুকুও নড়ে না। বিক্ষুব্ধ জনতার দিকে তাকিয়ে তাদের বুঝি সাহস হয় না লাঠি চালাতে। দারোগা বেগতিক দেখে সরে পড়ে।

সত্যিই কি বৃটিশ রাজত্বের অবসান হয়েছে! এ কি অরাজকতা! আইন কি আর থাকবে না!

দিন দুই পরে। থানার দারোগা ইসমাইল অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। হাবিলদার হনুমান সিং এসে সংবাদ দিয়েছে একটু আগে: হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান দল বেঁধে থানার দিকেই এগিয়ে আসছে; থানাকে তারা নাকি স্বাধীন ব'লে ঘোষণা করবে। থানা এখন আর বৃটিশের অধীনে নয়, তাদের অধীনে। বাংলা আজ আর পরাধীন নয়, স্বাধীন! শোনা যাচ্ছে…… ঐ দূরে সমুদ্র গর্জনের মত জনতা এগিয়ে আসছে।…

মহাবীরপ্রসাদ এসে সেলাম দিল: 'স্যার, হুকুম দিন, গুলী চালাই। সব বেটাকে উড়িয়ে দিই।'

'তুমি কি ক্ষেপেছো মহাবীর! ক'টা গুলী আছে তোমার বন্দুকে? প্রাণে বাঁচতে চাও ত' এখুনি লুকিয়ে ফেল বন্দুক!'

'ভারত ছাড়। করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে!'

স্বাধীন ভারত কী—

জয়!

বারান্দায় স্থাণুর মত দল বেঁধে পুলিশগুলো বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

দেড়শত বৎসর ধরে অগ্ন্যুদ্গীরণ ক'রে বন্দুকগুলো বুঝি আজ অচল হয়ে গেছে। একটু আগে ভৃত্য গরম চা কাপে ক'রে রেখে গেছে। চা এতক্ষণে ঠাণ্ডা হ'য়ে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

স্পেশাল আরম্ড ফোর্স চাই। একটা দু'টো বন্দুকে কিছু হবে না। একশ', দু'শ', তিনশ', অনেক……অনেক রাইফেল চাই। থাকবে তাতে ছুঁচাল বেয়োনেট। আর চাই মেসিন গান! ট্যারা-রা……টট্ টট্!……গুলী চলবে ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্র, মানুষের বুক ফুটো ক'রে। রক্তে মাটি রাঙা হয়ে উঠবে, তবে না! তবে না বেটারা জব্দ হবে! এ্যাঁ, স্বাধীন ভারত কী জয়! ওরে মূর্খের দল! বৃটিশ সিংহ এখনও মরেনি। তীক্ষ্ন নখরাঘাতে টুঁটি সব ছিঁড়ে ফেলবে।

করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে! Do or die।

পিপীলিকা পাখা ধরে মরিবার তরে! মরবি, ওরে মূর্খের দল সব পুড়ে মরবি!…

গরম চায়ের কাপে কখন বোধ হয় একটা মাছি উড়ে এসে বসেছিল, মাছিটা মরে ভাসছে ঠাণ্ডা চায়ের উপর।

সমুদ্র কল্লোল!…গর্জন-মুখর তরঙ্গ-সংঘাত। ভারত ছাড়! ভারত ছাড়!

দলপতি সগর্বে মার্চ ক'রে এসে থানার উঠানের উপরে একটা ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা প্রোথিত করল: 'মহাত্মাজী কী!…'

'জয়!'

'রাজবন্দীদের…'

'মুক্তি চাই!'

'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ…'

'ধ্বংস হোক!'

'করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে।…ইনক্লাব জিন্দাবাদ!'

'হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছো কি! স্যালুট কর ওই সামনে তোমার স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা! প্রণাম জানাও। কতকটা যেন স্বপ্নভঙ্গের মতই ইসমাইল জাতীয় পতাকাটার দিকে তাকাল। বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে শুধু!'

'পুরাতন কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেল। নতুন ক'রে আবার কাগজপত্র তৈরী হবে এদেশে। হবে নতুন আইন।' একদল লোক থানার আলমারী ভেঙে যত কাগজপত্র সব টেনে টেনে বারান্দায় এনে স্তূপ করল। তারপর তাতে অগ্নিসংযোগ করল। শত অত্যাচারের রক্তে রঞ্জিত নথিপত্রগুলো আগুনের স্পর্শে পুড়ে কুঁকড়ে যায় কালো ছাই হয়ে। সর্বভুকের লেলিহান শিখা লক্ লক্ ক'রে উঠে!

জেগেছে রুদ্র! মহাকালের হাতছানি! রুদ্র ভৈরবের আবির্ভাব।

ভাঙনের অগ্নি-সংস্কার !···উড়ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিকে দিকে। বৃটিশ সিংহ পুড়ছে কি !

কাগজের পোড়া গন্ধে ও ধোঁয়ায় জায়গাটা যেন থম্ থম্ করতে থাকে। ইসমাইল খুক্ খুক্ ক'রে কাশতে শুরু করে, গলায় ধোঁয়া গেছে।

॥ চৌদ্দ ॥

কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

প্রত্যেকটি থানা স্বাধীন ব'লে ঘোষিত হয়েছে জেলায়। বৃটিশের লৌহমুষ্টি শিথিল।······কারাগারের ইটে ইটে লোনা ধরেছে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্কুল-আদালত সব বন্ধ। লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, সার্কেল অফিস সব বিধ্বস্ত। পুলিশ নেই, চৌকিদার নেই, দফাদার নেই! মহিষাদল, তমলুক, পাশকুড়া ও নরঘাট যাওয়ার রাস্তা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে।

দীপকের দল রেল লাইন ধরে এগিয়ে চলেছে। এক এক দলের উপরে এক এক প্রকার কাজের ভার পড়েছে। ধ্বংস করতে হবে রেল লাইন, টেলিগ্রাফের টেলিফোনের তার সব ধ্বংস করতে হবে। ছিন্ন হবে সকলপ্রকার যোগাযোগ। খট্-খট্-খটাং···লাইন তুলে ফেলা হচ্ছে। টেলিগ্রাফের কাটা তার বেঁকে ঝুলছে।

আজ তিন দিন অমর বাড়ীতে নেই। কোথায় গেছে কে জানে! সমস্ত শহরে হৈ চৈ গোলমাল। জাতীয় সৈনিকের শিবির বসেছে। থানার অফিসার ইন চার্জ ইউসুফের দেখা নেই। সি. আই. ডি. ইনস্পেক্টার তারক সিংহী আত্মগোপন করেছে। কেউ বলছে, সে বিপ্লবীদের হাতে খুন হয়েছে। কেউ বলছে তাকে গুম ক'রে রাখা হয়েছে। জাতীয় সামরিক আদালতে তার বিচার হবে। দলে দলে রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় লাঠি-হাতে জাতীয় সৈনিকেরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। জাতীয় শাসনে মহকুমা শহর।

নীরেনবাবুর বুকের ব্যথাটা যেন আরো বেড়েছে। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা! লোহার মত ভারী। দুই দিন ধরে অজ্ঞান। মাঝে মাঝে একটুক্ষণের জন্য জ্ঞান আসে, রক্তচক্ষু মেলে এদিকে ওদিকে তাকান। কাকে বুঝি খোঁজেন।

আকাশের এক প্রান্তে কাস্তের মত একফালি চাঁদ। বিবর্ণ চাঁদের আলোয় ফ্যাকাশে পৃথিবী, ভাল ক'রে চেনা যায় না। যেন আদিম যুগের নীহারিকায় নতুন ক'রে পৃথিবী আবার জন্ম নিচ্ছে। উঃ, রেলের লোহার লাইনগুলো কি ভারী! দু'হাতের আঙুলগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে। মাথার চুল উস্কখুস্ক, নিয়মিত স্নান-আহার নেই, নিদ্রা নেই। চোখ দুটো রক্তজবার মত লাল। পরনের ধুতি ও সার্ট ধুলো-কাদায় নোংরা। অমর তবু প্রাণপণে রেল লাইনের জয়েন্টের বল্টুগুলো খুলতে ব্যস্ত।

'কি রে অমর হলো ?' বিপ্রদাস প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ। আর একটা বল্টু বাকী! তা'হলেই ব্যস্!…

'তাড়াতাড়ি কর। আজ প্রায় চার মাইল লাইন তুলে ফেলা হয়েছে!'

'আজ দুপুরে সঞ্জীব সংবাদ এনেছে, কলকাতা থেকে নাকি মিলিটারী আর্মড ফোর্স আসছে।'

'তা আর আসতে হয় না, বাছাধনরা আসবেন কোন্ পথে!'

'ট্রাকে ক'রে আসছে।'

'রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্ত ক'রে রাখা হয়েছে, ট্রাক সমেত হুড়মুড় ক'রে সেই গর্তের মধ্যে ঝপ্‌ঝপাং, তার পর সব শেষ!'

ছোট একটা রেলওয়ে স্টেশন!

স্টেশন মাস্টার তারাপদ বিশ্বাস। ফোনের রিসিভারটা কানে লাগিয়ে মাউথ পীসে কথা বলছে: 'হ্যাঁ, কত নম্বর আপ্ বললেন? এখানে আসবে। মিলিটারী ফোর্স আসছে!…কিন্তু, গতকাল সকাল থেকে পরের স্টেশনের সঙ্গে কোন কানেকশনই পাচ্ছি না। বিপ্লবীরা বোধ হয় তার কেটে দিয়েছে। তা ছাড়া রেল লাইনের অবস্থা যে কি, তাও জানি না। লাইন ঠিক আছে কি না তাই বা কে জানে!…'

'এ্যাঁ, কি বললেন, এখান থেকে হাঁটাপথ! তা একটা পাকা সড়ক আছে বটে, কিন্তু সে রাস্তার কি যে বর্তমানে অবস্থা তাও জানি না। বেশ বেশ।' তারাপদ রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

"ওরে ও রামধনিয়া, ১১১ নং আপ ট্রেন আসছে। আগের স্টেশন থেকে গাড়ী ছেড়েছে।'

'সিগন্যাল ত' দেওয়া যাবে না; সিগন্যাল কাজ করছে না হুজুর।'

'সে কি রে?'

'হাঁ, এই কিছুক্ষণ হলো দেখছি।'

'কিন্তু গাড়ী যে আসছে।'

'গাড়ী আসবে না!…' গম্ভীর অথচ দৃঢ় কঠিন গলায় কে যেন বললে।

টিকিটের কাউন্টারের উপরে একটা কেরোসিন বাতি জ্বলছে।

'কে?'

একটি চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের যুবক, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে ষোল সতের বৎসরের একটি তরুণ কিশোর।

'কে আপনারা, মানে…কে?'

'আপাততঃ জেনে রাখুন, এ দেশেরই ছেলে আমরা। আপনিই ত' এখানকার স্টেশন মাস্টার!'

'হ্যাঁ!'

'ট্রেন আসবে না মাস্টার মশাই। আসতে আমরা দেব না! লাইন সব তুলে ফেলা হয়েছে। স্টেশনে ঢুকবার আগেই 'ডি-রেল' হবে।'

'কিন্তু, ট্রেন যে এসে পড়ল।'

'আসুক না, ক্ষতি কি! আপনার বাসা ত' কাছেই, দেখুন ত' কিছু খেতে দিতে পারেন কিনা? কাল সন্ধ্যা থেকে কিছু খাই নি, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।'

'বাবা—?'

একটি মধুর মেয়েলি কণ্ঠে ওরা যুগপৎ ফিরে দাঁড়াল।

দরজার উপরে দাঁড়িয়ে একটি ১৪।১৫ বৎসরের কিশোরী।

'কে রাণু!……'

'এরা কারা বাবা! আমি আপনাদের কথা শুনে ফেলেছি, চলুন আমাদের ঘরে, তৈরী কিছু নেই বটে, তবে তৈরী ক'রে দিতে বেশী দেরী লাগবে না।'

'তৈরী আর ক'রে দিতে হবে না, ঘরে চিঁড়ে মুড়ি নেই ভাই? তাই পেলেই যথেষ্ট।'

মেয়েটি হাসলে: 'চিঁড়ে মুড়ি খাবেন কেন? চলুন না। বাবা বলেন, আমি নাকি খুব ভাল খিচুড়ী রাঁধতে পারি, ঘরে ডিম আছে। খিচুড়ী আর ডিম ভাজা ক'রে দেব।'

'অমর, আর সময় নেই ভাই! তোমার খিচুড়ির কথা মনে রইলো বোন, যদি কোন দিন সময় পাই, এসে খেয়ে যাবো। আজ মুড়ি মুড়কি যা হয় চাট্টি এনে দাও দিদি।'

'কিন্তু এত রাত্রে যাবেনই বা কোথায়? গোলমালে ট্রেনই চলে না। রাত্রে ত' ট্রেন আসবেই না, আসলেও সেই সকালে।'

'ট্রেন নয় বোন। পায়ে হেঁটে যেতে হবে। অনেক দূর!'

বাইরে সুরকী ঢালা প্ল্যাটফরমের উপরে কয়েক জোড়া ভারী বুট জুতোর মচর মচর শব্দ পাওয়া গেল। রামধনিয়ার গলা শোনা গেল: এ্যাঁ, মাস্টারবাবু! মাস্টারবাবু!

তারাপদ তাড়াতাড়ি হন্তদন্ত হয়ে বাইরে চলে গেলেন।

কর্কশ ভারী কণ্ঠস্বর: 'You Station Master! Did you get the information.'

একেবারে খাঁটি বিলাতী কণ্ঠস্বর: কিন্তু কথাগুলো কেমন যেন জড়ান জড়ান!

'আসুন আপনারা, আমার সঙ্গে আমাদের বাসায়।' রাণু আহ্বান জানাল।

স্টেশনের অল্প দূরেই কোয়ার্টার। কাঁচা মাটির সরু পায়ে-চলা পথ, দু'পাশে রাংচিতার ঝোপ।

'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

'অনেক দূর থেকে।'

'আচ্ছা আপনারা যে একটু আগে বাবার কাছে বলছিলেন ট্রেনের লাইন আপনারা সব তুলে ফেলেছেন, ট্রেন আর আসতে পারবে না, একথা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ!'

'আপনারাই বুঝি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন? আপনারাই বুঝি ট্রেনের লাইন তুলে ফেলেছেন, তার কেটে দিয়েছেন, থানা দখল করেছেন?'

'কে তোমাকে এসব কথা বললে?'

'বাবা বলছিলেন। কলকাতা থেকে নাকি তাই মিলিটারী সৈন্য আসছে।'

'হ্যাঁ।'

কথা বলতে বলতে ওরা কোয়ার্টারে এসে হাজির হলো।

রাণুর মা মেয়ের মুখে ওদের কথা শুনে বের হয়ে এলেন। মাথায় অল্প ঘোমটা: 'তা হবে না বাবা, না খেয়ে তোমরা যেতে পারবে না। আমাদের জন্য ভাত রাঁধা হয়েছে, তাই খেয়ে যাও।'

'না মা, হাঙ্গামা করবেন না। আমাদের চারটি মুড়ি মুড়কী হ'লেই হবে।'

'না বাবা, রাণু আসন পাতছে, তোমরা এস।'

'কিন্তু এত রাত্রে আপনারা কি খাবেন?'

'আবার রান্না করতে কতক্ষণই বা সময় লাগবে? এস বাবা তোমরা।'

অগত্যা অমর আর কপিলপ্রসাদকে গিয়ে আসনে বসতে হলো।

সবে ভাতের সঙ্গে ওরা ডাল মেখে মুখে গ্রাস তুলতে যাবে, তারাপদবাবু এসে হাজির হলেন: মিলিটারী ফোর্স এসে গেছে। সমস্ত সৈন্য মার্চ ক'রে স্টেশনের দিকেই আসছে।

মুখের ভাত ফেলে অমর আর কপিলপ্রসাদ উঠে দাঁড়াল।

'ওকি বাবা, খেয়ে যেতে হবে।'

'সময় নেই মা। এবাড়ী থেকে বের হয়ে যাবার অন্য কোন সোজাপথ আছে কিনা বলতে পারেন?'

'আছে, মাঠের মধ্য দিয়ে।' রাণু বলে।

'চল ত' বোন, সেই পথটা আমাদের দেখিয়ে দেবে। কপিলপ্রসাদ বলে।

'একটু দাঁড়ান দাদা', ব'লে চকিতে রাণু পাশের ঘরে চলে গেল। একটুক্ষণ পরেই ফিরে এল, একটি তিন সেলের টর্চবাতি ও একটা পুঁটুলি নিয়ে।

'এসব কি!'

'বাইরে বড় অন্ধকার, মেঠোপথ আগাছায় ভরা, টর্চটা সঙ্গে রাখুন, আর এই পুঁটুলিতে মুড়ি ও পাটালীগুড় আছে।' বাড়ীর খিড়কীর দুয়ার দিয়ে রাণু ওদের পথে বের ক'রে দিল: 'সোজা পথ দাদা, চলে যান।'

'তবে আসি বোন।......'

'আর একটু দাঁড়ান', রাণু গলায় আঁচল দিয়ে কপিলপ্রসাদের পায়ের কাছে প্রণাম করতে যেতেই, কপিলপ্রসাদ বাধা দেয়: 'ও কি! ও কি!...'

'আজ একমাস ধরে কেবল আপনাদের কথাই শুনেছি, চোখে দেখিনি। দূর থেকে কতবার আপনাদের আমি প্রণাম জানিয়েছি দাদা! আজ তাই সামনা-সামনি পেয়ে প্রণাম করছি। আপনারা জয়ী হোন!'

চলে গেল অন্ধকারের পথ ধরে তারা। মিলিয়ে গেল। আর দেখা যাচ্ছে না! রাণু কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে থাকে খিড়কীর দুয়ার ধরে। অনেক দূরে অন্ধকারে একবার টর্চের আলো দেখা গেল।

অন্ধকারের যাত্রী! যাত্রা তোমাদের সফল হবে। তিমির-তীর্থের স্বর্ণ-চূড়ায় নতুন দিনের নতুন সূর্য আবার উদয় হবে। কণ্টক-ক্ষত রক্ত-চরণে যে রক্ত-আলপনা তোমরা এঁকে চলেছো, আগামীকালের যাত্রীদের সেই হবে পথ-নিদর্শন। ভিতর থেকে বাবার গলা শোনা যাচ্ছে: 'শীগ্‌গির করো; কর্ণেল স্টেশন ঘরে বসে আছে। চা, টোস্ট, ওমলেট চাই-ই…

॥ পনেরো ॥

শহরের চতুর্দিক হ'তে মিলিটারী সৈন্য এসে শহরে প্রবেশ করছে। মচ্ মচ্ শব্দ তুলছে তাদের ভারী এ্যামুনিশন বুট। পথে পথে বসেছে মেশিনগান। হাজারো রাইফেলের ছুঁচালো বেয়োনেটে সূর্যালোক ঝিলিক হানছে, যেন মৃত্যুর তীক্ষ্ন নখ! যে পথ দিয়ে এসেছে সৈন্যবাহিনী, নির্মমভাবে তারা গুলী চালিয়ে এসেছে। অত্যাচারের রক্ত-গঙ্গা বইয়ে এসেছে পথের দু'পাশে। কিন্তু মৃত্যুকে যারা ভয় করে না, মৃত্যুনির্যাস যারা অঞ্জলি-পুরে আকণ্ঠ পান ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছে, তাদের সেই দুর্বার গতিকে রোধ করবে কে?

মহকুমা শহরের প্রত্যেকটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে ও রাস্তার দু'ধারে গোরা, গুর্খা সৈন্য ও পুলিশ ঘাঁটি বেঁধেছে।

'কিন্তু শোভাযাত্রা বের করতেই হবে। বৃটিশের রক্তচক্ষু দেখে পিছিয়ে গেলে চলবে না। কেউ না যায় আমি যাবো। বাংলার ছেলে, বাংলার মেয়ে ভীতু। দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসর ধরে লুপ্ত স্বাধীনতাকে আবার ফিরিয়ে আনবার জন্য বন্দুকের গুলীতে, ফাঁসীর মঞ্চে তারা শুনিয়ে গেছে জীবনের জয়-গান। সে ত' ব্যর্থ হবার নয়। সে রক্তদান, সে ত' মুছে যায়নি। সময় এসেছে আজ। ডাক শুনেছি সে শৃঙ্খলিত দেশ-মাতৃকার, তুমি আমায় বাধা দিও না! হাসিমুখে আমায় অনুমতি দাও।'

'বাধা তোমাকে আমি দিইনি জাহ্নবী। কিন্তু এ যে মৃত্যু, সাক্ষাৎ মৃত্যু!'

'ঐ মৃত্যুই আজ আনবে আমাদের মুক্তি।'

'জাহ্নবী,…তুমি যাবে আমি জানি! অন্ধ আমি, চোখে দেখতে পাই না। অথর্ব অন্ধ কুরুরাজের মত পঙ্গু হয়ে শেষের দিন গুণছি। কিন্তু তার জন্যও আজ আমার দুঃখ নয়, দুঃখ এই তোমাদের পাশে গিয়ে আজ আমি দাঁড়াতে পারলাম না। মনে পড়ছে আজ সবারই কথা। ধূর্জটি, কিরীটি, শঙ্কর, শম্ভু, পিনাকী সবার কথা। রুদ্রকে আমি পূজো করেছি চিরকাল। তাই, তুমি আমার উপরে অভিমান ক'রে এক ছেলের নাম রাখলে সমীর। দল ছাড়া কমিউনিস্ট সমীর বেঁচে থাকবে আমি জানি! কিন্তু অন্তর দিয়ে যাদের আমি

চেয়েছিলাম, তারা কেউই রইলো না! শেষ দীপক! সেও যাবে। অথচ আমি! আমি এখানে একা পড়ে থাকবো। কালের প্রহরী হয়ে, তোমাদের মৃত্যু-বেদীতে প্রদীপ জ্বালাতে।'

'তুমি যদি এমন বিচলিত হও, তবে কেমন ক'রে আমি যাই বলো?'

'বিচলিত! দ্বিজনাথ রুদ্র অন্ধ হয়ে গেছে; কিন্তু মরেনি! তুমি যাও জাহ্নবী! দীপককে সঙ্গে নিয়ে যাও। দূর দূরান্তে, যেখানে আমার পিনু··· পিনাকী গেছে···যে দেশে পরাধীনতার জ্বালা নেই···অত্যাচারের বেড়ী নেই··· দমননীতির লৌহশৃঙ্খল নেই।' মধ্য গগন হ'তে মার্তণ্ডদেব পশ্চিমের দিকে হেলে পড়েছেন। প্রখর সূর্যকিরণ। চোখ ঝলসে যায়।

শহরের উত্তর দিক হ'তে বিরাট একটি শোভাযাত্রা শহরের মধ্যে প্রবেশ করল। সেই শোভাযাত্রার প্রথমেই জাহ্নবী দেবী। একপাশে দীপক ও কপিলপ্রসাদ, অন্য পাশে অমর।

করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে।···

রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।···

দুড়ুম! দুড়ুম।···গোরা সৈন্যের রাইফেল গর্জন ক'রে উঠল।

বন্দে মাতরম্।···ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

মুক্তিকামী শতকণ্ঠ সচকিত হয়ে উঠে। আবার ছুটলো বৃটিশের অগ্নিগোলা।

দুম্···দুম্···দড়াম্!···

চার পাঁচজন রক্তাপ্লুত দেহে ধরাশায়ী হলো। একটি কাতর শব্দ কেউ করল না।

করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে!···

মুহুর্মুহুঃ গুলিবর্ষণ চলতে লাগল শোভাযাত্রার উপরে।

ধোঁয়া-বারুদের গন্ধ! রক্তে ধরণীতল রাঙা হয়ে গেল।

জাহ্নবীর দুই হাতই বন্দুকের গুলীতে আহত। অজস্র রক্তক্ষরণ হচ্ছে! কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। এগিয়ে চলেছেন তেমনি পতাকা নিয়ে। জোয়ান অব আর্ক।

দুড়ুম ক'রে একটা গুলী এসে লাগল দীপকের বুকে। লুটিয়ে পড়ল সে।

মা একবার ফিরে তাকালেন রক্তাপ্লুত মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রের বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে।

এগিয়ে চল! থামলে চলবে না। এবারে কপিলপ্রসাদের পালা। তার মাথায় এসে গুলী বিদ্ধ হলো।

অন্ধকার কালো আকাশের বুক হ'তে এক একটি নক্ষত্র খসে পড়ছে। কোথায়? এই পৃথিবীর ধূলায়! মৃত উল্কাপিণ্ড নয়, জ্বলন্ত নক্ষত্র। মা কিন্তু অচল অটল রক্তরাঙা পথে তেমনি এগিয়ে চলেছেন: 'ভারতীয় সৈন্য তোমরা তোমাদের লজ্জা হয় না, ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে গুলী চালাতে?' এমন সময় একটি গুলী এসে জাহ্নবীর কপাল ভেদ করল। সৈনিক রমণী লুটিয়ে

পড়লেন এতক্ষণে ধুলার উপরে।

দৃঢ়মুষ্টিতে ধরা তখনও তাঁর জাতীয় পতাকা!

একজন গোরা সৈন্য এসে মৃতদেহের উপরে লাথি মেরে পতাকাটা ছিনিয়ে নিল। 'ড্যাম্ নিগার!'

'You shut up fool!' অমরের বদ্ধমুষ্টি প্রচণ্ড বেগে এসে গোরা সৈনিকের মুখের উপরে পড়ল। গোরা সৈনিকের মুখটা মুহূর্তে রাঙা হয়ে উঠে।

চার-পাঁচজন সৈনিক ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত চারপাশ হ'তে অমরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নির্মমভাবে কিল, চড়, লাথি ও বন্দুকের কোঁদা দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে।

রক্তাক্ত দেহে অমর লুটিয়ে পড়ে মার মৃতদেহের পাশে।

।। ষোল ।।

বন্য-অন্ধকার নেমে এসেছে আবার মহকুমা শহরের ধারে। নিশুতি রাতের কালো অন্ধকার। কালো আকাশের সমস্ত বুকখানা জুড়ে কালো কালো মেঘ পুঞ্জিভূত হয়ে উঠছে, হয়ত মাঝ রাত্রে এক পশলা বর্ষণ হতে পারে।

অসহ্য গুমোট গরম। গুলী, বারুদ ও ধোঁয়ায় পৃথিবী ঝলসে গেছে। রাতের মন্থর বাতাসে বারুদের একটা তীব্র কটু গন্ধ ভেসে আসে। শহরের বড় বড় রাস্তাগুলি আহত ও ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহে ভরে গেছে। বারুদের কটু গন্ধের সঙ্গে মিশে যায় আহতের করুণ আর্তনাদ।

গুলীবিধ্বস্ত, রক্তাক্ত শহরের উপরে চাঁদ উঠছে। টহলদারী সৈনিকের ভারী এ্যামুনিশন বুটের মচ্ মচ্ শব্দ।

অন্ধকারে দাওয়ার উপরে বসে অন্ধ দ্বিজনাথ। ঘরে আজ প্রদীপ জ্বলেনি। কে জ্বালাবে? পৃথিবীর আলো কেমন, আজ আর তা মনে পড়ে না। কেবল কালো অন্ধকার, সীমাহীন নিশ্ছিদ্র জমাট পাথরের মত।

দীপকের যখন মাত্র আট বৎসর বয়স, তখন তাঁর দুই চোখই অন্ধ হয়ে যায়। সেই ঢল ঢল রমণীয় মুখখানি না জানি আজ কি রকমটি দেখতে হয়েছে! দীপকের চোখের দৃষ্টির মধ্যে যেন একটা আগুন ছিল। যেন দুটি রক্তিম অগ্নিশিখা! তাই ত' ওর নাম রেখেছিলেন দীপক!

জাহ্নবী! দীপকের মা! পিনাকী সেবারে সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। একদিন এসে বললেঃ 'জান বাবা, আমাদের···আমাদের মাকে দেখলেই আমার গোর্কী'র মা'র কথা মনে পড়ে।'

জাহ্নবী! তোমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। কিন্তু ব্যর্থ হয়নি তোমার মাতৃত্ব! তোমার ওই শুকিয়ে যাওয়া বাগানেরই কোথাও লুকিয়ে রইলো তারা সাত ভাই চম্পার মত। পারুল বোন ডাক দিলেই তারা জেগে উঠবে।

ও কি! আঙ্গিনায় কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল না! 'কে! জাহ্নবী?

দীপক এলি বাবা ?…না ! কেউ নয় । তবে বুঝি বাতাস ।'

আবার পায়ের শব্দ ! দ্বিজনাথ অধীর হয়ে উঠেন । 'কে ?'

'আমি !…আমি অমর, মেসোমশাই !' ক্ষীণ নিস্তেজকণ্ঠে অমর জবাব দেয় । রক্তাক্ত দেহেই অবসন্ন ক্লান্ত অমর কোনমতে মার হাতের ছিন্ন রক্তমাখা পদদলিত জাতীয় পতাকাটি বহন ক'রে দীপকের বাড়ী পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে । নিদারুণ রক্তক্ষরণে চলচ্ছক্তিহীন । আর বুঝি পারে না । মাথাটার মধ্যে যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে । পেটের ক্ষতস্থান দিয়ে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হলো । অমর ঘুরে পড়ে গেল ।

'অমর ! অমর ! দীপক…তার মা ? তারা ?'

'তারা…নেই ! মার হাতের পতাকাটা শুধু কোনমতে আমি নিয়ে এসেছি ।' অমর হাঁপাতে থাকে । শুষ্ককণ্ঠে আর স্বর বের হয় না । ধীরে ধীরে অমর মাটির উপরেই এলিয়ে পড়ে । উঃ বাতাস ! একটু বাতাস !…প্রাণপণে অমর বাতাস টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে ।

'কই ! কই সে পতাকা ! আমায় দাও ! আমায় দাও !…অমর ! অমর !'

সেবারতা নীলার বুঝি কেমন একটু তন্দ্রামত এসেছিল, হঠাৎ একটা চীৎকারে তন্দ্রা টুটে গেল ঃ

'অমর ! অমর ! My boy ! Come ! Come back, my child !'

নীলা পিতার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে ডাকলে ভীত কণ্ঠে ঃ 'বাবা ! বাবা !…'

'এ্যাঁ ! অমু কি ফিরে এসেছে মা ?'

'না বাবা, অমু ত' এখনও ফিরে আসেনি ।'

'আসেনি । তবে দরজাটা বন্ধ করিস না মা ! Keep the door open !'

নীরেনবাবু আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েন ।

রাত্রি আরো গভীর হয়েছে । অন্ধ দ্বিজনাথ এখনও পতাকাটা খুঁজে পাননি । কেবলই আঙ্গিনাময় হাতড়ে বেড়াচ্ছেন পাগলের মত ।

তিমির রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে পূব আকাশের প্রান্তে তরুণ তপন দেখা দেবেন এবার । পূর্বাশার প্রান্তে তারই রক্তিম আভাস । নতুন দিনের নতুন সূর্য ! স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্ত-তিলক ।

হ্যাঁ, এক্ষণে অন্ধ দ্বিজনাথ অমরের মৃত্যু-শীতল দৃঢ়-মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে রক্তরঞ্জিত পতাকাটা খুঁজে পেয়েছেন । উন্মাদের মতই স্খলিত কণ্ঠে দ্বিজনাথ চীৎকার ক'রে উঠেন ঃ 'পেয়েছি । পেয়েছি জাহ্নবী ! পেয়েছি !'

অন্ধ দ্বিজনাথ কাঁপছেন থর থর ক'রে । কাঁপছেন !'

—প্রথম খণ্ড সমাপ্ত—